স্বয়ংসিদ্ধা

দ্বিতীয় খণ্ড

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩-১-১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ... কলিকাতা-৬

চার টাকা আট আনা

প্রথম প্রকাশ—বৈশাখ, ১৩৫৮
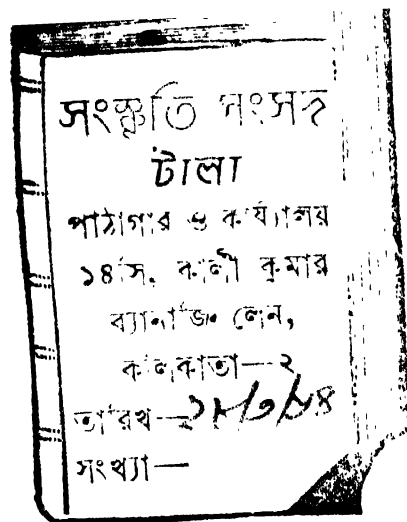
বাঙলা ও বাঙালীর গৌরব

ভারতীয় সুপ্রিমকোর্টের মাননীয় বিচারপতি

সাহিত্য-সুহৃদ সুধীবর

শ্রীবিজনকুমার মুখোপাধ্যায়

মহাশয়ের করকমলে

পরম শ্রদ্ধা সহকারে

সমর্পিত হইল

পরিচয়

'স্বয়ংসিদ্ধা' উপন্যাসের দ্বিতীয় খণ্ড 'মাসিক বসুমতী' পত্রিকার পৃষ্ঠায় ধারাবাহিকরূপে বাহির হইতে থাকিলে—স্বয়ংসিদ্ধার নবরূপে আত্মপ্রকাশ শুধু বঙ্গদেশ নহে—ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি এই প্রচেষ্টার জন্য যেভাবে তাঁহাদের উল্লাস জ্ঞাপন করিয়াছিলেন, তাহাতে এই সত্য উপলব্ধি হইয়াছিল যে, ইতিপূর্বেই স্বয়ংসিদ্ধার চণ্ডীর আদর্শে আকৃষ্ট হইয়া সারা দেশের নরনারী পৌরাণিক আদর্শ নারী-চরিত্রগুলির মত তাহাকেও পরম শ্রদ্ধাভরে বরণ করিয়া লইয়াছেন। সুতরাং এই মহীয়সী নারীর উত্তর চরিত্রের প্রতি তাঁহাদের আগ্রহ স্বাভাবিক। এই গভীর আগ্রহ আমার সাধনায় প্রচুর প্রেরণা যোগাইয়াছে এবং এজন্য তাঁহারা প্রত্যেকেই আমার ধন্যবাদার্হ।

দ্বিতীয় খণ্ডটিও যে প্রথম খণ্ড স্বয়ংসিদ্ধার মত সকল সমাজে সমাদৃত হইয়া আমার সকল প্রয়াস, উদ্যম ও সাধনাকে সার্থক করিয়াছে; সমালোচক ও পাঠকমহলের অকুণ্ঠ প্রশংসা এবং বর্ত্তমানের দুর্দ্দিনেও সম্বৎসরের মধ্যেই ইহার দ্বিতীয় সংস্করণের প্রকাশ সূত্রেই তাহা উপলব্ধি করা যাইতেছে।

দ্বিতীয় সংস্করণে বিষয়-বস্তুর অল্প স্বল্প পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। বহু পাঠক পাঠিকার প্রশ্নোত্তরে সবিনয়ে তাঁহাদিগকে জ্ঞাপন করিতেছি যে, অতি শীঘ্রই ইহার তৃতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইবে। এবং ইহার চিত্র-রূপ তাহারই প্রতীক্ষা করিতেছে।

সাহিত্য-ভবন
৪২, বাগবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৩
পয়লা বৈশাখ, ১৩৫৮ সাল

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

এই লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ পরিচয়

উপন্যাস ঃ—	অগ্রগামী	১৲
	মহাজাতি সংঘ	১৲
	রাগিণী	১৲
	অপরাজিতা	৪৲
	কুমারী সংসদ	২॥০
	গোটা মানুষ	২॥০
	নারীর রূপ	৩৲
	কে ও কী	৩॥০
	নতুন বৌ	৩৲
	দ'খনে বাঘ	৩॥০
	নির্বাসিতা রাজকন্যা	৩৲
	বাঙলা ও বাঙালী	২॥০
	বাঙলার দুলাল	২॥০
	অপরিচিতা	৩৲
	হিংসা ও অহিংসা ১ম খণ্ড	৩৲
	ঐ ২য় খণ্ড	৩৲
গল্পগ্রন্থ ঃ—	দুঃখের পাঁচালী	১॥০
	অদৃষ্টের ইতিহাস	২॥০
	ভুলের মাশুল	১॥০
	মরু মাঝে বারিধারা	১॥০
	মুক্তিমণ্ডপ	১॥০
	যুগের যাত্রী	২৲

কাহিনী ঃ—	অগ্নিযুগের কথা	১॥০
	বাঙলা মায়ের শহীদ ছেলে	১॥০
	গল্পে এসিয়ার নেতাজী	১॥০
	গল্পে ভারতীয় কংগ্রেস	১॥০
	মহাভারতের কথা	১॥০
নাটক ঃ—	ঝান্সীর রাণী	২৲
	বাজীরাও	২৲
	——	১৲

আত্মসমর্পণ, ইনটেলিজেণ্ট, অজানা অতিথি, দরিদ্রের দাবী, অবশেষে প্রভৃতি উপন্যাসগুলি ছাপা নাই।

স্বয়ংসিদ্ধা

অবতরণিকা

বাগুলীর জমিদারবাড়ীর সেদিনের বিস্ময়াবহ ঘটনাটি আর প্রচ্ছন্ন রাখা সম্ভব হয় নাই—রূপকথার রহস্যময় কাহিনীর মতই গ্রামের অধিবাসীদিগকে চমৎকৃত করিয়াছে।

চমৎকৃত হইবার মত কথাই বটে! কে না জানে—গাঙ্গুলীবাড়ীর বড় ছেলে গোবিন্দ একটা গবেট, আকাট মূর্খ, জড়ভরতবিশেষ। অথচ, আজ সকলেই শুনিয়াছে—সেই ছেলে হঠাৎ ভারি পণ্ডিত হইয়া গিয়াছে, জড়তা কাটাইয়া মানুষের মতন মানুষ হইয়া উঠিয়াছে; এমন কি, জেলার কলেক্‌টর ও পুলিস সাহেবের সহিত আলাপ করিয়া তাঁহাদিগকেও অবাক করিয়া দিয়াছে। গোবিন্দর সহিত নববধূ চণ্ডী দেবীর কাহিনীও নানা আকারে পল্লবিত হইয়া গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতার অন্তরে বিচিত্র রকমের এক আলোড়ন তুলিয়াছে।

কৈলাস চক্রবর্তীর চণ্ডীমণ্ডপে গ্রামের নিষ্কর্মারাই সাধারণত আড্ডা জমাইয়া থাকে—সেদিন কর্মবাগীশদেরও সমাগম হইয়াছে। চক্রবর্তীর চণ্ডীমণ্ডপটি বার্তাগার-বিশেষ। বায়ু এখানে বার্তা বহন করিয়া আনে এবং সর্বত্র বিকীর্ণ করে।

চক্রবর্তী বলিতেছিলেন: তাজ্জব আর কাকে বলে, ছেলেটা আকাট মূর্খ আর হাবলা বলেই ত বাইরে কারুর সঙ্গে তাকে মিশতে দিত না, বড় কর্তার কড়া হুকুম ছিল—বাড়ীর বার হবে না বড় খোকা। তবে সব সময় কি আর আটকে রাখা যায়? ফাঁকেজোকে পাড়ার লোকে দেখে

ছিল বলেই ত বেচারীর মুখের পানে চেয়ে মনের দুঃখে বলত, দেখ ছোকরার বরাত—রাজার ঘরে জন্মেও গোবর-গণেশের মত অকর্মা হয়েই রইল!

যদু ঘোষাল বলিলেন: এখন বিয়ের জল গায়ে পড়তে না পড়তেই সম্বৎসরের মধ্যে সেই গোবর-গণেশ ছেলেই হল কি না বিদ্যেয় বৃহস্পতি! বলি, বউটা তাহলে মা সরস্বতীর ভাঁড়ারের সমস্ত বিদ্যে বোকা বরকে গঙ্গা জলে গুলে খাইয়ে দিয়ে এই কাণ্ড করলে না কি হে?

ভুবন দত্ত একটু রসিকতা করিয়া কহিলেন: ছেলেটা তাহলে গেল জন্মে কালিদাস পণ্ডিত ছিল বল! তার গল্পও ত শুনি—প্রথমে ছিল মুখ্যু আর তেমনি বোকা; গাছে উঠে যে ডালে বসেছে,সেই ডালের গোড়াতেই কুড়ুল চালাচ্ছে! তাই দেখেই না পণ্ডিতরা তাকে সবার সেরা মুখ্যু বলে চিনে ফেলেছিল!

এ কথায় চক্রবর্তী উৎসাহিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন: তবে শোন একটা মজার কথা বলি হে দত্তজা—বড় খোকার বিয়ের রাতে কোবরেজ বাড়ীর বাসরে ঐ কালিদাসের গাওনাই হয়েছিল।

কথাটা শ্রোতাদের অন্তরে নূতন একটা কৌতূহল জাগ্রত করিয়া দিল; প্রত্যেকেই সোৎসাহে সোজা হইয়া বসিল বাসর-বার্তা শুনিবার উল্লাসে। চক্রবর্তী মৃদু হাসিয়া বলিতে সুরু করিলেন: বিয়ের বাসরে ঢুকেই বর একেবারে বোবা আর কি! সাত চড়েও তার রা নেই মুখে। মেয়েগুলো ত সব রাগ করে উঠেই গেল—তাদের আর বাসর জাগা হলো না। তখন কনে করলে কি—গুরুমশায়ের মত বরকে নিয়ে পড়ল।

বিস্মিত শ্রোতাদের ভিতর হইতে নানা সুরে প্রশ্ন উঠিল: বলেন কি চক্রবর্তী মশাই!

বিয়ের কনে গুরুমশাই হলো—য়্যাঁ?

ভারি মজার কথা ত!

অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক এক শ্রোতা জিজ্ঞাসা করিল : কিন্তু বাসরের খবর আপনি কি করে পেলেন চক্রবর্তী খুড়ো ?

গম্ভীর মুখে চক্রবর্তী উত্তর করিলেন : কেন—শুনিস্‌নি, আমার ভাগনী ভদ্রার বিয়ে হয়েছে ঐ শ্যামাপুরে। সে-যে বাসর জাগতে গিয়েছিল বিয়ের রাতে ; মেয়েটা ভারি তুখোড় কি না! তাই বাসরঘর থেকে বেরিয়ে জানালার আড়ালে দাঁড়িয়ে বর-কনের সব কথা শুনেছিল আড়ি পেতে—বুঝলি এখন ? বোয়ে গেছে আমার বানিয়ে বলতে।

রস-কথায় বিঘ্ন পড়িতে অন্যান্য শ্রোতারা তখন বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছেন ; একাধিক কণ্ঠের অনুরোধ উঠিল : বলুন আপনি চক্রবর্তী মশাই, বলুন।

চক্রবর্তী বলিতে লাগিলেন : কনে বুঝতে পেরেছিল রাজকন্যা বিদ্যাবতীর মত তারও বরাতে জুটেছে এক মূর্খ বর ; তার পর জেরা করে করে বরের পেট থেকে সব কথা বার করে নিলে। ছোঁড়াই তখন সব বলতে লাগল। ভদ্রা বলে—কি বলব গো মামা, বোবার যেন মুখ খুলে গেল। বলল—তার ত পড়ার খুবই ইচ্ছা, কিন্তু পড়তে কেউ দেয় না ; সৎমা চোখ পাকায় ; সৎভাই বই ছিঁড়ে দেয়, মাষ্টাররা বলে—তোর মাথায় গোবর পোরা, কিচ্ছু হবে না। লিখতে গেলেই নিবারণ—ঐ ছোট খোকা গো! পিঠে চাবুক মারে। এই সব বলেই অমনি গায়ের জামাটা খুলে পিঠখানা দেখিয়ে দিলে—তখনো পিঠের উপর চাবুকের দাগগুলো কি রকম জ্বল-জ্বল করছে! তাই না দেখে কনের চোখ দু'টো জলে টস্‌-টস্‌ করতে লাগল। ভদ্রা বলে—তার পরেই মামা, মেয়ের চোখের তারা দু'টো যেন আকাশের তারার মত দপদপিয়ে উঠল। কিন্তু তখুনি সে ভাব সামলে নিয়ে বরকে জিজ্ঞাসা করল—তুমি পড়বে? পড়ার কথায় বরের কি আহ্লাদ! তখন কনে করলে কি—রাজকন্যা বিদ্যাবতীর বিয়ের কথা তুলে মুখ্যু কালিদাসের গল্প শোনাতে লেগে গেল। ভদ্রা বলে—মামা

গো! অমন করে গল্প বলতে কখন শুনিনি। বর যেই শুনলে, মুখ্যু কালিদাস দেশের সেরা পণ্ডিত হয়ে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিল—তখন তার স্ফূর্তি কি! সংগে সংগে সেই বাসর ঘরেই কনে বরকে দিয়ে দিব্যি করিয়ে নিল—তোমাকেও এমনি পণ্ডিত হতে হবে যে, দেখে সবাই অবাক হয়ে যাবে। ভদ্রার মুখে এ সব কথা শুনে তখন উপহাস করেছিলাম হে! এখন বুঝেছি, বাসরের সে সব কথা বজ্র হয়ে দু'জনের মনে বসেছিল। তাই না আজ যে শুনছে, সেই অবাক হয়ে বলছে—তাজ্জব!

কাহারও মুখে আর কথা নাই—প্রত্যেকেই অভিভূত। তাহাদের মানস-পটেও তখন ভাসিতেছিল—দু'টি প্রাণবন্ত তরুণ-তরুণীর মুখ!

* * * *

বকুল পুকুরে গ্রামের মেয়েদের বৈঠকেও এই আলোচনা বিস্ময়ের শিহরণ তুলিয়াছে। বাশুলীর গাঙ্গুলী বাবুদের অন্যতম কীর্তি এই বকুল পুকুর। প্রকাণ্ড দু'টি বকুল বৃক্ষের ব্যবধান মধ্যে সুপ্রশস্ত ইষ্টকময় চাতাল, উভয় বৃক্ষের মূলদেশ পরিবেষ্টনে নির্মিত এক জোড়া বৃহৎ বেদিকা এবং চাতাল-তল হইতে পুষ্করিণীর অনেকখানি জল পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অবরোহণের সুদীর্ঘ সোপান-শ্রেণী নবাগতদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করে।

সকাল হইতে মধ্যাহ্ন কাল এবং অপরাহ্ণের দিকে সন্ধ্যা পর্যন্ত এই স্থানটি পল্লী-মহিলা ও বালক-বালিকাদের সমাগমে জমকাইয়া উঠে; ঘর-গৃহস্থালী হইতে বাহিরের ঘটনাবলী—সমাজ ধর্ম রাষ্ট্র শিল্প বাণিজ্য সংক্রান্ত শ্রুত বা সংবাদপত্রে পঠিত প্রসংগগুলি পল্লবিত হইয়া কত কৌতূহলী চিত্তকে উৎফুল্ল করে। বর্তমানে প্রথম ও প্রধান আলোচ্য বিষয় হইয়াছে বাশুলীর বড় বাড়ীর বড় বাবু ও বধূর রহস্যময় কাহিনী।

বাশুলীর বিশিষ্ট অধিবাসী বৈদ্যনাথ গুপ্তের তরুণী কন্যা তরলাকে লক্ষ্য করিয়া, চক্রবর্তী-গৃহিণী নিরুপমা দেবী বলিতেছিলেনঃ তরলা, তুই ত কলকাতার নামজাদা কোবরেজের নাত-বৌ হয়েছিস, তোর শ্বশুরবাড়ীর

সবাই ত বড় বড় পণ্ডিত, লেকাপড়া শিখে কত পুরুষের তুই নাকি নাক-কান কেটে দিয়েছিস্ লো! এখন তুই-ই বল্—এমনটি কখনো কলকাতায় কোথাও হতে দেখেছিস্ বাছা?

তরলা সম্প্রতি পিত্রালয়ে আসিয়াছে। এই গ্রামেরই মেয়ে সে। জমিদার-বাড়ীর বড় খোকা গোবিন্দকে সে দেখিয়াছে এবং একটি দিনের ঘটনাসূত্রে সেদিনের সেই ছেলেটি তাহার অন্তরে গভীর ভাবে যে রেখাটি টানিয়া দিয়াছিল—আজও বুঝি তাহা মুছে নাই। বাশুলী গ্রামের মধ্যে এই মেয়েটি কুমারী বয়সেই বালিকা বিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া শ্রেষ্ঠ পুরস্কার লাভ করে।

পুরস্কার বিতরণ-সভায় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন জমিদার হরিনারায়ণ বাবু স্বয়ং। তিনি সেদিন সেই সভায় নির্দিষ্ট পুরস্কারের উপর তরলার নামাংকিত রত্নখচিত এক স্বর্ণপদক স্বর্ণসূত্রে গ্রথিত করিয়া স্বহস্তে তাহার গলায় পরাইয়া দিয়াছিলেন। বিদ্যোৎসাহী ভূস্বামীর এই বদান্যতার কাহিনী সমগ্র পরগণায় প্রচারিত হইয়াছিল এবং তরলাও শ্রদ্ধার সহিত সেদিনের স্মৃতি মনে করিয়া রাখিয়াছে। হরিনারায়ণ বাবু সে দিন বক্তৃতা প্রসংগে বলিয়াছিলেন: আজিকার এই পুরস্কার বিতরণ-সভায় প্রতিভাময়ী এই মেয়েটিকে আমি যা দিয়েছি তার জন্যে আপনারা উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে ধন্যবাদ দিচ্ছেন আমাকে। এতে আমি লজ্জাবোধ করছি। কারণ, যোগ্য এক প্রতিভা জোর করে প্রাপ্য আমার কাছ থেকে আদায় করে নিয়েছে। এতে আমার গর্ব করবার কিছু নেই। প্রকৃত ধন্যবাদ পেতে পারে এই মেয়েটি—না চেয়েই নিজের ক্ষমতায় যে তার প্রাপ্য স্বাভাবিক ভাবে পেয়ে গেছে। এই প্রসংগে এই সভায় সর্বসমক্ষেই আমি বলছি—দাতা বলে চিহ্নিত হবার কোন ইচ্ছাই আমার নেই—তবুও বলি, আমি দিতে চাই—দেবার জন্যে হাত আমার নিসপিস করে; কিন্তু দুঃখ এই—অমন লোক খুঁজে পাই নে, প্রতিভার জোরে নেবার দাবী যে রাখে।

দরদী ভূস্বামীর সেই মর্মবাণীর প্রতি ছত্রটি তরলার মনের পাতায় কালজয়ী অক্ষরে লেখা আছে। আরও এক দিনের কথা তাহার কুমারী-জীবনের শেষ অধ্যায়টিকে উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে। সে দিনের সভার পর তরলা জমিদার-ভবনে নিমন্ত্রিত হয়। তরলা শুনিয়াছিল, জমিদার-বাড়ীর অন্দর-মহলে এমন এক বিরাট পাঠাগার আছে, সেটি অন্যান্য দর্শনীয় বস্তুগুলির অন্যতম। খুঁজিয়া খুঁজিয়া অদম্য কৌতূহল ভরে সে পাঠাগারে ঢুকিয়াই সবিস্ময়ে দেখে—প্রকাণ্ড এক টেবিলের উপর বসিয়া বড় খোকা গোবিন্দ বাদামী একখানা কাগজে মোটা মোটা অক্ষরে লিখিয়া চলিয়াছে—মা মা মা মা !

ছেলেটির বসিবার ভংগি ও লেখার শ্রী দেখিয়া এবং মুখের একটা বিচিত্র সুর শুনিয়া তরলার মনের কৌতূহল কৌতুকের আবেগে স্ফুরিত হইয়া উঠে।

পরিহাস-উছল কণ্ঠে সে জিজ্ঞাসা করে: ও কি হচ্ছে ?

তন্ময় হইয়াই গোবিন্দ এই ভাবে বিদ্যাসাধনায় মগ্ন ছিল; তরলার কথায় ধড়মড় করিয়া উঠিয়া সোজা হইয়া সে বসে, তাহার পর মুখখানি তুলিয়া অপরূপ ভংগিতে বলিতে থাকে: বা-বা! তুমি কি গো? আমার চেয়ে ছোট্টটি মাথায়, কিন্তু বিদ্যেয়—ওরে বাবা, ক—তো বড় বল ত? ইচ্ছে করে তোমাকে গড় করি গো!

শিহরিয়া উঠিয়া তরলা প্রতিবাদের সুরে বলে: ও মা, ও কি কথা? বামুনের ছেলে তুমি, আমাকে গড় করবে কি! আমি যে বত্তির মেয়ে, তা জান না? ও কথা বলতে নেই!

সংগে সংগে জিভটা বাহির করিয়া ও দাঁতে চাপিয়া চাপা-গলায় গোবিন্দ বলিয়া উঠে: এ-হে-হে! বলতে নেই? ভাগ্যিস্—কেউ শুনতে পায়নি! ভাগ্যিস্—ছোট রাজা এখানে নেই!

তরলা জানিত, গোবিন্দর কনিষ্ঠ 'ছোট রাজা' নামে অভিহিত।

হরিনারায়ণ বাবু রাজা খেতাবের বিরোধী হইলেও দ্বিতীয়া পক্ষের গৃহিণী—নিবারণের মা স্বয়ং রাজকন্যা বলিয়া এই সংসারে নিজের নামের পূর্বে রাণী খেতাবটি যেমন চালু করিয়া লইয়াছেন, পুত্র নিবারণকেও সেই ভাবে প্রস্তুত করিয়াছেন। মাতা-পুত্রের প্রসংগে উক্ত খেতাব দুইটি যে অপরিহার্য, তাহা সংশ্লিষ্ট মহলের অবিদিত ছিল না।

তরলা তখন সকৌতুকে জিজ্ঞাসা করে: ছোট রাজা থাকলে কি হতো?

দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া গোবিন্দ উত্তর করে: ওরে বাবা! বেত মেরে পিঠখানা কাবা-কাবা করে দিত যে! জানো, বই খুলে পড়তে গেলেই কেড়ে নিয়ে ছিঁড়ে দেবে—লিখতে বসলেই পিঠে চাবুক মারবে। তাই ত চোরটির মতন চুপি-চুপি এই ঘরটিতে সেঁধিয়ে লিখছিলুম গো! আর নয়—পালাই, তুমি যেন বলে দিও না—লক্ষ্মীটি!...ইহার পর আর কোন কথা না বলিয়া কাগজখানি গুটাইয়া দোয়াত ও কলম কোঁচার কাপড় দিয়া ঢাকিয়া বড় খোকা যে ভাবে সেই ঘরখানি হইতে বাহির হইয়া যায়—সেই দৃশ্যটি আজও যেন তরলার চক্ষুর উপর ভাসিতেছে। তাহার পর কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া তরলা সুদৃশ্য আলমারীর মধ্যে সাজানো স্বর্ণখচিত গ্রন্থগুলির দিকে দৃষ্টিবদ্ধ করিয়াছে—এমন সময় সেই কক্ষে দৃপ্ত ভংগিতে প্রবেশ করে নিবারণ। তরলা মেয়েটি সম্বন্ধে পিতার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা সেদিন সে সভায় বসিয়া শুনিয়াছিল; আজ এ বাড়ীতে সেই মেয়েটি আমন্ত্রিত হইয়াছে এই সংবাদ পাইয়া তাহাকে খুঁজিতে খুঁজিতে এই কক্ষেই সে উপস্থিত হয়।

প্রথমে সে মৃণালিনীর কাছে গিয়াছিল। ভাবিয়াছিল, মেয়েটিকে সেইখানেই পাইবে। কিন্তু মৃণালিনীর মুখে শুনিতে পায় যে, ইতিমধ্যেই তাহার সহিত নাকি তরলার কথা-কাটাকাটি হইয়া গিয়াছে। মেয়েটি মৃণালিনীকে লাইব্রেরীর কথা জিজ্ঞাসা করিতেই সে উগ্র কণ্ঠে উত্তর করে:

ত কি ? জানো না বুঝি—ও যে আস্ত পাগল। মানুষ হলেও বুদ্ধি-শুদ্ধি ওর জানোয়ারের মতন যে ! তা, সে হতভাগাটা এ ঘরে এসেছিল কেন?

মুখ টিপিয়া হাসিয়া তরলা বলেঃ ঐ টেবিলটার ওপরে উবু হয়ে বসে তিনি ত মায়ের নাম লিখছিলেন !

ও ! তাই টেবিলখানার ওপর কালির দাগ পড়েছে বটে ! দাঁড়াও, দেখাচ্ছি মজা !—কথাগুলি বলিতে বলিতেই সে একটা আলমারির মাথা হইতে চামড়ার চাবুকটি বাহির করিয়া হাওয়ার উপরে হাঁকড়াইতে থাকে। তরলা চোখ দু'টি বিস্ফারিত করিয়া পরিহাসের সুরে বলেঃ আমার পিঠেই হাঁকরাবেন না কি ?

নিবারণ দুই চক্ষু পাকাইয়া তরলার পানে চাহিয়া বলেঃ এই মাত্র না পালাবার কথা বলছিলে ? এখন নিজেই ত ভয়ে এতটুকু হয়ে গেছ চাবুকটা হাতে দেখে ! তা, আমি ত এত আহাম্মুখ নই যে, মেয়েমানুষের পিঠে চাবুক হাঁকরাব। কার পিঠে হাঁকরাই দেখবে এস না—

তরলাও সংগে সংগে বলিয়া উঠেঃ দাদার পিঠে চাবুক মারতে বাধে না বুঝি—সে মেয়েমানুষ নয় এই জন্যে ?

মুখখানা বাঁকাইয়া বিকৃত স্বরে নিবারণ বলেঃ মেয়েমানুষেরও বেহদ্দ সে—নইলে চাবুক খায় ?

নিবারণের কথায় তরলার মুখখানা শক্ত হইয়া উঠে, শ্লেষের সুরে তখন বলেঃ দেখছি খুব বীর পুরুষ আপনি !

নিবারণ এই কথায় জ্বলিয়া উঠে। গোবিন্দর পক্ষ লইয়া কেহ কোন কথা বলিলেই তাহার মস্তিষ্কে জ্বালা ধরে—এখানেও ব্যতিক্রম হইতে পারে না। বিশেষত, মৃণালিনীর প্রতি এই মেয়েটির বেয়াদপি তাহাতে যেন আহুতি দেয়। তর্জনের সুরে সে তখন বলিয়া উঠেঃ থামো, তুমি থামো, বাবা তোমাকে বাড়িয়েছে বলে তুমি যে আমাদের টিকি ধরে কথা বলবে তা হবে না। মৃণাকে নাকি খোঁটা দিয়ে এসেছ, আমাকেও যা নয়

তাই বলছ, ভারি আস্পর্ধা হয়েছে তোমার দেখছি। জানো, তোমাকে এখুনি টিট করতে পারি?

রাজহংসীর মত গ্রীবাটি উঁচু করিয়া তরলা বলিয়া উঠে: চাবুক দিয়ে টিট করতে চান? বেশ ত—মারুন না চাবুক, পিঠ আমি পেতে দিচ্ছি।

ঠিক সেই সময় মৃণালিনী সেখানে আসিয়া পড়ে। চোখের ইশারায় নিবারণকে নিরস্ত করিয়া সে তরলার হাত দু'খানি ধরিয়া বলে: ওর কথায় রাগ ক'র না ভাই, আমরা ভাই-বোনে পরামর্শ করেই তোমার পিছনে লেগেছিলাম। দেখলাম—সত্যই তুমি খুব শক্ত মেয়ে। এসো, তোমাকে আমাদের লাইব্রেরী দেখাই।...নিবারণকে তাতাইয়া দিবার পর মৃণালিনী তাহার ভুল বুঝিতে পারে। তাহার পিসে মহাশয় যে মেয়েকে আদর করিয়া নিমন্ত্রণ করিয়াছেন, তাহাকে কোনরূপ আঘাত দিলে তাহার ফল যে বিপজ্জনক হইবে, তাহা বুঝিয়াই সে আভিজাত্যের ঔদ্ধত্য সবলে দমন করিয়া ব্যাপারটিকে সামলাইতে ছুটিয়া আসে।

কলহ তাহাদের মিটিয়া যায় সেইখানেই, কিন্তু সেদিনের সেই ঘটনাটি মাতৃহীন বেচারী গোবিন্দর অসহায় অবস্থার নজীর স্বরূপ স্বল্প কয়টি কথাকে কেন্দ্র করিয়া তরলার তরুণ মনের উপর এমনি একটা ছাপ দিয়াছিল, যাহা মুছিয়া যায় নাই—কিছুতেই সে মুছিতে পারে নাই। বিবাহের পর শ্বশুর-বাড়ীর সংস্পর্শে কত দিন অতীত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু গাঙ্গুলী-বাড়ীর বড় খোকার সেই অপরূপ মুখভংগি ও মর্মস্পর্শী কথাগুলি সে ভুলে নাই—ভুলিতে পারে নাই। তাই, অনেক দিন পরে পিত্রালয়ে আসিবা মাত্র সেই অসহায় মানুষটির আশ্চর্য পরিবর্তনের কথা যখন সে শুনিতে পায়, বোধ হয় সারা বাগুলীর মধ্যে তাহার চেয়ে বেশী খুশী আর কেহ হয় নাই।

তাই, বকুল পুকুরে চক্রবর্তী গৃহিণী চপলাকেই যখন এই অসম্ভব ব্যাপারটি সম্বন্ধে তাহার মতামত জিজ্ঞাসা করিলেন, উত্তরে তরলা যে-

সব কথা শুনাইয়া দিল, তাহা চমকিত ও চমৎকৃত হইবারই মত। এই মেয়েটি সেদিনের যে সব কথা এত দিন মনের মধ্যে চাপিয়া রাখিয়াছিল, আজ ব্যক্ত করিয়া বুকখানাকে বুঝি হাল্কা করিয়া ফেলিল।

চক্রবর্ত্তী গৃহিণী গ্রাম্য সুবাদে অধিকাংশ মেয়ের দিদিমা। তাই তরলা তাঁহার কথার উত্তরে বলিল: এ সব কথা এত দিন চেপেই রেখেছিলাম দিদিমা, বড় ঘরের কথা দশ কান করতে নেই বলেই। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, বড় খোকাকে সেদিন দেখে আর তাঁর মুখে ঐ সব কথা-শুনে মনে আমার এমনি মায়া হয়েছিল যে, একটি দিনের জন্যেও বুঝি না ভেবে পারিনি। কিন্তু ঐ ভাবা ছাড়া আর ত কিছু করবার ক্ষমতা ছিল না দিদিমা! সেই ছেলে মানুষ হয়েছে, বিদ্বান হয়েছে, কলেক্টর সাহেবরা তাঁর সংগে আলাপ করে খুশী হয়েছেন—আর বিয়ের পর বউ-এর তদ্বিরেই এমনটি হয়েছে শুনলে সত্যিই অবাক হতে হয় বৈ কি!

সুষমা নামে একটি মেয়ে চুপ করিয়া কথাগুলি এতক্ষণ শুনিতেছিল। এই সময় সে হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিল: আচ্ছা ভাই তরলা, এ গ্রামের মধ্যে তুমিই ত লেখাপড়ায় সবার সেরা; জলপানি পেয়েছ, তার ওপর কর্তাবাবুর দেওয়া অমন দামী সোনার পদক—তা ভাই, তুমিই বল ত—বড় খোকাকে যখন দেখেছ, তার জন্যে ভেবেছ, তা—তুমি চেষ্টা করলে তাকে এত শীগ্‌গির এমন করে পণ্ডিত করে তুলতে পারতে?

একটুও না ভাবিয়া তরলা তৎক্ষণাৎ উত্তর করিল: অবাক কাণ্ড ত এইখানেই ভাই! কত বছর মা সরস্বতীর দোরে ধর্না দিয়ে তবে বই পড়ার মত বিদ্যে হয়—সে ত আমরা ভাই সবাই জানি! তাই ভাবি, বিয়ের জল গায়ে পড়তে না পড়তেই চণ্ডী বউ কি করে ঐ আকাট মূর্খকে লেখা-পড়ায় অমন দিগ্‌গজ করে তুলতে পেরেছে? আমার সাধ্য কি ভাই, এমন তাজ্জব কাণ্ড করতে পারি! আর আমি ত ভাই সবে

এসেছি, চণ্ডী বউকে এখনো দেখিনি—ইচ্ছা আছে এক দিন যাব দেখতে—যেমন করে মন্দিরে ঠাকুর দেবতাকে দেখতে যাই।

যদু ঘোষালের মেয়ে সাবিত্রী বলিল: দেখবারও উপায় ছিল না কি? কত বার ত গিয়েছি দেখা করতে; শুনি পুরোনো মহলের দরজা সর্বক্ষণই বন্ধ থাকে—কেউ সেদিকে ভয়ে ঘেঁষে না। এই নিয়ে কত কথাই ওঠে—ও মা এ কি কাণ্ড বউএর? দিনের বেলায় সর্বক্ষণ বর নিয়ে পড়ে থাকতে লজ্জা করে না? কত টিটকিরি, কত মস্‌করা, তবু যদি বর হত মানুষের মতন মানুষ!

ভুবন দত্তের ভগিনী তরংগিণী এই সময় ঝংকার দিয়া উঠিল: তার পর বউ যেদিন সব ফাঁস করে দিল হাটের মাঝে হাঁড়ি ভেংগে দিয়ে—তখন সবার হলো হুঁস! যারা টিটকিরি দিত, মস্‌করা করত—থোঁতা মুখ তাদের একবারে ভোঁতা হয়ে গেল—বুঝল, বউ অমানুষ বরকে নিয়ে দিন-রাত কি সার্থক তপিস্যেই করেছে।

গ্রামের সর্বজনীন ঠাকুমা বগলা দেবী এতক্ষণ জল-সন্নিহিত শেষ ধাপটিতে নীরবে বসিয়া আহ্নিক করিতেছিলেন। সে পর্ব শেষ হইতেই সহসা মুখ ফিরাইয়া দলটিকে এক নজরে দেখিয়া লইলেন, তাহার পর মুখখানি ঈষৎ মচকাইয়া বলিলেন: তোদের সব হলো কি? যেখানেই যাই—চণ্ডী বউএর কথা ছাড়া আর কথা নেই কারুর মুখে!

তরংগিণী মেয়েটি তরুণীদের মধ্যে সব চেয়ে মুখরা, যে কথার দাম নেই, গুরুজনের বাণী হইলেও তাহাকে সমীহ করিবার পাত্রীই সে নয়। কাজেই থপ করিয়া ঠাকুমার মুখের উপর বলিয়া ফেলিল: এ রকম কথা এর আগে আর শুনেছ ঠাকুমা? শুধু শোনা কথাও নয়—যাদের নিয়ে কথা, আমাদেরই আপন জন তারা, গ্রামের মাথা—চোখে দেখা মানুষ, এ কথা শুনলেও পুণ্যি হয় ঠাকুমা! তিন কাল কাটিয়ে ত চার কালে পা দিয়েছ, তুমিই বল—এমন তাজ্জব কথা শুনেছ কোন দিন এই চার কালের ভিতরে?

একরত্তি মেয়ের কথায় ঠাকুমা ফোঁস করিয়া উঠিলেন : শোন মেয়ের কথা—লঘু-গুরু জ্ঞান নেই, যা মুখে আসে তাই বলে যায়, যে মেয়েকে নিয়ে অত করে ঘোঁট পাকাচ্ছিস্ তোরা, বড় মানুষের বাড়ীর বউ হয়ে সে এসেছিল, তাই তার এত আধিখ্যেতা। পড়ত আমাদের মতন গরীবদের ঘরে—কি করে বরটিকে নিয়ে ঘেঁটু বউ হয়ে থাকত বুঝতুম তখন! বড় ঘরের কথাই আলাদা—উঠতে দাসী, বসতে দাসী, পাশ ফিরাতে দাসী, দাঁতের কুটোটি পর্যন্ত মাইনে করা দাসী-বাঁদীরা যোগাতে যেখানে হাজির থাকে, সেখানকার কথাই আলাদা! বলে—রাজার নন্দিনী প্যারী যা করে তা শোভা পায়! গরীবের ঘরে পড়ে ঐ কীর্তি করতে পারত, তাহলে বলতুম—হ্যাঁ।

সংগে সংগে তরংগিণীও উত্তর করিল : যে খেলতে জানে, কাণাকড়ি চেলেই সে বাজী জেতে—বুঝলে ঠাকুমা! তুমি যে সব কথা বললে—বাড়িয়ে বলেছ ; চণ্ডী বউ নিজে গরীবের মেয়ে বলে রাজবাড়ীর বউ হয়েও সে কথা ভোলেনি। উঠতে বসতে দাসী বাহাল থাকলেও সে বলেছিল—দরকার নেই ওদের, নিজের কাজ-কর্ম নিজের হাতে করাই আমার অভ্যেস। কোন কিছুতে সে বড়মানুষী করেনি, বাড়ীতে থাকতে গেলে যা না নিলেই নয়—তার বেশী কিছুই সে ছোঁয়নি। বইগুলো তার নিজের ; তরলা যে লাইব্রেরীর কথা বললে—সে ঘরেও চণ্ডী বউ একটি বার সেঁধোয়নি, পাছে কেউ অন্য কিছু ভাবে তাই! আর—এ কথাও বলি ঠাকুমা, গরীবের ঘরেও যদি চণ্ডী বউ পড়ত, আর তার বর হত মুখ্যু জড়ভরত—গরীবের মত হালেই সে তাকে মানুষ করত, তবে এত তাড়াতাড়ি হয়ত হয়ে উঠত না, আরও সময় নিত। তাই বলে অদৃষ্টের লিখন ভেবে সে চুপ করে থাকত না এটা ঠিক। এখন তুমিই বল ঠাকুমা! এমন মেয়ের কথা তুলে পুণ্যি করিছি, কি পাপ করিছি!

নিরুপায় হইয়া ঠাকুমাকে এবার মুখখানি মচকাইয়া বলিতে হইল :

তোমাদের সংগে কথায় কে পারবে বাছা, তার চেয়ে এক কাজ কর—চণ্ডী বউএর ব্যাখ্যানা করে ছড়া বেঁধে সবাই মিলে সারা গেরামখানা প্রেদক্ষিণ করতে বের হও—ইতর, ভদ্দর, সবাই দেখুক, শুনুক—

ঠাকুমার প্রস্তাবটি যেন লুফিয়া লইয়াই তরলা সহর্ষে বলিয়া উঠিল : ঠাকুমার মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক, আমিও ঠিক এই কথা বলব বলব ভাবছিলাম—এখন ঠাকুমাই দেখছি পথ বেঁধে দিলেন। তা'হলে এক কাজ করা যাক—সবাই মিলে চল এক দিন বড় বাড়ীতে চণ্ডী দর্শন করতে যাই ; সেখানে সামনে তাঁকে বসিয়ে আলতা-সিঁদুর পরাব, নিজেদের হাতে গাঁথা ফুলের মালা চড়াব তাঁর গলায়, হাতে দেব সিঁদুর-চুপড়ি—তাতে থাকবে শাঁখা-সিঁদূর কড়, তার পর হেঁট হয়ে গড় করে বলব—বাঙলা দেশের ঘরে ঘরে তোমার মতন মেয়ে হোক, তোমার কথা হোক মেয়েদের জপমালা।

উচ্ছ্বাসের সুরে তরংগিণী বলিল : সত্যি—চমৎকার হবে ; চণ্ডী বউও জানবে—তার হাওয়া আমাদের গায়ে লেগেছে। কিন্তু ভাই তরলাদি, তুমি ঠাট্টা করছ না তো ?

তরলা উত্তর করিল : আমার স্বভাব হচ্ছে ভাই, হাঁসের মতন সার ভাগ গ্রহণ করা। ঠাকুমার কথা থেকে সার কথাটুকুই নিয়েছি যখন—এ অব্যর্থ। কাল দুপুরে আমাদের বাড়ীতেই তাহ'লে একটা বৈঠক করা যাক, অবশ্যি যদি তোমাদের আপত্তি কিছু না থাকে।

অনেকগুলি মেয়েই একসঙ্গে তরলার প্রস্তাবটি সমর্থন করিয়া জানাইল যে, কোন আপত্তি তাহাদের নাই, আর তরলাদের বাড়ীই তাদের বৈঠকের পক্ষে উপযুক্ত স্থান। কেবল তরলার প্রতিবেশিনী শিবানী নামে এক কিশোরী চোখ দু'টি ঠাকুমার মুখের দিকে ঘুরাইয়া প্রশ্ন তুলিল : তবে যে ঠাকুমা বললেন, সারা গেরামখানা প্রেদক্ষিণ করতে—তার কি হবে ?

মুখ টিপিয়া হাসিয়া তরলা শিবানীর প্রশ্নের জবাব দিল: ঠাকুমাকে ধর, উনি যদি মুখপাত হয়ে দাঁড়ান, তাহ'লে আমরাও ওঁর পিছনে দাঁড়াব—উনি আমাদের চালিয়ে নিয়ে যাবেন গ্রাম প্রদক্ষিণ করতে।

করতালি দিয়া খিল-খিল করিয়া হাসিতে হাসিতে শিবানী বলিল: বেশ হবে, আমি তাহলে ঠাকুমার হাতে একটা নিশেন দেব, ঠাকুমাকে ভারি মানাবে। যাবে ত ঠাকুমা—বলো?

কোপ-কটাক্ষে শিবানীর পানে চাহিয়া ঠাকুমা বলিলেন: বেশ ত, ঐটেই আর বাকী থাকে কেন—কালে-কালে কতই দেখলুম, আর কিছু কাল যদি বেঁচে থাকি কত তাজ্জবই দেখব লো!

কিশোরীরা ঠাকুমা'র কথার সুরে সুর মিশাইয়া খিল-খিল করিয়া হাসিয়া করতালি দিল।

* * *

বাগুলীর সাধারণ পাঠাগারটিও বহু দিন পরে সম্প্রতি সভ্যদের সমাগমে দিব্য জাঁকিয়া উঠিয়াছে। গাঙ্গুলী বাবুদের দাতব্য চিকিৎসালয়টির সন্নিকটে এই পাঠাগারটি উন্নত গ্রামখানির সংস্কৃতিগত বৈশিষ্ট্যের সাক্ষ্য দিয়া থাকে। পাঠাগার-ভবনটি বাগুলীর ভূস্বামীদের জমির উপর তাঁহাদের ব্যয়েই নির্মিত এবং আসবাবপত্র ও পুস্তকাদির অধিকাংশই তাঁহাদেরই অর্থে ক্রীত হইয়া পাঠাগারটিকে সর্বসৌষ্ঠবান্বিত করে। ইহার প্রতিষ্ঠা-কালে প্রাক্তন জনপ্রিয় চিকিৎসক অমরনাথ ছিলেন বাগুলী চিকিৎসালয়ের পরিচালক। চিকিৎসা-বিজ্ঞানে পরম পণ্ডিত হইয়াও তিনি যে সাহিত্যেরও সাধক ছিলেন, জমিদার হরিনারায়ণ গাঙ্গুলী এবং দেওয়ান রাধানাথ বাগুলীর তাহা অবিদিত ছিল না। সুতরাং নবগঠিত সাহিত্যায়নটির ভারও অমরনাথকে গ্রহণ করায়, তাঁহার নিষ্ঠাপূর্ণ তত্ত্বাবধানের ফলেই পাঠাগারটি সর্বপ্রকারে প্রতিষ্ঠাপন্ন হইয়াছিল।

ডাক্তার অমরনাথের বাগুলী-ত্যাগের পর ডাক্তার বিশ্বামিত্র মজুমদার

দাতব্য চিকিৎসালয়ের ভার গ্রহণ করিলে পাঠাগারটির ভারও তাঁহার উপর অর্পণের প্রস্তাব উঠিয়াছিল। কিন্তু ডাক্তার বিশ্বামিত্র ওরফে বিশু ডাক্তার সাহিত্য-প্রতিষ্ঠানের নামেই জলাতংকগ্রস্ত রোগীর ন্যায় শিহরিয়া উঠিয়া বলিয়াছিলেন—মাপ করবেন আমাকে; ও-সব ব্যাপারের ত্রিসীমায়ও আমি যেতে রাজী নই। সাহিত্যকে আমি একটা মারাত্মক নেশা মনে করি—আমার সে সখ বা স্পৃহা নেই। আমি ডাক্তার, পেশা আমার ডাক্তারী। লাইব্রেরীর সংগে আমার ডিসপেন্সারী খাপ খাবে না—কিছুতেই না, ও অনুরোধ আমাকে করবেন না।

ইহার পর আর কথা উঠিতে পারে না। কাজেই পাঠাগার কমিটী গ্রামের ভিতর হইতেই এক ব্যক্তিকে ডাক্তার অমরনাথের স্থলে নির্বাচিত করিয়া কাজ চালাইতে থাকেন। কিন্তু তাহার পর পাঠাগারটি যেন ক্রমশঃ ঝিমাইয়া পড়ে। এক কালের বীচিমালা-বিক্ষুব্ধ তেজস্বিনী তটিনীর গতিপথে দুর্নিবার বাধা পড়িলে তাহার চঞ্চল বারিধারা যে ভাবে অতীতের কথা ভাবিয়া স্থির হইয়া থাকে—গতিহারা পাঠাগারটির অবস্থাও তেমনি থম থমে হইয়া পড়ে।

তাহার পর—বাশুলীর গাঙ্গুলী-বাড়ীর সাম্প্রতিক বিস্ময়কর ঘটনা-সূত্রে গ্রামখানি ভাবাবেগে উদ্বেলিত হইয়া উঠিলে, তাহার সংগে সংগে স্থানীয় সাংস্কৃতিক জনপ্রতিষ্ঠানগুলিতেও সেই আবেগের দোলা লাগে।

রাজীব রায় নামে আঠারো-উনিশ বছরের একটি ছেলে এই সময় বাশুলী গ্রামে আসিয়া হঠাৎ উপস্থিত হয় এবং গ্রামের বৈষ্ণপাড়ায় বরদা নাম্নী যে বিধবাটির গৃহে আশ্রয় লয়, তাহার এক কিশোরী কন্যা ব্যতীত পরিজন বলিতে আর কেহ নাই। বরদার স্বামী বৈদ্যের ব্যবসায় করিতেন, পাঁচ-ছয় বৎসর হইতে চলিল তিনি দেহত্যাগ করিয়াছেন। খান দুই মাটির ঘর ও সামান্য কিছু জমি-জমা সম্বল করিয়া বরদা কোন রকমে চতুর্দশী কিশোরী কন্যা শিবানীকে লইয়া দিনপাত করেন। প্রতিবেশী

বৈদ্যনাথ গুপ্ত এবং অন্যান্য দরদী ব্যক্তিরা সকন্যা বরদাকে দেখা-শোনা করেন। বিধবা প্রৌঢ়ার বিশুদ্ধ প্রকৃতি ও সেবাপরায়ণতার জন্য বাশুলীর আবাল-বৃদ্ধবনিতা তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতে যেমন অভ্যস্ত ছিলেন, তাঁহার কন্যা শিবানীর বিকাশোন্মুখ সৌন্দর্য ও কিশোরীসুলভ চঞ্চল মাধুর্যও তেমনই তাঁহাদের স্নেহ আকর্ষণ করে।

রাজীবকে পাইয়া বরদা যেন বর্ত্তাইয়া গিয়াছেন। যদিও তিনি এই প্রিয়দর্শন মিষ্টভাষী ছেলেটিকে ইহার পূর্ব্বে কোন দিন দেখেন নাই, কিন্তু রাজীব যে পরিচয় দেয়, তাহাতে দূর-সম্পর্কীয় আত্মীয়বংশের এই ছেলেটিকে চিনিতে তাঁহার অসুবিধা হয় নাই। রাজীবের পিতা ছিলেন নামকরা কংগ্রেসকর্মী, তাহার উপর চরমপন্থী—বিপ্লবী। স্বাধীনতা-সংগ্রামের অনির্বাণ বহ্নিতে যথাসর্বস্ব ও জীবন পর্য্যন্ত উৎসর্গ করেন তিনি। কিন্তু তাহাতেও সাম্রাজ্যবাদী সরকারের প্রতিহিংসা শান্ত হয় নাই—বিপ্লবী পিতার পুত্র বলিয়া রাজীবের শিক্ষা-জীবন পদে পদে বিপন্ন হইয়া উঠে, স্বর্গত শহীদের সন্তানের জীবন হইতে বিদ্রোহের বীজাণু আবিষ্কারে বদ্ধপরিকর পরমোৎসাহী গোয়েন্দাদের সহিত রাজীবের সে কি মনস্তাত্ত্বিক সংগ্রাম! সেই সংকট কালে বংগ-শার্দুল দুঃসাহসী স্যার আশুতোষের প্রসাদে রাজীবের পক্ষে শিক্ষা-সমুদ্র অতিক্রম করা কোন প্রকারে সম্ভব হইলেও কর্মক্ষেত্রের পথ এমনই বিঘ্নসংকুল হইয়া উঠে যে, রাজধানীর পরিবেশ হইতে বিদায় লইয়া অবশেষে তাহাকে পল্লীবাসিনী এই দূর-সম্পর্কীয়া আত্মীয়াটির গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়।

রাজীবকে পাইয়া নানা কারণে বরদা উৎফুল্ল হইয়া উঠেন। প্রথমত, একান্ত অসময়ে বিধাতা পুরুষ তাঁহার পিছনে এমন একটি ছেলেকে একান্ত আপনার জনের মত আনিয়া দিলেন যাহাকে নিঃসন্দিগ্ধ চিত্তে নির্ভর এবং বিশ্বাস করা চলে। দ্বিতীয়ত, ছেলেটির যেরূপ বিদ্যা-বুদ্ধি ও প্রতিভা—এই বয়সেই সে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলিতে উত্তীর্ণ হইয়া যে খ্যাতি

পাইয়াছে, তাহাতে সহৃদয় জমিদার বাবুর সৌজন্যেই তাহার একটা উপায় হইয়া যাইবে। তৃতীয়ত, শিবানী কৈশোরের সীমা অতিক্রম করিতে চলিয়াছে—তাহাকে পাত্রস্থ করিবার জন্য তিনি ত অস্থির হইয়া পড়িয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারই অন্তরের টানে বাড়ী বহিয়া যে ছেলে আসিয়াছে, তাহার চেয়ে রূপে-গুণে সৎপাত্র তিনি কোথায় পাইবেন ?

রাজীবের আসার চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই এ বাড়ীর শ্রী বুঝি ফিরিয়া যায়। নিজের কৃতিত্বে রাজীব যেমন তাহার একটি বিশিষ্ট স্থান এখানে করিয়া লয়, তেমনি তাহার তরুণ মনের স্বতঃস্ফূর্ত গতিকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া কিশোরী শিবানীকেও অবাক করিয়া দেয়। হাস্যমুখ মিষ্টভাষী এই ছেলেটির প্রকৃতি যেন বিধাতা লোহা দিয়া গড়িয়াছেন ; স্নেহের পরশে বা আর্তের দুঃখে যে চিত্ত তুষারের মত বিগলিত হয়, পক্ষান্তরে তাহায় আত্মসম্মান হানিকর কোনরূপ অপমানের আঘাত পড়িলে সেই চিত্ত চিকুরবর্ষী মেঘের মতই অগ্নিগর্ভ হইয়া উঠে। বুদ্ধিমতী বরদা রাজীবকে দুই দিন সংসারে রাখিয়াই বুঝিয়াছিলেন যে, এ ছেলে খাঁটি সোনা, হাজার ছেলের ভিতর হইতে এমন একটি ছেলে সহজে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

দু'দিনেই ছেলেটি সকলের সহিত ভাব করিয়া তাহাদের অন্তরের মধ্যে আপনার স্থান করিয়া লইতে সমর্থ হয়। তাহার বিদ্যার পরিচয় পাইয়া এবং এই গ্রামেই সে স্থায়ীভাবে থাকিবে জানিতে পারিয়া পাঠাগারের সদস্যগণ এক বৈঠকে তাহাকেই সম্পাদক মনোনীত করেন। রাজীব কতিপয় সর্তে সে দায়িত্ব গ্রহণ করে। এবং এই মর্মে একটা বিবৃতিও সে দেয় : বর্ষাপ্রমত্ত নদীর মত সে কিন্তু এই পাঠাগারটিকে একটা প্রচণ্ড গতি দিবে ; কৃপণের মত সঞ্চিত বস্তু ভাঁড়ারজাত করে রাখলে যেমন তার কোন সার্থকতা থাকে না, পাঠাগারে আলমারির তাকগুলি হরেক রকমের বইয়ে ভরিয়ে রেখেও তেমনি কোন লাভ নেই—প্রত্যেক বইখানি যদি রীতিমত ভাবে পাঠক-মহলে পরিবেষণের ব্যবস্থা না থাকে।

এই পাঠাগারটি হবে একাধারে গ্রামের টাউনহল, শিক্ষা-পরিষৎ, কৃষ্টি ও সংস্কৃতি প্রচারের ক্ষেত্র। অশিক্ষা ও নিরক্ষরতা দূরীকরণের ব্রত গ্রহণ করবে এই পাঠাগার, গৃহে গৃহে সৎশিক্ষার প্রসার করাই হবে এর উদ্দেশ্য।

সদস্যগণ রাজীবের পরিকল্পনার প্রতিটি সর্তে সানন্দে সম্মতি জানাইয়া তাহাকে উৎসাহিত করেন এবং এত দিনে উপযুক্ত কর্মীর হাতে পড়িয়া পাঠাগারটি পূর্বের মত প্রতিষ্ঠাপন্ন হইবে ভাবিয়া উৎফুল্ল হন।

ইহার কয়েক সপ্তাহ পরেই গাঙ্গুলী-বাড়ীর রহস্যময় কাহিনী গ্রাম মধ্যে যে বিস্ময়াবহ পরিস্থিতির উদ্ভব করে, তাহাতে নবাগত রাজীব ছেলেটিই বুঝি সর্বাধিক সন্তুষ্ট ও অভিভূত হয়। সর্বসাধারণের মত জড়বুদ্ধি গোবিন্দর ব্যর্থ জীবনের কাহিনী সে-ও শুনিয়াছিল; এই প্রসংগে শ্যামাপুরের এক তেজস্বিনী কন্যাকে অপদার্থ পুত্রের অভিশপ্ত জীবনের সংগিনী করিবার বেদনাদায়ক কাহিনী তাহাকে এমনই ব্যথিত করে যে—আদর্শ ভূস্বামী হরিনারায়ণ গাঙ্গুলীর প্রতি তাহার স্বাভাবিক শ্রদ্ধা পর্যন্ত ম্লান হইয়া যায়। এক ব্যর্থ-জীবনের সহিত স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিভাদীপ্ত বহু সম্ভাবিত নারী-জীবনের মিলন-গ্রন্থি-রচনা চূড়ান্ত স্বার্থপরতার নিদর্শন ভাবিয়া সে যখন রীতিমত একটা অস্বস্তি বোধ করিতেছিল, সেই সময় নিয়তির বিচিত্র পরিহাসের মত অত বড় গুরুত্বপূর্ণ পরিস্থিতি একেবারে উল্টাইয়া গেল—কল্পলোকের কালিদাসের যুগ যেন বিংশ শতাব্দীর এই অবিশ্বাসী যুগের উপর নূতন একটা বাস্তব আলেখ্য তুলিয়া ধরিল। দিবালোকের মত সেই সত্য ও সুস্পষ্ট চিত্রটি হাসিয়া উপেক্ষা করিবার মত নয়; জেলার দুই বিচক্ষণ রাজপুরুষ প্রত্যক্ষ করিয়া অপ্রস্তুত হইয়াছেন, জড়বুদ্ধি যুবার মধ্যে শিক্ষাশুদ্ধ বিদ্যা-বুদ্ধির বিকাশ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গিয়াছেন। ইহার উপর আর কি বলিবার থাকিতে পারে? দেব-দর্শনের মত উদ্দাম স্পৃহা লইয়া কয় দিন ধরিয়া জমিদার-ভবনে জনপ্রবাহ

রহিয়াছে; সকলেই জানিয়াছে, শোনা কথা কল্প-কথা নহে—সত্য। সৌম্যমূর্তি গোবিন্দ দর্শনার্থীদের সংশয় মোচন করিয়াছে তার সহাস্য স্বল্প কথায়—এমন বহু আশার বাণী শুনাইয়াছে, যাহা এই বংশেই সম্ভব।

রাজীবও মুগ্ধ হইয়া ভাবিয়াছে স্পর্শমণির কথা। সে মণির পরশে লোহা পায় স্বর্ণের আকৃতি। সেই মণি-মন্‌জিমা কি এই মহীয়সী মেয়েটি মর্ম পেটিকায় ভরিয়া আনিয়াছিলেন? রাজীবের সারা অন্তর মথিত করিয়া অদম্য এক আগ্রহ সঞ্চারিত হইতেছিল—তাঁহার চরণাম্বুজে সভক্তি পুষ্পাঞ্জলি দিয়া জীবনকে সার্থক করিতে। কিন্তু সে আগ্রহ কি তাহার সিদ্ধ ও চরিতার্থ হইবে?

রাজীবের আহ্বানেই পাঠাগারে সেদিন সদস্যগণ উপস্থিত হইয়াছেন। রাজীব সর্বসমক্ষে এই মর্মে এক প্রস্তাব উত্থাপিত করিল:

এই পাঠাগারের প্রতিষ্ঠাতা বাশুলীর দানশীল ভূস্বামী শ্রদ্ধাস্পদ হরিনারায়ণ গাঙ্গুলী মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীগোবিন্দনারায়ণ সাধারণের সমক্ষে জড়বুদ্ধি মূর্খ বলিয়া অভিহিত ছিলেন; কিন্তু সংপ্রতি অসাধারণ সাধনা-প্রভাবে তিনি স্বাভাবিক সুপ্ত বুদ্ধিকে জাগ্রত করিয়া যে-ভাবে জ্ঞান ও বিদ্যা লাভে সমর্থ হইয়াছেন, তাহা স্থির ও সুস্থবুদ্ধিসম্পন্ন মননশীলতার বিস্ময়াবহ পরিচায়ক। এই সম্পর্কে তাঁহার বিদুষী সহধর্মিণী মনস্বিনী শ্রীযুক্তা চণ্ডী দেবীর সহায়তাও শ্রদ্ধাসহকারে উল্লেখযোগ্য। এই পাঠাগারের কর্মীবৃন্দ এ জন্য গৌরব বোধ করিতেছে এবং পাঠাগার-প্রাঙ্গণে এক বিশেষ সভায় বিদ্যাসাধনায় সিদ্ধ সুধী শ্রীগোবিন্দনারায়ণ ও তাঁহার সহধর্মিণী শ্রীযুক্তা চণ্ডী দেবীকে বিশেষ ভাবে অভিনন্দিত করিতে সমুৎসুক হইয়াছে। সুষ্ঠু ভাবে এই অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন করিবার জন্য উপযুক্ত ব্যক্তিদিগকে লইয়া একটি কমিটী গঠিত হউক।

প্রস্তাবটি সময়োচিত ও সমীচীন হইয়াছে এবং ইহা উত্থাপিত করিয়া নবাগত কর্মী রাজীব রায় যে পাঠাগারটির মর্যাদা বাড়াইয়া

দিয়াছেন—তজ্জন্য প্রথমেই প্রস্তাবককে ধন্যবাদ দেওয়া হইল। কিন্তু প্রকাশ্য সভায় অভিনন্দন সম্পর্কে চণ্ডী দেবীর ন্যায় কুলবধূকে আমন্ত্রিত করিবার যে প্রসংগ প্রস্তাবে আছে তাহা বিধেয় কি না—সে সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠিল।

অনেকেই আলোচনা-সূত্রে আশংকা করিলেন যে, বাগুলীর প্রাচীন বিশিষ্ট ও মানী জমিদার-বংশের কুলবধূকে এই ভাবে আমন্ত্রিত করিলে তাহার ফল বিপরীত হইতে পারে। প্রস্তাবক নবাগত, এই জমিদার-বংশের কি বিপুল প্রতিষ্ঠা এবং বর্তমান জমিদার হরিনারায়ণ বাবুর প্রভাব-প্রতিপত্তি কিরূপ ব্যাপক ও বিরাট—তাহা তিনি সম্যক জ্ঞাত নহেন বলিয়াই এরূপ প্রস্তাব উপস্থিত করিতে সাহসী হইয়াছেন। তাঁহাদের মতে, জমিদার-পুত্র গোবিন্দনারায়ণকে আমন্ত্রণ করিয়া জমিদার-বধূর প্রসংগটি পরিত্যাগ করা উচিত।

কিন্তু প্রস্তাবক রাজীব রায় দৃঢ়তার সহিত প্রস্তাবের অনুকূলে যুক্তি প্রদর্শন করিল যে, এক বিস্ময়কর অবস্থার উদ্ভব হওয়াতেই এই অঞ্চলে প্রচণ্ড সাড়া পড়িয়াছে এবং যে-ভাবে প্রতিপত্তি ও প্রভাবশীল জমিদারের পুত্র ও বধূ স্বকীয় প্রচেষ্টায় সমস্যাটীকে অতুলনীয় করিয়া তুলিয়াছেন তাহা গতানুগতিক নহে। ইঁহাদের সাধনা কৌলিক মর্যাদা বা বিধি-নিষেধের অপেক্ষা রাখে নাই—সংস্কারমুক্ত মননশীলতা ও মানবতার পূজারীরূপেই তাঁহারা করিয়াছেন কর্তব্য পালন। এত বড় আদর্শবাদ শুদ্ধান্তের মধ্যে সুপ্তিমগ্ন থাকিলে সমাজ তাহাতে লাভবান ত হইবেই না বরং প্রবাদমুখে প্রসংগটি বিকৃত হইয়া অনিষ্ট সাধন করিবে। যে আদর্শ তাঁহারা সৃষ্টি করিয়াছেন—তাহার প্রতীক-রূপে যদি সর্বসমক্ষে প্রত্যক্ষ হইবার সাহস তাঁহাদের না থাকে, তাহা হইলে এই আদর্শবাদের কোন মূল্যই নাই, আভিজাত্যের দুর্গম স্তূপ মধ্যেই হইবে ইহার সমাধি।

রাজীবের এরূপ যুক্তিপূর্ণ উক্তি সকলেরই অন্তর স্পর্শ করিল। ইতিপূর্বে

যাঁহারা প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, তাঁহারাও আপত্তি প্রত্যাহার করিলেন। স্থির হইল, পাঠাগারের উদ্যোগে এক বিশেষ সভার অধিবেশনে জমিদার-পুত্র গোবিন্দনারায়ণ ও বধূ চণ্ডী দেবীকে অভিনন্দিত করা হইবে। সেই সভায় বাশুলীর অধিবাসিগণ—আবালবৃদ্ধবনিতা নির্বিশেষে—তাঁহাদের শ্রীমুখে বিদ্যা-সাধনার অবদান শুনিয়া চক্ষু-কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করিবেন।

এক
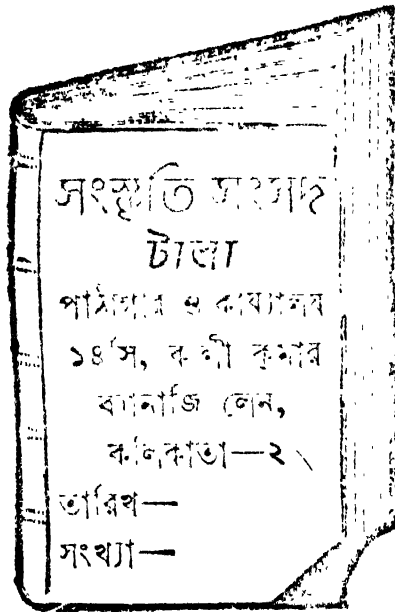
পূর্বোক্ত বিস্ময়াবহ ঘটনাটির প্রাক্কালে গাঙ্গুলী-বংশের বিরাট চূড়াটি ভাঙ্গিয়া পড়িবার মতই হইয়াছিল—সময়োচিত তৎপরতা এবং সুব্যবহার ফলে কোন রকমে সেটি রক্ষা পাইয়াছে। চূড়াও বুঝিয়াছেন, ক্ষমতা গর্বে খেয়ালের চাকা নির্বিচারে চালাইয়া যাইবার জিদ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে হইবে; বিশেষত, যে ক্ষমতার অহংকারে এত দিন তিনি বুঁদ হইয়াছিলেন, নিজের অকাট্য যুক্তি ও ব্যক্তিত্বের জোরে সকলকে দাবাইয়া রাখিতেন—কুলবধূ চণ্ডীর অসামান্য প্রতিভার দীপ্তিতে তাহা ম্লান হইয়া যাওয়ায় সহজাত সংস্কার-জনিত দুর্জয় জিদ ও ক্রোধকে আর প্রশ্রয় দেওয়া তাঁহার পক্ষে উচিত নহে। ইহাতেও প্রেরণা যোগাইয়াছে চণ্ডীর কতকগুলি জোরালো যুক্তি :

ডাক্তারদের কথা ত শুনলেন বাবা! একটা বছর আপনাকে বিষয়-আশয়, ভাবনা-চিন্তা, রাগ-দ্বেষ সব ছেড়ে একবারে নির্লিপ্ত থাকতে হবে।

হরিনারায়ণ বাবু বধূ চণ্ডীর কথার উত্তরে বলেন : নির্লিপ্ত থাকতে পারি না মা, যদি তুমি নিজে সব ভার নিয়ে আমাকে নিশ্চিন্ত করতে পার।

চণ্ডীও তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠে : এই এষ্টেটকে যে-ভাবে আপনি গড়ে তুলেছেন বাবা, তাতে কলের মত সহজ ধারাতেই এর চলবার কথা। তার পর বাপুলি কাকার মত পাকা মাথা—

হরিনারায়ণ বাবু বাধা দিয়া বলেন : কিন্তু ইঞ্জিন যখন বিগড়ে যায় মা, গাড়ী তখন আর চলে না—এমন অনেক নজির পাবে। ভার দিয়েছি অনেককে, শেষে কিন্তু সামলাতে হয়েছে এই শক্ত মাথাকে। এখানে চাই এমন একটা অদ্ভুত শক্তি—যে এষ্টেট চালাতে পারে। সেটা তোমার ঘটে আছে বলেই ও কথা বলিছি—তুমি যদি একটা বছর ভার নাও মা, আমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারি, কোন কথায় তখন আর কথা কইব না; রাগারাগির ভয়ও থাকবে না।

চণ্ডী তৎক্ষণাৎ অঞ্চলটি গলায় দিয়া হেঁট হইয়া শ্বশুরের পদধূলি লইয়া বলেঃ বেশ, আজ থেকে আপনার সব ভার আমিই নিলাম বাবা, আপনি একটা বছর নিশ্চিন্ত থাকুন।

বধূর সিন্দূর-চর্চিত উজ্জ্বল সীঁথির উপর শিথিল করপল্লবটি রাখিয়া হরিনারায়ণ বাবু গাঢ় স্বরে বলিতে থাকেনঃ এও তোমার এক মস্ত পরীক্ষা মা! মনে রেখো, নিরংকুশ ক্ষমতাই তোমাকে দেওয়া হচ্ছে বাশুলীর এই বিশাল এষ্টেট পরিচালনার ব্যাপারে। যেখানে যেটা প্রয়োজন, তোমার বিচারে যেটা ভালো মনে করবে, নিজেই স্বচ্ছন্দে এগিয়ে যাবে—আমাকে জানাবার বা আমার মতামতের কোন অপেক্ষা রাখবে না।

চণ্ডীও সহাস্যে দৃঢ় স্বরে উত্তর করেঃ তাহ'লে আপনাকে নিশ্চিন্ত থাকতে বলছিলাম কি জন্যে বাবা! আপনার অভিমতই বলুন আর অনুমতিই বলুন—যা কিছু নেবার, এখনই নেওয়া হয়ে গেল। আর আপনাকেও মনে করতে হবে বাবা, হাতের ধনুক থেকে তীরটা বেরিয়ে গেল আজ, তাকে আর ফেরানো চলবে না। হ্যাঁ, তবে একটা কথা—আপনি নিজে না বললেও, আমি না বলে পারছি নে। বছর পরে অবিশ্যি আপনি মুখ খুলবেন, আমার হার-জিতের পরীক্ষাও সেদিন হবে। ভার নিয়ে যদি ক্ষমতার কোন অপব্যবহার করে থাকি—তার জন্যে শাস্তি যদি দেন, মাথা পেতেই নেব; কিন্তু তার আগে আপনাকে বরাবর নিশ্চুপ থাকতে হবে বাবা!

বধূর প্রতি মৌখিক এই ভারার্পণের কথা শ্বশুর ও বধূ ভিন্ন অন্য কেহই জানিতে পারে নাই। কেবলমাত্র দেওয়ান রাধানাথ বাপুলীকে ডাকিয়া হরিনারায়ণ বাবু বলেনঃ ভারি শক্ত পাল্লায় পড়ে গেছি বাপুলী, চণ্ডীমা'র কাছে একরার করতে হয়েছে—একটা বছর একবারে নিশ্চুপ থাকব, জমিদারীর ব্যাপারে কথাটিও বলতে পারব না; মাথা গরম হয়, রাগে মন তেতে ওঠে, ভাবনা চিন্তা ঝড় তোলে—এমন কিচ্ছু করা

চলবে না। তবে ভরসা এই—আমার মাথার ভার বৌমা নিজের মাথায় তুলে নিয়েছেন। কাজেই সেই সোনার চাবুকটা আবার বৌমার হাতে গিয়েই উঠেছে—রাজা-রাজড়ার হাতে যেমন করে রাজদণ্ড ওঠে! আমার এখন ছুটি—বাস্।

যেদিন চণ্ডীর হাতে খোস-মেজাজে খেয়ালী কর্তা এই গুরুভার অর্পণ করেন, রাণী মাধুরী দেবী, নিবারণ ও মৃণালিনী তখন বাগুলীর প্রাসাদে ছিলেন না। তাঁহাদের দিক্ দিয়া সেই মর্মন্তুদ ঘটনার পর মাধুরী দেবী কিছু দিনের জন্য স্থান পরিবর্তন বাঞ্ছনীয় ভাবিয়া পুত্র নিবারণ ও ভ্রাতৃকন্যা মৃণালিনীর সহিত পিত্রালয়ে চলিয়া যান। স্বামীর সংকটাপন্ন অবস্থায় গৃহিণীর এ ভাবে যাওয়াটা অত্যন্ত অশোভন হইলেও, তাঁহার মানসিক অবস্থা উপলব্ধি করিয়া গৃহস্বামীই সাগ্রহে সম্মতি দেন; সুতরাং আর কোন কথা উঠিবার অবকাশ পায় নাই।

প্রত্যহ দু'টি বেলাই একবার করিয়া রাধানাথ বাপুলী গৃহস্বামীর কক্ষে আসিয়া কিছুক্ষণ কাটাইয়া যাইতেন। চণ্ডী তাঁহাকে অনুরোধ করে যে, বাহিরের খবর জানিবার জন্য কর্তার মনে আগ্রহ জাগিবেই; কিন্তু তিনি যেন তাঁহার আগ্রহে বিশেষ উৎসাহ না দেন—তাহা হইলে ক্রমশঃ তাঁহাকে বৈষয়িক চিন্তা হইতে নির্লিপ্ত করা সম্ভব হইবে। বাপুলীকেও এ জন্য খুব সতর্ক হইয়া কথাবার্তা বলিতে হইত। কথায়-কথায় এক দিন বাপুলী বলিলেনঃ চণ্ডীমার কাজকর্ম দেখে চমকে যাচ্ছি—সব দিকেই তাঁর কড়া নজর, একটু ভুলচুক নেই।

কি রকম বাপুলী—একটু বল হে, শুধু শুনেই যাব।

এই দেখুন না—দাতব্য চিকিৎসালয়ের জন্যে এক জন ভাল ডাক্তার আনতে হবে—একথা আমাদের মনেই ওঠেনি। আজ খবরের কাগজ খুলে দেখি, এরই মধ্যে মা আমার সে ব্যবস্থা করেছেন; ভাল ডাক্তার আনাবার জন্যে বিজ্ঞাপন ছেপে বেরিয়েছে।

দেখ কাণ্ড! ক'দিন ধরেই আমার মনে কথাটা উঠেছিল হে, কিন্তু বলি-বলি করে বলাই হয়নি, কিংবা ইচ্ছে করেই হয়ত বলিনি।

বোধ হয় দেখছিলেন বৌমার ওদিকে নজর পড়ে কি না! তা, যাই বলুন—চিন্তায় উনি আমাদের চেয়ে এগিয়ে যান।

সেই জন্যই ত হরিনারায়ণ গাঙ্গুলী নিশ্চিন্ত হয়ে বিছানায় পড়ে পড়ে দিন গুণছে হে বাগুলী, যা তার কোষ্ঠিতে কখনো লেখেনি।

দিন কয়েক পরেই মৃণালিনীকে লইয়া মাধুরী দেবী বাগুলীতে ফিরিলেন। হরিনারায়ণ বাবু বলিলেন: এত তাড়াতাড়ি আসবার কি দরকার ছিল, আরো কিছুদিন সেখানে থেকে দেহ আর মন দু'টোকেই একটু সুস্থ করে ফিরলেই পারতে?

মাধুরী দেবী বলিলেন: থাকতে পারলুম কৈ! তোমার এই অবস্থা, আমাদের এখন বাইরে থাকাটা কি ভাল দেখায়? তার ওপর মনও বেঁকে দাঁড়াল, তাই ছুটে এলুম।

নিবারণকে রেখে এলে?

হ্যাঁ, দাদা বললেন, এখানে দিন কতক থাকুক, রাখবার জন্যে পীড়াপীড়িও করলেন খুব; তাই রেখেই এলুম।

দাদা এখানকার ব্যাপার সব শুনেছেন ত?

শুনলেন বৈ কি।

শুনে কি বললেন?

আমাকেই বোক্‌লেন। বললেন—হাতের লক্ষ্মীকে আমি পায়ে ঠেলেছিলাম বলেই এমন করে ঠকতে হলো।

সেটা পূরণ করবার কোন হদীশ দেখিয়ে দেননি?

এ কথা বলবার মানে? কি ভেবে কথাটা বলা হলো শুনি?

ঠকবার কথা উঠলেই জিতবার কথা আসে, তাই বলেছি। নিবারণের

জন্যেই যে-কন্যাকে কনে সাব্যস্ত করে এনেছিলাম, সে রাজকন্যা নয়—গরীব কবিরাজের মেয়ে, এই অপরাধে তুমি তাকে প্রত্যাখ্যান করেছিলে বলেই সে গোবিন্দর ভাগ্যাকাশ আলো করতে পেরেছে। এখন এটাকে লোকসান ভেবে আফশোষ করে মনকে বিষাক্ত করা কি ভাল কথা? অপর পক্ষ—যে লাভ করেছে, যখন তোমার কাছেই মাতৃস্নেহ পাবার লোভে হাত পেতে দাঁড়িয়েছে!

স্বামীর এই কথাগুলি শুনিতে শুনিতে মাধুরী দেবীর মুখের ভাব ও ভংগি একেবারে বদলাইয়া গেল; তুই চক্ষুর জ্বলন্ত দৃষ্টি বৃদ্ধের বিশীর্ণ মুখের উপর নিবদ্ধ করিয়া তীক্ষ্ণ স্বরে তিনি বলিয়া উঠিলেন: দাদার মুখের ঐ কথাটা শুনেই তুমি স্থির করে নিয়েছ যে, ভাই-বোনে মিলে আমরা তোমার বড় ছেলে আর বৌমাকে জব্দ কববার জন্যে নতুন করে কোন যুদ্ধের ফন্দনা করেছি!

আহত কণ্ঠে হরিনারায়ণ বলিলেন: ছোট একটা কথাকে তুমি যে-ভাবে ফাঁপিয়ে বড় করে বলে গেলে, তাতে—'ঠাকুরঘরে কে, না—আমি ত কলা খাইনি'!—সেই পুরোনো ছড়াটাই মনে পড়ছে। কথার পিঠে এই নোংরা কথাটা না তুললেই ভাল করতে।

আরক্ত মুখখানাকে আরও উগ্র করিয়া মাধুরী দেবী প্রখর কণ্ঠে উত্তর করিলেন: তুমিই বা কোন মুখে বললে যে, তোমার বড় ছেলে ভাগ্য-লক্ষ্মী লাভ করে মাতৃস্নেহ পাবার লোভে আমার কাছে হাত পেতে দাঁড়িয়েছে, আর আমি যেন মুখ ফিরিয়ে রয়েছি? কি ভেবে তুমি এ কথা বললে? মুখে আটকালো না কথাগুলো বলতে? আর এ কথাগুলো নোংরা নয়—সুধার মত শুদ্ধ—তুমিই বলেছ বলে!

বেদনাহতের মত ক্লিষ্ট মুখভংগি করিয়া হরিনারায়ণ ক্ষণকাল গভীর দৃষ্টিতে মাধুরী দেবীর ক্রুদ্ধ মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, তাহার পর ধীরে ধীরে গাঢ় স্বরে বলিলেন: তাহ'লে আমিই হার স্বীকার করছি, হয়ত

ভুল বুঝেই বাড়াবাড়ি করে ফেলেছি। যাক্, এখন আমার একটা কথা রাখবে?

রুক্ষ স্বরে মাধুরী দেবী বলিলেন: হুকুম করলেই ত পারতে! এর জন্যে সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করবারই বা কি দরকার তা ত বুঝিনে!

আর্তস্বরে হরিনারায়ণ বলিলেন: কথা আমি বাড়াতে চাই নে, আর তোমার মনের কথাও আমার অজানা নয়। আমি যা বলব, ইচ্ছা করলে তুমি রাখতে পারবে। আমার দেহের অবস্থার দিকে একবার তাকিয়ে দেখ, বৌমা আমাকে আশ্বাস দিয়ে গেছেন—আমাকে আর কিছুই ভাবতে হবে না। অন্ততঃ একটা বছর আমি নিশ্চিন্ত থাকি, কোন গোল উঠে আমাকে ব্যস্ত না করে—এইটে এখন সবারই কাম্য হয়েছে। আচ্ছা—তুমিও কি আমাকে আশ্বাস দিতে পার না—যে চোখে নিবারণকে দেখ, নিবারণের বৌ এলে তাকে যে চোখে দেখবে—অন্তত এই ক'টা মাস গোবিন্দ আর চণ্ডী সেই স্নেহদৃষ্টিটুকুই তোমার কাছ থেকে পাবে—তোমার মনের কোন দিক্ থেকে তাতে একটুও কালিমা পড়বে না—এই প্রত্যাশাটুকু অন্তত এই একটা বছরের জন্য তোমার কাছ থেকে প্রত্যাশা করতে পারি না?

স্বামীর এই সুস্পষ্ট কথাগুলি শুনিতে শুনিতে মাধুরী দেবীর অন্তর মথিত করিয়া একটা শ্বাসবায়ু কালসর্পের নিশ্বাসের মত শ্বসিয়া উঠিল নাসারন্ধ্র দিয়া; সেই সঙ্গে দুই চক্ষুর জ্বালাময় দৃষ্টিকে কিঞ্চিৎ সংহত করিয়া তিনি বলিলেন: তোমার মনে, আর এই সংসারে এখন শান্তি বজায় রাখা খুবই যে উচিত, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু সেটা নির্ভর করছে তোমার বৌমার উপরেই।

মুখের কথায় ও চোখের দৃষ্টিতে একটা ব্যথার ভাব ফুটাইয়া হরিনারায়ণ বলিলেন: কথাটা আরম্ভ করেই গোড়ায় আবার খোঁচা দিলে কেন? বৌমা কি শুধু আমারই—তোমার নন?

কণ্ঠের স্বরে জোর দিয়া মাধুরী দেবী উত্তর করিলেন: না। তুমি ত জানো, মন রেখে কথা বলতে আমি পারি নে। গোবিনের বৌ করে তুমি যাকে এ বাড়ীতে এনেছ, তাকে 'আমার বৌমা' বলে দরদ দেখাবার কোন সুযোগ-সুবিধা ত তুমি আমাকে কোন দিন দাওনি; আমি জেনেছি, আমার দর্প চূর্ণ করতে তুমি এক প্রতিদ্বন্দ্বিনী এনে খাড়া করেছ। আর, আমার বিশ্বাস, তোমার বৌমাও তা জানে। যেদিন নিবারণকে শাস্তি দেবার জন্যে তোমার সেই সোনার চাবুক তার পিঠে ভাংগতে গিয়েছিলুম, তোমার বৌমা তা জানতে পেরে সেখানে ছুটে গিয়ে নিবারণকে রক্ষা করেছিল বলে ভেব না যে, আমি তাতে খুশী হয়ে ভেংগে পড়েছিলাম; বরং গায়ে পড়ে এসে সে-চাবুক আমার হাত থেকে কেড়ে নিয়ে তোমার বৌমা আমার পরাজয়ের লজ্জাকে সবার সামনে আরো স্পষ্ট করে দিলে—এইটিই আমি জেনেছিলুম। তাই তোমার ঐ দরদ-ভরা প্রশ্নের উত্তরে আমাকে বলতে হোচ্ছে—এক পক্ষের চেষ্টায় কোথাও কোন দিন স্থায়ী শান্তি আসে নি, আসতে পারে না। তোমার বৌমা যদি তাঁর অন্তর্দৃষ্টির আলোটি শুধু নিজের মহলটির ওপর না ছড়িয়ে এ-বাড়ীর চার দিকে ফেলে সবার মনের গতিটা দেখতে পারেন, তাহ'লে গোল কেন উঠবে, তা ত ভেবে পাইনে। তবে তিনি যদি এ-বাড়ীতে সবাইকে খাটো করে নিজের জিদটাই বড় করতে চান্, তাহ'লে আর যে-কেউ তার জন্যে তাঁকে যত বাহোবাই দিক, আমি সেটা সহ্য করতে পারব না; তখন তার প্রতিবাদ কিংবা এ বাড়ী পরিত্যাগ—এ দু'টোর একটা আমাকে করতেই হবে।

জোরে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া হরিনারায়ণ বলিলেন: আমি কি ভেবেছিলুম জানো—যে ঝামেলাটা হয়ে গেল, তাতেই সব চুকে-বুকে গেছে; তোমরাও বোঝাপড়া করে নিয়ে একটা স্থির সিদ্ধান্তে এসে পড়েছ। এমন ত অনেক বাড়ীতেই হতে দেখেছি, বড় একটা ঝড় ঝাপটার

পর সব আবার ঠিক হয়ে যায়। কিন্তু আমার বরাতে দেখছি সেটা উল্টো হয়ে যাচ্ছে। আরো একটা প্রচণ্ড সংগ্রামের আভাস আমি পাচ্ছি—জানি না সেটা ঠেকানো সম্ভব হবে কি না! আর যদিই সে সংগ্রাম হঠাৎ কোন কিছু উপলক্ষ করে এসে যায়, আমার অবস্থাই তখন সব চেয়ে ভীষণ হয়ে উঠবে। সেই জন্যেই আমি তোমাদের ক্ষমতা এমন ভাবে ভাগ করে দিতে চাইছি, যাতে এর পর আর ঠোকাঠুকির কোন ভয় না থাকে। এই সংসারের উপর তুমি যে ক্ষমতা বরাবর চালিয়ে আসছ, তোমার হাতেই সেটা অবিকল বজায় থাকুক। সংসারের ভালোর জন্যে তুমি যে ব্যবস্থাকে যুক্তিযুক্ত মনে করবে স্বচ্ছন্দে করে যেও, কেউ তাতে বাধা দেবে না—আমাকেও জানাবার কোন প্রয়োজন হবে না। এমনি বাইরের ব্যাপারে বৌমাকেও দেখা-শোনার ক্ষমতা দিয়ে তার এলাকাও আলাদা করে দেওয়া যাক। আমার আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে, দিন কতক নিশ্চিন্ত হয়ে শান্তি ভোগ করি। তবে, আমি মনে মনে এই ভরসাটুকু রাখি যে, তোমরা কেউই ইচ্ছা করে এমন কোন কাজে হাত দেবে না, যার জন্যে মনের মধ্যে বিকার আসতে পারে। তোমাদের দু'জনের কাছেই এই অনুরোধ আমি জানাচ্ছি।

যে সুরে হরিনারায়ণ কথাগুলি বলিলেন, তাতে মাধুরী দেবীর অভিভূত হইবারই কথা; কিন্তু সেস্থলে তাঁর মুখে ও চোখে হাসির রেখা স্পষ্ট হইয়া উঠিল। কণ্ঠস্বরই শুধু কোমল করিয়া তিনি বলিলেন: তোমার বৌমা তোমাকে কতখানি বুঝেছেন জানি নে, আমি কিন্তু আমার মনের কষ্টি-পাথরে কষে খুব ভালো করেই তোমাকে বুঝেছি। জান ত, সাপের হাঁচি বেদেয় চেনে। তোমার মুখ ও চোখের ভংগি, কথার সুর, বলবার ধারা প্রত্যেকটিই রহস্যে ভরা; সেই যে চলুতি কথা আছে না—'নাচাও ভাল, তবে পাক দাও এলো,' তোমারও হয়েছে তাই। তোমার বৌমাকে এক দফা যাচিয়ে নিয়ে,

আর তাকে দিয়ে আমাদের ভূর ভেঙে দিয়েও তোমার আশা মেটেনি—এখনো মনে মনে নতুন মতলব ভাঁজছ, আর নিজেই দুষ্টু বুদ্ধি খেলিয়ে দু'টো পক্ষ গড়ে নিয়ে ঢুঁ লড়াবার জন্মে তালিম দিচ্ছ। শান্তির ধূয়ো তুলে বোঝাবার এই চেষ্টাটাই বাজে—বাহ্যিক; আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে, তোমার বৌমার কাছে মায়ে-পোয়ে আমরা আর এক দফা অপদস্থ হয়ে সারা জীবনকাল মাথা নীচু করে থাকি।

অতি বিস্ময়ে চমৎকৃত হইবার মত মুখভংগি করিয়া হরিনারায়ণ বলিলেন: এ তুমি কি বলছ নতুন বৌ? আমি যে বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে যাচ্ছি গো!

মাধুরীও কথার সুরে ও মুখের ভংগিতে সহসা পরিহাস প্রকাশ করিয়া মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিলেন: সে ত হবেই গো! মনের বদ্ধ দুয়ারে কথার ঘা-টা পড়তেই এমনি চমকে উঠলে যে, অনেক দিন আগেকার ডাকটি পর্যন্ত সেখান থেকে সোহাগের সুরে বেরিয়ে এলো।

কিন্তু তুমি ভুল বুঝেছ, সত্যিই ভুল বুঝেছ; মনের মধ্যে ও-সব থল-কপট রেখে কোন দিনই আমি—

বেশ ত, তার জন্মে ত আমি মাথার দিব্যি দিয়ে বলছি নে—আমার কথা তোমাকে মানতেই হবে। আমি যা বুঝিছি, তাই তোমাকে বলেছি—এখন এ নিয়ে তর্ক করে কোন লাভ নেই। তবে এ কথা আমি জোর-গলায় তোমাকে বলে রাখছি—পায়ে পা তুলে ঝগড়া করতে আমি চাই নে, আর সে বয়সও আমার নেই। তবে আমার আত্ম-সম্মানের ওপরে ঘা পড়লে আমি যে মুখ বুজে সেটা সহ্য করব, সে প্রত্যাশাও যেন তুমি করো না।

আলোচ্য কথাটায় এইখানেই দাঁড়ি টানিয়া দিয়া মাধুরী দেবী তাড়াতাড়ি উঠিয়া গেলেন। হরিনারায়ণও ক্লান্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন, গৃহিণীর স্থানত্যাগে তিনিও যেন মনে মনে স্বস্তিবোধ করিলেন।

দুই

পরদিন অপরাহ্ণের দিকে আরাম কেদারায় অঙ্গ ঢালিয়া হরিনারায়ণ সংবাদপত্র পড়িতেছিলেন, এমন সময় লম্বা একখানা লেফাফা হাতে করিয়া মাধুরী দেবী সেখানে আসিলেন। স্বামীর কেদারার পার্শ্বে একখানা কেদারায় বসিয়া সহাস্যে বলিলেন: তোমার বৌমাকে ত বলতেই পারতে, খবরের কাগজখানা এ সময় পড়ে তোমাকে শুনিয়ে যান।

খপ করিয়া চশমাটি খুলিয়া খাপে ভরিয়া এবং সঙ্গে সঙ্গে কাগজখানি মুড়িয়া সামনের টিপয়ের উপর রাখিতে রাখিতে হরিনারায়ণ বলিলেন: এ খোঁচাটা আমার বৌমাকে না দিলেই পারতে। কারণ, তাঁকে বলবার প্রয়োজনই হয়নি—ক'দিন তিনিই কাগজ পড়ে শুনিয়ে গেছেন; কাল থেকে আমিই তাঁকে ছুটি দিয়েছি।

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া মাধুরী দেবী বলিলেন: আমি ফিরে এসেছি বলে?

গম্ভীর মুখে হরিনারায়ণ উত্তর করিলেন: হ্যাঁ, তোমার এ অনুমান ঠিক; আমি যখন তোমার এলাকার মধ্যে, এখানে তিনি কাগজ পড়ে শোনাতে না-ই বা এলেন। তুমিই সময় পেলে শুনিয়ে দেবে, মৃণাও রয়েছে, আমিও না হয় পড়লাম।

বাপ রে! একবারে চুলচেরা হিসেব যে!

উচিত নয়? কিন্তু হাতে ও লম্বা লেফাফাখানা কিসের?

মুখভংগি সহজ ও স্বর কোমল করিয়া মাধুরী দেবী বলিলেন: এখানা সংগেই এসেছে; কাল এর কথা তুলতেই ভুলে গিয়েছিলাম। এখন বলছি শোন; বিশু ডাক্তার ত গেল, তার জায়গায় ভাল ডাক্তার আর একজন চাই ত! তাই ওখানে যেতেই—আমাদের খুব জানা-শোনা নামী ডাক্তার শশী বাগচি এসে আমাকে ধরেন, আমার দাদার বিশেষ

বন্ধু, বাবাও তাঁকে খুব ভালবাসতেন, আমাদের এষ্টেটেই বরাবর কাজ করেছেন ফ্যামিলি ফিজিসিয়ন হয়ে—তিনি এখানে আসতে চান।

প্রস্তাবটি শুনিবা মাত্র হরিনারায়ণের প্রসন্ন মুখখানি সহসা ভার হইয়া উঠিল; অদ্ভুত একটু হাসিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন: বরাবর ও-বাড়ীতে যখন চিকিৎসা করছেন, এষ্টেটের সংগে জড়িয়ে আছেন—হঠাৎ এখানে আসতে চান কেন?

স্বামীর ভাবান্তর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করিয়া মাধুরী ক্ষণকাল চুপ করিয়া রহিলেন, তাহার পর একটু ইতস্ততঃ করিয়া মুখে একটু সংকোচের ভাব আনিয়া বলিলেন: আসতে চান আমারই পীড়াপীড়িতে, নিবারণের শরীরটা ভেংগে পড়েছে, তিনিই তাকে দেখ্‌ছেন কি না—এর পর এখানে এলে ওঁরই চিকিৎসাধীনে নিবারণকে রাখা যাবে। আর, চিকিৎসার ব্যাপারে ওঁর হাতযশও খুব—যেন ধন্বন্তরি। হালে ওঁর ছেলে এম-বি হয়েছেন। দাদার ইচ্ছা, ছেলেকে ওখানে বাহাল করেন, আর বাগচি-কাকা আমাদের এখানে আসেন। এটা তাঁরই দরখাস্ত। আমার বাবা, দাদা, মহিমপুরের রাজা, রায়গঞ্জের রাণী, সুলতানপুরের নবাব—এঁদের প্রশংসাপত্র আছে। আমি তাঁকে কথা দিয়েই এসেছি, নিবারণের সংগে তিনি আসছে সপ্তাহেই এখানে আসছেন।

মাধুরী দেবীর কথাগুলি শুনিতে শুনিতেই হরিনারায়ণ স্তব্ধ হইয়া গেলেন; মুখে কথা নাই, চোখে পলক পড়ে না—যেন মর্মর-মূর্তি; নির্বাক্, নিষ্প্রাণ।

সন্দিগ্ধ কণ্ঠে মাধুরী দেবী বলিলেন: কি হলো তোমার? কথাটা শুনেই এ রকম করে ঝিমিয়ে পড়বার মানে?

সোজা হইয়া বসিয়া জোরে একটি নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া হরিনারায়ণ বলিলেন: বাজনার তারে একসঙ্গেই তোমাদের দু'জনের হাত পড়েছে দেখে আমি বোধ হয় বিহ্বল হয়ে পড়েছিলাম।

দুই চোখের দৃষ্টি প্রখর করিয়া মাধুরী দেবী স্বামীর সেই অদ্ভুত মুখখানার উপর নিবদ্ধ করিলেন মাত্র—কিন্তু সেই দৃষ্টিতেই প্রশ্ন পাঠ করিয়া হরিনারায়ণ ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন : বিশু ডাক্তারের জায়গায় যে একজন ভালো ডাক্তারকে এনে বসাতে হবে এ কথা বৌমাও ভেবেছিলেন। ক'দিন আগে বাপুলীর মুখেই কথাটা জানতে পারি। তিনি কয়েকখানা খবরের কাগজে এর জন্যে বিজ্ঞাপন পর্যন্ত দিয়েছেন। দেখ মজা—তুমিও এ ব্যাপারে এগিয়ে গেছ, এমন কি—জানা-শোনা এক ডাক্তারকে কথা পর্যন্ত দিয়ে এসেছ! এখন ভাবছি, বিজ্ঞাপন দেখে বাইরে থেকে দরখাস্ত আসাও ত সম্ভব, চাই কি তাদের ভিতর থেকে কেউ মনোনীত হোলে তাকে আসবার জন্যে বৌমা চিঠিপত্রও লিখতে পারেন। কাজেই ডাক্তার বাগচির দরখাস্তখানা বৌমার সেরেস্তাতেই এখন পাঠানো উচিত—নয় কি?

শুদ্ধ হইয়াই মাধুরী দেবী স্বামীর মুখের কথাগুলি শুনিতেছিলেন। কথার শেষে ডাক্তার বাগচির দরখাস্তখানির গতিমুক্তির প্রস্তাবটি তুলিয়া হরিনারায়ণ গৃহিণীর মুখের দিকে চাহিতেই তিনি হঠাৎ কণ্ঠস্বর একটু বিকৃত করিয়াই বলিয়া উঠিলেন : ডাক্তারখানার ভার তা'হলে এরই মধ্যে তোমার বৌমার হাতে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে?

হরিনারায়ণ পুনরায় আপনাকে বিপন্নের মত অসহায় ভাবিয়া উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। সেদিন বৌমার উপর যে ভার তিনি স্বেচ্ছায় চাপাইয়া দিয়াছেন, সে কথা পত্নীর নিকট এ পর্যন্ত চাপিয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু পত্নীর আনীত দরখাস্তখানাই এখন এক নূতন বিপত্তি ডাকিয়া আনিল। তথাপি আসল কথাটিকে আড়ালে রাখিয়া মনে সাহস সঞ্চয় করিয়া তিনি বলিয়া ফেলিলেন : ওটা ত আর তোমার এলাকার মধ্যে পড়ছে না, এ সব ব্যাপারে নানা ঝন্‌ঝাট কি না, তাই কতকগুলো কাজের ভার বৌমার ওপর ফেলে দিয়েছি।

মাধুরী দেবী স্বামীর মুখের বাচন-ভংগি হইতে মনের খবরটি সংগ্রহ করিবার উদ্দেশ্যেই বোধ হয় নিবদ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়াছিলেন ; ভারার্পণ সম্পর্কে যুক্তিটা শুনিয়া প্রতিবাদের সুরে বলিলেন : কিন্তু বাড়ীর জন্যে ডাক্তার রাখাটা আমার এলাকার বাইরে কেন হতে যাবে ? এমন ডাক্তার আমি বাহাল করতে চাই, যাঁকে চোখ বুজিয়ে বাড়ীতে আনতে পারি, স্বভাব-চরিত্র জানা আছে, দেশের দশ জন মাথাওয়ালা লোক যাঁকে সুপারিশ করেছেন। আমিও ত তোমাকে আগেই বলেছিলুম, সত্যিকারের এক জন দরদী ডাক্তারকে বাড়ীর জন্যে এবার বাহাল করতে হবে !

হরিনারায়ণ আমতা-আমতা করিয়া বলিলেন : কিন্তু দাতব্য চিকিৎসা-লয়ের ভারটাও তাঁর ওপরে থাকছে কি না—মোটা মাইনের বারো আনা ওখানকার খাতেই ডাক্তারকে দেওয়া হয়। দাতব্য চিকিৎসা-বিভাগটা ত আর তোমার সংসারের সামিল করা যেতে পারে না, সেই জন্যেই—

স্বামীর কথায় বাধা দিয়া মাধুরী দেবী বলিলেন : তোমার কথা বুঝিছি। বেশ, ইচ্ছা হয়—ডাক্তার বাগচির দরখাস্তখানা তোমার বৌমার সেরেস্তাতে পাঠিয়ে দিতে পার। দরখাস্ত পড়লেই তোমার বৌমা জানতে পারবেন যে, এই ডাক্তার আমার বাপের বাড়ীর দেশের লোক, শুধু তাই নয়, বাপের বাড়ীর সংগে তাঁর সংশ্রবও আছে। আর ডাক্তার বাগচির নাম ও গুণের কথা কারুর অজানা নয় ; কিন্তু তবু আমি বলছি—এই ডাক্তারকে তোমার বৌমা কখনই আমল দেবেন না।

আগে থেকেই এ কথা তুমি বলছ কেন ? বেশ ত, দেখই না—বৌমা কি ব্যবস্থা করেন।

আমি যা বলেছি—তুমি একখানা কাগজে বরং লিখে রাখো।

হরিনারায়ণ কথাটা শুনিয়া একটু হাসিয়া বলিলেন : লেখবার দরকার হবে না, মনেই থাকবে। আর ফয়সলার আগেই তুমিও ত রায় দিয়ে এসেছ গো !

বিকৃত স্বরে মাধুরী জিজ্ঞাসা করিলেন : এর মানে ?

হরিনারায়ণ মানেটা ভাঙ্গিয়া দিলেন : একটু আগেই ত বললে, ডাক্তার বাগচিকে তুমি কথা দিয়েছ, নিবারণের সঙ্গে তিনি এসে পড়লেন বলে ! এদিকেও বৌমার সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করলে—তোমার মনোনীত ডাক্তারকে বৌমা কখনই বাহাল করবেন না। কাজেই কথাগুলো আমার কাছে জপমালার মতই হয়ে থাকছে। আমার অবস্থাটাও বুঝতে পারছ নিশ্চয়ই। আচ্ছা, ডাক্তার বাগচির দরখাস্তখানা ত দাও, দেখি আসন্ন ঝড়ের গতিটা যদি ফিরিয়ে তোমার মুখের কথাটাকেও ফেরাতে পারি।

দীর্ঘ লোফাফাখানি স্বামীর হাতে দিয়া মাধুরী দেবী দৃঢ় স্বরে বলিলেন : আমার মুখের কথা ফেরে না, যা বলি তা সত্যি হয়।

হরিনারায়ণও এবার মুখখানা শক্ত করিয়া ততোধিক দৃঢ় স্বরে বলিলেন : ও-কথা তোমার মুখে আর সাজে না নতুন বৌ !

স্বামীর স্বর যেন চাবুকের মত মাধুরী দেবীর মুখের উপর সপাৎ করিয়া পড়িল : বেদনাহতের মত মুখভংগি করিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন : মুখের কোন্ দোষটা দেখে কথাটা বলা হলো শুনি ?

সেদিনের কথা মনে পড়ে—গোবিন্দকে যেদিন মায়ের আদরে কোলে তুলে নিয়ে মানুষ করবার কথা তুলি ? শুনে তুমি এমনি করেই বলেছিলে—তা হবার নয়, পাথরকে চেষ্টা করে চালানো যায়, কিন্তু জাগানো যায় না। অথচ আমার বৌমা সে পাথরকে জাগিয়ে তোমার কথার ভুর ভেংগে দিয়েছেন, নতুন বৌ !

হঠাৎ রাণী মাধুরী দেবীর সুগৌর ও সুকঠিন মুখমণ্ডলে অদৃশ্য হস্তে কে যেন এক পোঁছ কালি মাখাইয়া দিল। স্বামীর মুখের উপর হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া মুক্ত গবাক্ষের সার্সির ফাঁক দিয়া বাহিরের আকাশের পানে ধীরে ধীরে তিনি সে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলেন।

পরক্ষণে খানকয়েক চিঠি লইয়া বালক ভৃত্য দুর্গাদাস কর্তার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

হাত বাড়াইয়া চিঠিগুলি লইয়াই হরিনারায়ণ চোখে চশমা পরিলেন। চিঠির শিরোনামায় দৃষ্টি পড়িতেই চশমার ভিতর দিয়াই তাঁহার দুই চক্ষু বিস্ফারিত হইয়া উঠিল। চারিখানি চিঠির শিরোনামায় যথাক্রমে হরিনারায়ণ, রাণী মাধুরী দেবী, নিবারণ ও মৃণালিনীর নামগুলি স্পষ্ট করিয়া লেখা। নিজ নামের চিঠিখানি খুলিতেই হরিনারায়ণ ব্যাপারটি বুঝিতে পারিলেন। সাধারণ পাঠাগারের কর্মীরা শ্রীগোবিন্দনারায়ণ ও তাঁহার সহধর্মিণী শ্রীমতী চণ্ডী দেবীকে অভিনন্দিত করিবার জন্য পাঠাগার-প্রাঙ্গণে এক বিশেষ সভা আহ্বান করিয়াছেন। এবং তাহাতে যোগ দিবার জন্য গাঙ্গুলী-পরিবার আমন্ত্রিত হইয়াছেন।

দুর্গাদাসের দিকে চাহিয়া হরিনারায়ণ বলিলেন: তুই সিঁড়ির ঘরে গিয়ে বস্, ডাকলে আসবি।

কলের পুতুলের মত দুর্গাদাস চলিয়া গেল।

নিজের নামের চিঠিখানি টিপয়ের উপর রাখিয়া বাকী তিনখানি চিঠি মাধুরী দেবীর হাতে দিয়া হরিনারায়ণ বলিলেন: পড়ে দেখ, নূতন এক ব্যাপার!

চিঠিখানা খুলিয়া এক নিশ্বাসে পড়িয়া মাধুরী দেবী গম্ভীর মুখে বলিলেন: মন্দ কি! তোমার বৌমার জন্যে লাইব্রেরীওয়ালারা আমাকে আর মৃণাকেও সভায় ডাকবার সাহস পেয়েছে। বলিহারি স্পর্ধা আর দুরাশা তাদের!

হরিনারায়ণ বলিলেন: গোবিন্দর সঙ্গে বৌমাকেও ওরা যখন মানপত্র দিতে চেয়েছে, তাতে বৌমা যদি সভায় যেতে পারেন, তোমাদেরও সেখানে পাবার আশা করাটাও কি ওদের অপরাধ হয়েছে—যাওয়া-না-যাওয়া যখন তোমাদের ইচ্ছাসাপেক্ষ?

কঠিন মুখে তিক্ত কণ্ঠে মাধুরী দেবী উত্তর করিলেন: আমাদের বংশের কোন মেয়েকে কেউ কখনো কোন সভায় ডাকতে ভরসা করেনি বলেই আমি কথাটা বলিছি। এতগুলো বছর ত তোমার বাড়ীতে কাটালাম—অনেক সভা-সমিতি হতে দেখিছি, কিন্তু আমার নামে এর আগে কেউ কোন চিঠি পাঠাতে পেরেছে বলতে পার? গাঙ্গুলী-বংশের বৌ লাইব্রেরীর সভায় গিয়ে বসবে, তুমি নিজেও কি এ কথা কোন দিন ভাবতে পেরেছিলে? যদি কেউ এ রকম একটা প্রস্তাব নিয়ে আসত তোমার কাছে, তুমি কি এমনি সহজ ভাবে সেটা নিতে পারতে? আশ্চর্য, মানুষের মন যে এত শীগ্‌গির এমন করে বদলে যেতে পারে, আমার সে ধারণাই ছিল না।

মৃদু হাসিয়া হরিনারায়ণ বলিলেন: কিন্তু দিনে দিনে যে পৃথিবীটাই বদলে যাচ্ছে, সেটা ভাবছ না কেন? তুমি বলতে চাইছ, সাধারণের সামনে কোন সভায় এ বংশের কোন বৌ কোন দিন যাননি, যাবার কল্পনাও করেননি। তেমনি, এ বংশের কোন বৌকে এর আগে গাঙ্গুলী-বংশের মুখ রাখবার জন্যে জেলার কালেক্টর ও পুলিশ সাহেবের সামনে গিয়ে সওয়াল জবাব করবারও প্রয়োজন দেখা দেয়নি। কিন্তু সংপ্রতি তার ব্যতিক্রম যখন হয়েছে—আমার বৌমাকেই প্রয়োজনের তাগিদে সাহেব-সুবোর সামনে গিয়ে দাঁড়াতে হয়েছে, তখন সাধারণ পাঠাগারের সভায় গিয়ে জনসাধারণের অভিনন্দন নেওয়ায় কি বাধা থাকতে পারে—সভার সকলেই যেখানে তাঁর পুত্রস্থানীয়? এখন আমার বৌমা যদি এই যুক্তি দেখিয়ে সভায় যেতে চান, তুমি খণ্ডন করতে পারবে?

মুখখানা শক্ত করিয়া মাধুরী দেবী বলিলেন: আমার কোন দরকার নেই তোমার বৌমার যুক্তি খণ্ডন করবার। কিন্তু এর ফলে, এ বংশের মর্যাদা বাড়বে কি কমবে, আর এরপর এ বংশের বধূ হয়ে যারা এ বাড়ীতে আসবে, বড় বৌমার ব্যাপারটা তারা কি ভাবে নেবে, সে সব ভেবেই

আমি প্রতিবাদ করেছিলাম। এখন তোমার বৌমা আর তুমি যা স্থির করবে, তার যখন নড়চড় হবার যো নেই, আমার সেখানে কথা বলতে যাওয়াই ঝকমারি।

মাধুরী দেবীর এ উক্তিও হরিনারায়ণ পরিপাক করিতে পারিলেন না, তাই তাঁহাকেও সংগে সংগে প্রতিবাদের প্রতিবাদ করিতে হইল: আমার মনে হয় যে, এরপর এ বংশের বধূর মর্যাদা নিয়ে আসবার আগেই কুলবধূ চণ্ডীদেবীর অসাধ্য সাধনের অবদানটিকে বধূ-জীবনের একটা উচ্চতম আদর্শ স্থির করেই কন্যারা অতিমাত্রায় সচেতন থাকবেন। তার পর, এ সত্যও তাঁরা অবশ্যই গ্রহণ করবেন যে, প্রয়োজনের তাগিদে আত্মমর্যাদার মুখ চেয়ে কুল-মর্যাদার পুরাতন প্রাচীর অতিক্রম করতে পারাটাও একটা বিপুল গৌরবের কথা।

কথাটার সমাপ্তির সংগে সংগে অনেকগুলি শঙ্খের মিলিত ধ্বনি সুবৃহৎ অট্টালিকার সহিত সেই কক্ষটিকেও প্রকম্পিত করিয়া তুলিল। মুখোমুখী উপবিষ্ট কর্তা ও গৃহিণী যুগপৎ চমকিত হইয়া পরস্পরের মুখে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলেন।

হরিনারায়ণ বলিলেন: এতগুলো শাঁখ একসংগে বাজাবার কি কারণ ঘটল? এলাকাটা কিন্তু তোমার।

মাধুরী দেবী গম্ভীর মুখে কহিলেন: সে সম্বন্ধে তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার; আমার এলাকায় পান থেকে চূণটুকুও খসবার যো নেই।

কথার সংগে সংগেই মৃণালিনী এক রকম ছুটিয়া কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিল যুগপৎ শঙ্খধ্বনির কৌতুকপ্রদ বার্তাটি লইয়া। সে কহিল: পাড়া থেকে প্রায় পঁচিশটি মেয়ে নিচের মহলে দালানে এসে উপস্থিত; তাদের প্রত্যেকের হাতে একটি করে শাঁক, আর মাথায় খুব ছোট—এমনি পাঁচটি মেয়ের মাথায় বরণডালা, সিঁদুর-চুপড়ি, সিঁদুর-পাতা, আলতা,

এমনি আরো কত কি! এঁরা এসেছেন চণ্ডী বৌকে 'বিদ্যা ভারতী' উপাধি দিয়ে বরণ করতে।

মাধুরী দেবী নীরবেই কথাগুলি শুনিলেন, কোন প্রকার মন্তব্য করিলেন না—তাঁর মুখে ও চোখে আনন্দ বা বিস্ময়ের কোন রেখাও পড়িল না। হরিনারায়ণ কিন্তু সহর্ষে বলিয়া উঠিলেন: দেখ কাণ্ড! লাইব্রেরী-ওয়ালারা বিদ্যাকে সম্মান দেবার জন্যে সভা করছে, কিন্তু পাড়ার মেয়েরা দেখছি তাদেরও ওপরে গিয়েছেন—শাঁক বাজিয়ে বরণডালা সাজিয়ে দল বেঁধে এসেছেন বৌমাকে বরণ করতে, উপাধিও যা বেছে এনেছেন, খাসা—সব উপাধির সেরা। কিন্তু এই মতলবটা বেরিয়েছে কার মাথা থেকে মিনু—কিছু শুনেছ?

মৃণালিনী সহাস্যে উত্তর করিল: সে মেয়েকে তুমি চেনো পিসেমশাই। মনে নেই—মাইনর পাশ করে স্কলারশিপ পেয়েছিল বদ্যিদের সেই তরলা নামে মেয়েটি—তুমি তাকে সোনার পদক দিয়েছিলে স্কুলে মস্ত সভা করে—

হ্যাঁ, হ্যাঁ, জানি বৈ কি—খুব জানি। সেদিন চমকে গিয়েছিলাম মেয়েটির প্রতিভা দেখে। আমার বৌমার ব্যাপারে তাকে মনেও পড়েছিল—বিয়ের সময় এখানে আনাবার জন্যে বদ্যিনাথকে অনেক করে বলেও ছিলাম, কিন্তু বদ্যিনাথ জানায়, শ্বশুরের সংগে মেয়েটি পশ্চিমে বেড়াতে গেছে—তাই তখন এখানে আনানো সম্ভব হয়নি। তাহ'লে য়্যাদ্দিন পরে সে বুঝি এসেছে?

মুখ টিপিয়া মৃদু হাসিয়া মৃণালিনী বলিল: হ্যাঁ, এসেই পাড়া গুলজার করে তুলেছে—এ-সব তারই নাকি পরিকল্পনা। দল গড়ে, চাঁদা তুলে এই কাণ্ড করেছে।

হরিনারায়ণ সহাস্যে বলিলেন: আমিও তাই ভাবছিলাম—এ মতলবটা বেরুল কার মাথা থেকে। যাক, যাবার আগে বদ্যিনাথের মেয়েটিকে একবার আমার কাছে এনো ত মিনু, আমি তাকে দেখব।

এতক্ষণ পরে মাধুরী দেবী কথা বলিলেন। শ্লেষের সুরে সহসা মন্তব্য করিলেন: শুধু দেখলেই হবে না, তোমার বৌমার সংগে তাকে মিলিয়ে দাও একবারে সোনায় সোহাগা হবে।

হো-হো করিয়া জোরে হাসিয়া উঠিলেন হরিনারায়ণ; হাসির ফাঁকে বলিলেন: কথাটা ঠাট্টা করে বল্লে বটে, কিন্তু এরও গুরুত্ব আছে। দরকার পড়েছে আজ—দেশের ভিতর থেকে এমনি সব ছেলে আর মেয়ে খুঁজে-খুঁজে বার করে তাদের প্রতিভাগুলোকে কাজে লাগানো। যাক সে কথা, এখন মেয়েগুলি যে উদ্দেশ্যে এসেছেন এ বাড়ীতে, তার ব্যবস্থা তোমাকেই ত করতে হবে, তারপর ওদের ওপরে আমাদেরও কর্তব্য আছে ত!

গম্ভীর হইয়া মাধুরী দেবী বলিলেন: ভয় নেই, আমার এলাকায় এটা পড়ছে বলে তোমাকে আর নতুন করে কর্তব্য শেখাতে হবে না। 'মৃণা, আয়'—বলিয়াই মাধুরী দেবী উঠিয়া দ্বারের দিকে গেলেন। হরিনারায়ণ তাড়াতাড়ি বলিলেন: সে বিশ্বাস আমার একটুও টলেনি।

স্বামীর দিকে বক্রদৃষ্টিতে একটি বার চাহিয়াই মাধুরী দেবী চলিয়া গেলেন; মৃণালিনীও যাইতেছিল, হরিনারায়ণ বাধা দিয়া বলিলেন: তোমার নামে চিঠি আছে মিনু—এই নাও।

চিঠিখানি হাত বাড়াইয়া লইয়া খুলিয়া পড়িতে পড়িতে বিস্মিত দৃষ্টি হরিনারায়ণের মুখের উপর ফেলিয়া মৃণালিনী জিজ্ঞাসা করিল: ও-মা, এ কি ব্যাপার!

হরিনারায়ণ বলিলেন: এই নিয়েই ত এতক্ষণ তোমার পিসিমার সংগে লড়াই চলেছিল। যাক্, তুমি এখন নিচে যাও—পরে কথা হবে।

মুখখানা ভার করিয়া চিঠিখানা পড়িতে পড়িতে মৃণালিনী কক্ষ ত্যাগ করিল। হরিনারায়ণ এই সুযোগে ডাক্তার বাগচির দরখাস্তখানি খুলিয়া তাহার নিচে কয়েকটি ছত্র লিখিয়া ঘণ্টাটি বাজাইয়া দিলেন।

পরক্ষণে দুর্গাদাস পরদা ঠেলিয়া সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল হরিনারায়ণ বলিলেন : এই চিঠিখানা বৌমার মহলে গিয়ে তাঁর হাতে দিবি—বুঝলি ?

ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইয়া দুর্গাদাস চিঠিখানি লইয়া বধূ চণ্ডীদেবীর মহলে ছুটিল।

তিন

বাশুলীর প্রাসাদে পুরাতন মহলে দ্বিতলে সুবৃহৎ দালানটি এমন সুষ্ঠু ব্যবস্থায় সুসজ্জিত হইয়াছে যে, প্রবেশ-দ্বার অতিক্রম করিয়া সেখানে আসিলেই মনে হয় যেন প্রাচীন ও আধুনিক সংস্কৃতিসম্পন্ন কোন বিদ্যা-মন্দিরের আঙ্গিনার মধ্যে আসিয়া পড়া গিয়াছে এবং এখানকার দ্রষ্টব্য বস্তুগুলি গর্ভ-মন্দিরে সংরক্ষিত দুর্লভ সঞ্চয়ের একটা আভাস প্রদান করিতেছে।

দীর্ঘ দেওয়ালে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ, রাষ্ট্র ও প্রদেশগুলির মানচিত্র আলম্বিত। প্রত্নতত্ত্বমূলক বিবিধ বিবরণী, ধাতু ও প্রস্তরময় মূর্তিগুলি বিভিন্ন আধারে সংরক্ষিত। দেশ-বিদেশের সাময়িক পত্রগুলি সুদৃশ্য ফাইল মধ্যে আশ্রয় পাইয়া গৃহস্বামীর রুচির পরিচয় দিতেছে। বেদ, পুরাণ, উপনিষদ, গীতা, ইতিহাস, জীবন-চরিত, প্রয়োজনীয় পুস্তকগুলির সমন্বয় এবং ধর্মগুরু, রাষ্ট্রনেতা, চিন্তা-নায়ক, কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী, বৈজ্ঞানিক, সঙ্গীত-সাধক প্রভৃতির আলেখ্য এই বিস্তীর্ণ দালানটির সজ্জা-পরিকল্পনায় একটি বিশিষ্ট রূপ দিয়াছে। শুভ্র আস্তরণ-মণ্ডিত টেবিল ও চেয়ারগুলি সর্বক্ষণই যেন অভ্যাগতগণকে সাদর আহ্বান জানাইতেছে। ফুলদানির ফুল ও ধূপদানীর ধূপের সৌরভে দালানটি আমোদিত। বারান্দার দিকে কারুকার্য-খচিত আকাশ-রঙের পরদা, তাহার পাশে মরশুমি ফুলের ঝারি, পাখীদের

প্রকৃতি অনুযায়ী বিভিন্ন আকারের দাঁড় ও খাঁচাগুলি ঝুলিতেছে; প্রত্যেকটিতে কোন না কোন পাখী তার বৈশিষ্ট্যগত অস্তিত্বের পরিচয় দিতেছে।

নিজেদের মহলে প্রবেশ-মুখে এই দালানটিকে চণ্ডী এই ভাবে নিজের পরিকল্পনায় সাজাইয়াছে স্বামী গোবিন্দর জন্য। ইদানীং অনেকেই তাহার সহিত দেখা করিতে আসে, বোকা ও মূর্খ বলিয়া পরিচিত গোবিন্দ-নারায়ণের প্রতিভাদৃপ্ত নূতন রূপটি দেখিবার জন্য পূর্ব-পরিচিতদের অন্তরে কৌতূহলের অন্ত নাই। অনেকেই এখন তাহাকে দেখিয়া, তাহার সহিত আলাপ করিয়া, তাহার বিদ্যা-বুদ্ধির সহিত পরিচিত হইয়া চক্ষু-কর্ণের বিবাদভঞ্জন করিতে উদ্‌গ্রীব। বধূ চণ্ডীদেবী এ সম্বন্ধে স্বামীকে প্রচুর উৎসাহই দিয়াছে; চণ্ডী সহাস্যে স্বামীকে ইহাই বুঝাইয়াছে: লোকের এই কৌতূহলের জন্য বিরক্ত হওয়া উচিত নয়। মানুষ মাত্রই কৌতূহলপ্রবণ; বিশেষত, পল্লীগ্রামের লোক, আশ্চর্য রকমের কোন কিছু খবর পেলে আর রক্ষা নেই, তার পিছনে দল বেঁধে ধাওয়া করবেই। কিন্তু লোকের এই আগ্রহকে ভাল দিকে ফিরিয়ে দিয়ে অনেক ভালো কাজও করিয়ে নেওয়া যায়। সেই চেষ্টাই আমাদের করতে হবে।

বধূ চণ্ডীর কথাই গোবিন্দর কাছে বেদবাক্য; তাহার কথা যে ভুল হইতে পারে না, চণ্ডীর প্রতি যুক্তিটি যে অকাট্য, ধারণাও তাহার একেবারে অভ্রান্ত—সে সম্বন্ধে গোবিন্দর মনে সন্দেহের লেশটুকুও নাই। কোন বিষয়েই চণ্ডীর সহিত তাহাকে তর্ক করিতে কোন দিন দেখা যায় নাই—গোবিন্দ ভাবে, চণ্ডীর কথাই ঠিক—তাহার সহিত তর্ক চলিতে পারে না।

কিন্তু স্ত্রীর প্রতি স্বামীর এতখানি বিশ্বাস ও নির্ভরতা স্ত্রীর পক্ষে যতই বাঞ্ছনীয় হোক না কেন, চণ্ডীর মত স্ত্রীর চিত্তে তাহাতে কোন উৎসাহই দেখা যায় না, বরং স্বামীর এই ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের দৈন্য তাহাকে রীতিমত আঘাত

দিয়া থাকে। মূর্খ স্বামীর আত্মোন্নতি ও বিদ্যাপ্রাপ্তির মূলে তাহার দান ও সাহায্য অপ্রমেয় বলিয়াই যে স্বামী নিজের অপকর্ষতার জন্য ভাবিয়া স্ত্রীকেই পরিপূর্ণ ভাবে প্রাধান্য দান করিয়া আপনাকে নগণ্য করিয়া রাখিবেন, এ চিন্তাও যে চণ্ডীর পক্ষে অসহ্য। জীবনযাত্রার পথে কি সার্থকতা ইহাতে! স্বামীর শ্রেষ্ঠত্ব, স্বামীর পৌরুষের বৈশিষ্ট্য ও অপরাজেয় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যই সহধর্মিণীর একান্ত প্রার্থনীয় এবং ইহাতেই দাম্পত্য জীবন স্বাভাবিক ভাবে সার্থক হইয়া থাকে। কিন্তু স্বামীকে লইয়া কঠোর বিদ্যা-সাধনার ফলে বিদ্যালাভ করিয়াও স্বামী যদি নিজের ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে অশ্রদ্ধ হইয়া উঠেন—পদে পদে আপনাকে স্ত্রীর তুলনায় অক্ষম ও নিকৃষ্ট ভাবিয়া ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে অবহেলা করিতে থাকেন, তাহা হইলে স্ত্রীর পক্ষ হইতে সে-লজ্জা রাখিবার স্থান যে পৃথিবীতে কোথাও থাকিবে না—স্ত্রীর জীবনের বেদনাময় দিকটি সর্বদাই যে নিদারুণ হাহাকারে ভরিয়া রহিবে। তাই বধূ চণ্ডীর জীবনে এখন আর এক নূতন দায়িত্ব আসিয়াছে এবং সেই দায়িত্ব পালন-কল্পে তাহাকে আর এক কঠোর সাধনার সম্মুখীন হইতে হইতেছে। চণ্ডী এখন তার বিদ্যা, বুদ্ধি, বিচার-শক্তি, তার উজ্জ্বল প্রতিভার শিখাগুলি একটি একটি করিয়া নিবাইয়া দিয়া নিজেকে রিক্ত করিতে যেন ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়াছে—আর সেই অসাধারণ বিদ্যা বুদ্ধি ও প্রতিভার প্রদীপটি স্বামীর অন্তর-মন্দিরে জ্বালিয়া দিয়া তাহার ব্যক্তিত্বকে জাগ্রত করিতে ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছে।

স্বামীর আত্মমর্যাদাকে উদ্দীপ্ত করিবার জন্য শাস্ত্র-পুরাণের কত গল্পই সে বলিয়া যায়। সংকট কালে অভিশপ্ত দেবতাকেও দেবীর শক্তি-সামর্থ্য লইয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে হইয়াছে; কিন্তু তাই বলিয়া দেবতার মাহাত্ম্য খর্ব হয় নাই এবং দেবী সেই দেবতার উপরেও প্রতিষ্ঠা পান নাই। এমনি কত বিচিত্র চিত্রই চণ্ডীকে দেখাইতে হয় স্বামীর চোখে আঙ্গুল দিয়া। সে বুঝাইয়া দিতে চায়ঃ তোমার শিক্ষার সহায়ক হয়েছি

বলে নিজেকে ছোট করে আমাকে বাড়িয়ো না। বড় তুমিই, তাতেই আমার গৌরব। অর্জুন দ্রোণাচার্যের কাছে অস্ত্র শিক্ষা করে মহাবীর হয়েছিলেন; কিন্তু যুদ্ধকালে তিনি গুরু দ্রোণকে যত ভক্তি-শ্রদ্ধাই করুন, ব্যক্তিত্বের দিক্ দিয়ে নিজেকেই বড় ভাবতেন—তাই দ্রোণের সঙ্গে যখন-তখন যুদ্ধ করতে পেরেছিলেন।

শৈশব কাল হইতেই গোবিন্দ স্থির, ধীর ও স্বল্পভাষী। বেশী কথা বলিতে সে কোন কালেই অভ্যস্ত নয়। শিক্ষালাভ করিয়াও সে পূর্বের অভ্যাস ত্যাগ করিতে পারে নাই। চণ্ডীর কথা মন দিয়াই সে শুনিত, শুনিয়া নীরবে ভাবিত, কিন্তু মুখ ফুটাইয়া কিছুই বলিত না।

অভ্যাগতদের সমক্ষেও গোবিন্দ যাহাতে চণ্ডীর প্রসঙ্গ চাপিয়া যায়; নিজের চেষ্টাতেই সে বিদ্যালাভ করিতে পারিয়াছে—এই কথাই যাহাতে সকলে জানিয়া যায়, এ সম্বন্ধে চণ্ডীর উৎসাহের অন্ত নাই। কিন্তু কার্যকালে সব ব্যর্থ হইয়া যাইত, প্রসঙ্গ কথায় উপনীত হইলেই গোবিন্দ চণ্ডীর গুণবাদে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত। ফলে, ইদানীং আলোচনার সময় চণ্ডীকেও উপস্থিত থাকিতে হয়—গোবিন্দর বিদ্যা-উন্নতির বৃত্তান্ত নিজেই সে সংক্ষেপে বলিয়া যায়। গোবিন্দ পার্শ্বে বসিয়া নীরবে শোনে। কৌশলক্রমে চণ্ডী স্বামীর প্রতি শ্রদ্ধা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া ও স্বামীকেই প্রাধান্য দিয়া এমন দুই-একটি কথা তুলিয়া থাকে, গোবিন্দকেই যাহার উত্তর দিতে হয় এবং সেই পাণ্ডিত্যপূর্ণ উত্তর শুনিয়া অভ্যাগতগণ চমৎকৃত না হইয়া পারেন না।

পাঠাগারের পক্ষ হইতে গৃহীত প্রস্তাবটির অনুলিপি লইয়া সেদিন আলোচনা করিতে আসিয়া রাজীবকেও চমৎকৃত হইতে হইল।

স্বামি-স্ত্রী উভয়েই এই প্রিয়দর্শন ও সুবিনয়ী ছেলেটিকে সাদর অভ্যর্থনা করিয়া বাহিরের দালানে বসাইল। রাজীব দালানটির বৈশিষ্ট্যময় রূপসজ্জা দেখিয়া সানন্দে বলিল: এক-নজরে এই বৈঠকখানাটি দেখেই

আপনাদের দু'জনের অন্তরের পরিচয় পেয়েছি। আপনাদের মত আদর্শ দম্পতিকে দেখে আমার জীবন ধন্য হলো, আজিকার দিনটি আমার জীবনে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

গোবিন্দ সহাস্যে বলিল: দেখুন রাজীববাবু, মূর্খ পণ্ডিত হয়েছে শুনে কত লোকেই ত দেখতে এসেছিলেন; কিন্তু আপনি যে রকম ঘটা করে দেখতে চেয়েছেন, এমনটি কেউ করেননি। মস্ত সভা বসিয়ে সেই সভায় আমাদের নিয়ে গিয়ে একসঙ্গেই কৌতূহল মেটাতে চেয়েছেন। সেদিন লোকের এই কৌতূহল নিয়েই এঁর সঙ্গে কথা হচ্ছিল, তাতে ইনি বললেন—কৌতূহল হচ্ছে মানুষের একটা প্রবৃত্তি, একে দমন করা ঠিক নয়।

রাজীব বলিল: আমিও তাই বলি। অনেকে আমাকে ভয় দেখিয়েছিলেন, আপনাদের সভায় এনে অভিনন্দন দিতে যাওয়া মানেই গাঙ্গুলী-বংশকে অপমান করা। কিন্তু আমি তাতে মত দিইনি; আমি বলেছিলাম, যাঁর আশ্চর্য রকমের শিক্ষা নিয়ে নানা কথা রটেছে, লোকের মনে কৌতূহল জেগেছে, লোকের সামনে সেটা না জানালে এর পর নানা রকমের গুজব উঠবে—তাতেই বরং অনেক ক্ষতি হবে। তার পর, যাঁদের আমরা সভায় আনতে চাচ্ছি, তাঁরা যদি না আসেন, তাহ'লে বুঝব—যে আদর্শ তাঁরা সৃষ্টি করেছেন, তার প্রতীকরূপে যদি সর্বসমক্ষে প্রত্যক্ষ হবার সাহস তাঁদের না থাকে, তাহ'লে এ আদর্শবাদের কোন দাম নেই—আভিজাত্যের ভিতরে তা চাপা পড়েই থাকবে।

চণ্ডী এতক্ষণ নীরবে এই প্রতিভাবান ছেলেটির কথাগুলি শুনিতেছিল, এই সময় আস্তে আস্তে বলিল: আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে, আপনি নূতনের পূজারী, সুবিধাবাদীদের মুখের পানে চেয়ে কথা বলতে অভ্যস্ত নন। সত্যি, আপনার জোরালো কথাগুলি আমার খুবই ভাল লেগেছে। দেখুন, নিজের বিদ্যার দৈন্য বুঝতে পেরে ইনি যখন বিদ্যা সাধনার ব্রত

নিলেন, আমি কেবল পাহারা দিয়েছি—কেউ যাতে জানতে না পারে তাঁর সাধনার কথা; তাহ'লেই নানা কথা উঠবে, কত লোকে কত টিটকিরি দেবে, শেষে হয়ত বিরক্ত হয়ে বা বাধা পেয়ে উনি সাধনা ছেড়ে উঠেই পড়বেন। জানাজানি আগে থেকে হয়নি বলেই ত এত শীগ্‌গির উনি সিদ্ধিলাভ করতে পেরেছিলেন। কিন্তু এ কথা এখন চেপে রেখেও লাভ নেই, বরং জানানোই ভালো। আমাদের সমাজে এই ভাবে কত জীবনই ত শিক্ষার অভাবে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে—অথচ চেষ্টা করলে তারাও শিক্ষিত হয়ে দেশের আদর্শ হতে পারে। আমারও ইচ্ছা, এঁর আশ্চর্য সাধনার কথা এ অঞ্চলের সকলে জানুন, আর আপনাদের মত উৎসাহী ছেলেরা শিক্ষা বিস্তারে সচেষ্ট হোন। আমাদের কবিও ত বলেছেন—

'এই সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে দিতে হবে ভাষা,
এই সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা।'

এঁরও ইচ্ছা—যে-সত্যের সন্ধান ইনি পেয়েছেন নিজের জীবনে, এঁদের বিশাল জমিদারীর শিক্ষাহীন সমাজ যাতে সে সত্যের সন্ধান পায়—সেইটে সত্য করে তুলতে পারলেই তবে এঁর শিক্ষাও সার্থক হবে।

চণ্ডীর কথাগুলি শুনিতে শুনিতেই একটা অপরিসীম পুলকে অভিভূত হইয়া পড়িতেছিল রাজীব। বক্তব্য কথাগুলি এমন সুস্পষ্ট ভাবে মার্জিত ভাষায় ও অল্প কথায় গুছাইয়া বলিতে ইহার আগে কোন মহিলাকে ত দূরের কথা—বিশিষ্ট কোন বক্তাকেও দেখিয়াছে বলিয়া সে স্মরণ করিতে পারিল না। আপনার ব্যক্তিত্বকে অপর কাহারও নিকট খাটো করা এই ছেলেটির প্রকৃতিসিদ্ধ না হইলেও, আজ স্বভাবতই তাহার মনে হইতে লাগিল—এই মনস্বিনী মহিলাটির বাক্‌শক্তি অসামান্য প্রতিভার প্রভায় এমনই উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে যে, তাহার নিজের কথা সেখানে তেমন করিয়া খাপ খাইবে না। তথাপি রাজীব বিমূঢ়ের মতই গাঢ় স্বরে

বলিল: দেখুন, এই বয়সেই অনেক লোকের সঙ্গে আমাকে মিশতে হয়েছে, অনেক সভা-সমিতিতে যোগ দিয়ে অনেক বিখ্যাত লোকের মুখের কথাও শুনেছি, কিন্তু আমার মনে হোচ্ছে, কথা শুনে এমন করে অভিভূত কখনো হইনি। আপনার প্রত্যেক কথাটি যেন চেহারা ধরে চোখে আঙুল দিয়ে চিনিয়ে দিলে! সত্য কথা বলতে কি, আপনাদের সম্বন্ধে জানবার আগ্রহ আমার মনেও অল্প কৌতূহলের সৃষ্টি করেনি, কিন্তু আপনার ঐ স্বল্প কথাতেই আমার সব জানা হয়ে গেছে। এই কথাই অন্যে হয়ত কত ভণিতা করে কতক্ষণ ধরেই বলে সময়ের অপব্যয় করতেন। তার পর আপনি ভবিষ্যতের যে ছবি আমার চোখের সামনে জীবন্ত করে দেখালেন, তাতে আমার সমস্ত অন্তরটাই ভরে গেছে। এরই মধ্যে যে আপনি Charity begins at home এই ইংরেজী নীতির সঙ্গে মহাপ্রভুর 'আপনি আচরি ধর্ম অন্যে শিখাইবে'—এই মহামন্ত্রের সামঞ্জস্য রেখেই আপনার শ্বশুর মশায়ের তালুকটির দিকে চোখ মেলে চেয়ে এত বড় একটা পরিকল্পনা মনে মনে গড়ে রেখেছেন, এ যে আমাদের কাছে একবারে স্বপ্নাতীত ব্যাপার! চিন্তায় অগ্রবর্তী বলে বাঙালীর অবিশ্যি খ্যাতি আছে, কিন্তু আমার মনে হোচ্ছে, সে খ্যাতির সিঁড়ি বেয়ে আপনিই সবার আগে শীর্ষে গিয়ে উঠেছেন।

মৃদু হাসিয়া চণ্ডী বলিল: আপনি আগে থেকেই শুধু শুধু আমাকে বাড়িয়ে এমন করে লজ্জা দেবেন না—এ পরিকল্পনাটি ইনিই আগে করে রেখেছেন। আর, ঐ যে কথাকে চেহারা দেবার কথা বললেন—তার সম্বন্ধে আমাকেও বলতে হোচ্ছে যে, কথার চেহারা যাঁদের চোখে পড়ে, তাঁরাও বড় সাধারণ লোক নন। তেমন শ্রোতা যদি হাজারের মধ্যেও দু'-চার জন থাকে, তাহলে বক্তার বক্তৃতাকে তাঁরাই যে জীবন্ত করে তোলেন।

গোবিন্দনারায়ণ এতক্ষণ নিবিষ্ট মনেই এঁদের সংলাপ শুনিতেছিল,

এই সময় সে-ও তার স্বভাবসিদ্ধ সহাস্য ভংগিতে বলিল: দেখুন, আপনি শুনলে হয়ত আশ্চর্য হবেন—আমরা ক'দিন ধরেই লাইব্রেরী নিয়ে কত আলোচনাই করেছি। ওঁর আবার স্বভাব হোচ্ছে, যেটি নিয়ে পড়বেন—তার আগাগোড়া তন্ন-তন্ন করে খুঁজে-পেতে সব জেনেশুনে তবে তাতে মাথা দিতে এগিয়ে যান। এই আমার কথাই ধরুন না—এখানে এসে গোয়েন্দার মত আমার ছেলেবেলাকার সব খবর পর্যন্ত সংগ্রহ করে তবে নিশ্চিন্ত হতে পেরেছিলেন। এ অভ্যাসটি নাকি ওঁর দাদামশাইয়ের কাছ থেকেই পেয়েছেন—সত্যিই, এ খুব ভালো। যাকে নিয়ে আমাদের কাজ করতে হবে, তার ত শুধু ভালো দিকটা দেখলেই হবে না—কোন্‌খানে তার গলদ, সেটাও দেখা চাই—তাতে খুব শীগ্‌গির তাকে শুধরে নেওয়া যায়। হ্যাঁ, তাই বলছিলাম যে, আপনাদের ঐ লাইব্রেরীর আগের সব খবরই উনি সন্ধান করে পেয়েছেন, আর এখন আপনার হাতে পড়ে তার কি হাল হয়েছে—তাও জেনেছেন। তাহলেই বুঝুন রাজীববাবু, আপনার সঙ্গে আজ প্রথম আলাপ হোলেও আপনাকে আমরা আগেই চিনে রেখেছিলাম।

রাজীবও বুঝি অবাক্‌ হইয়া গোবিন্দনারায়ণের কথাগুলি শুনিতেছিল, আর তাহারই মধ্যে চাহিয়া চাহিয়া মানুষটির মুখ-চোখের ভঙ্গিগুলিও লক্ষ্য করিতেছিল। অল্প কয়েক সপ্তাহ মাত্র পূর্বে বাগুলীতে আসিয়া এই লোকটির অজ্ঞতা ও অপ্রকৃতিস্থতা সম্বন্ধে কত কথাই সে শুনিয়াছে, অথচ আজ তাহার সম্মুখে বসিয়া সেই লোকটিই যে-সব কথা বলিতেছে, তাহার মধ্যে মননশীলতার এক মনোজ্ঞ ধারা যেন অন্তঃসলিলার মত প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে এবং নিজের বস্তুতান্ত্রিক মনোবৃত্তির সঙ্গে তাহার ঘনিষ্ঠতাও কি নিবিড়!

এই সময় বক্তার শেষের কথাটাকে উপলক্ষ করিয়া রাজীব বলিয়া উঠিল: আমিও আপনাদের সঙ্গে পরিচিত হবার আগেই যে-সব কথা

শুনেছিলাম এবং তাতে যে পরিমাণে বিস্মিত হয়েছিলাম, আপনার সংগে আলাপের সৌভাগ্য পেয়ে সেই বিস্ময় এখনও কাটাতে পারিনি। এরও যেন ক্রমশঃই রূপান্তর চলেছে। তবুও একটি কথা জানবার কৌতূহলকে দমন করতে পারছি নে—বলবেন দয়া করে, আমার মতন নগণ্য মানুষটিও যখন লাইব্রেরীর সম্পর্কে আপনাদের আলোচনার বস্তু হোয়েছে, এমন কি চিনেও রেখেছেন বললেন—তাহলে চেনাটা কি…

ইহার পর কি বলিয়া কথাটা শেষ করিবে, রাজীব ভাবিতেছিল, কিন্তু চণ্ডীই হাসিমুখে কথাটা শেষ করিয়া দিল: খুব সুখেরই হয়েছে রাজীববাবু—আমরা জেনেছি, আপনি আমাদেরই জাতের। অর্থাৎ প্রগতি-মার্গে আমরা সবাই একই পথের পথিক, একই ধাতের মানুষ আমরা।

উল্লাস-দীপ্ত মুখে রাজীব বলিল: দেখুন, ছন্ন-ছাড়া হা-ঘরে অনাথ দলের একটা ভবঘুরে ছেলেকে এমন করে জাতে টেনে নিয়ে আপনারা অদ্ভুত মহত্ত্ব দেখালেন সত্যি, কিন্তু হয়ত এটা অনেকেরই চক্ষুশূল হবে।

রাজীবের কথা শুনিয়া চণ্ডী মুখখানা শক্ত করিয়া দৃঢ় স্বরে বলিল: আপনি ঠিকই বলেছেন, কিন্তু তা'তে আমাদের মত বদলাবে না রাজীব-বাবু! গতানুগতিক পথ ছেড়ে নতুন কিছু করতে গেলেই বাধা আসবে, এ ত জানা কথা। তার জন্য আমাদের তৈরী থাকতে হবে বৈ কি। এই দেখুন না, যে প্রস্তাব নিয়ে আপনি এসেছেন, এই বাড়ী কিম্বা এই জমিদারীর প্রত্যেক লোকই কি এটার সমর্থন করবে মনে করেন? দেখবেন, কত বাধা উঠবে, কত লোকে কত কথাই এর বিরুদ্ধে বলবে! আজ যাঁরা আমার সুখ্যাতি করছেন, তাঁরাই হয়ত আমার কুৎসায় শতমুখ হবেন; এই ত সংসারের নিয়ম রাজীববাবু!

প্রতিবারই নিজের কথা বলিতে বলিতে চণ্ডী এমন ভংগিতে স্বামীর মুখের দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিতে ছিল যে, সে দৃষ্টি যেন গোবিন্দকে খোঁচা

দিয়া সতর্ক করিয়া দেয়—এবার তোমার পালা আসিয়াছে, চুপ করিয়া বসিয়া বসিয়া শুধু শুনিলেই হইবে না—বলা চাই। আর গোবিন্দনারায়ণ স্বল্পভাষী হইলেও সহধর্মিণীর চোখের ভাষা পাঠ করিতে তাহাকে অসুবিধায় পড়িতে হয় না, সুতরাং পরক্ষণেই তাহাকেও মুখ খুলিতে হয়। তাই চণ্ডীর কথা শেষ হইতেই গোবিন্দনারায়ণকে বলিতে হইল: কথাটা কি জানেন রাজীববাবু, সমাজে অনেক কিছুই সমর্থনযোগ্য নয়; তার কারণ, নীতির শাসন মেনে সমাজকে চলতে হয়। কিন্তু তার মধ্যে এমন কোন ব্যাপার যদি আসে, আর—একটি লোকের বলিষ্ঠ মন তাকে গ্রহণযোগ্য বলে এক বার মেনে নেয়, তখন সমাজের বিধি-নিষেধই বলুন, আর নীতিই বলুন—কিছুরই সে তোয়াক্কা রাখবে না। এই দেখুন না, নতুন মা ত কতবছর হলো এ বাড়ীতে বধূ হয়ে এসেছেন, কিন্তু এখনো পর্য্যন্ত তাঁকে বধূটির মতনই অসূর্য্যম্পশ্যা হোয়ে থাকতে হয়। অথচ, কুলবধূ হোয়ে এসেই সম্বৎসর পেরুতে না পেরুতে ইনি কি কাণ্ডই না করলেন! কিন্তু তাই বলে, এ বাড়ীর সেই প্রাচীন সংস্কার ভেঙ্গে গেছে মনে করেছেন? কিছু না—সে সব ঠিক আছে। আমার নতুন মা তা থেকে একটুও নড়তে চাইবেন না। আবার মজা এই, ইনি যখন একবার রক্তের স্বাদ পেয়েছেন, আর বাবা তাতে প্রশ্রয়ও দিয়েছেন—এর পর এঁকে আর কেউ ঠেকাতে পারে? কেউ না।

স্বামীর কথার পীঠে চণ্ডী বলিল: এই আপনার কথাটাও ধরুন না রাজীববাবু, পুলিশ ত আপনার পিছনে পিছনে ঘুরে কত নাকালই করেছে, জীবনটাকেই অতিষ্ঠ করে তুলেছিল বললেও অত্যুক্তি হয় না; কিন্তু শেষ পর্যন্ত কি আপনাকে দাবাতে পেরেছে বলতে পারেন? না, আপনি সরকারকে খুশী করতে নিজের মতবাদ বদ্‌লেছেন! বেশী কথা কি, আপনার বাবা দেশের জন্যে সর্বস্বান্ত হয়েছেন, জীবন দিয়েছেন—চোখের উপর সে সব দেখেও আপনি এতটুকু ভয় পাননি—তাঁর আদর্শকেই ধরে

রেখেছেন। তাহলেই বলুন, এটা হোচ্ছে স্বভাব—এখন একে দেশ-প্রীতি বলুন, স্বজাত্যনিষ্ঠা বলুন, দেশাত্মবোধ বলুন বা আর যাই বলুন না কেন—সবই এক পর্যায়ে এসে পড়ে, আর রক্তের সঙ্গে এমনি মিশে যায় যে, একে সরাবার কোনও উপায়ই থাকে না। এই জন্তেই ত আপনাকে এক জাতের বলে আমরা চিনে ফেলেছি রাজীববাবু!

অবাক্ বিস্ময়ে রাজীব বলিয়া ফেলিল: কি আশ্চর্য, আপনারা এরি মধ্যে আমার পিছনের—এমন কি পৈতৃক ইতিহাস পর্যন্ত সব জেনে রেখেছেন!

গোবিন্দনারায়ণ সহাস্যে বলিল: আগেই ত বলেছি আপনাকে—এই জানাটাই হোচ্ছে এঁর স্বভাবসিদ্ধ একটা অভ্যাস।

চণ্ডী বলিল: সত্যিই রাজীববাবু, যখন জানতে পারলাম যে, আপনি আমাদের জাতের মধ্যে এসে গেছেন, তখন আমরা এই ভেবে আশ্বস্ত হই যে, লাইব্রেরীর ব্যাপারে এখন আমাদের হাত বাড়াতে হবে না—হাতের ভিতরেই ওটা আছে। আর, আপনি ত ভাল ভাবেই জানেন, এই প্রতিষ্ঠানকে সামনে খাড়া রেখে আমরা অনেক কিছুই করতে পারি। অবিশ্যি, তার পথ আপনি অনেকটা খুলে দিয়েছেন। এর পর ধীরে-সুস্থে অনেক আলোচনার অবকাশও আমরা পাব। দেখুন, মঙ্গলময়ের কি আশ্চর্য খেলা, ঠিক সময়ে আপনাকেও ঠিক জায়গায় এনে ফেলেছেন।

এবার রাজীব উচ্ছ্বসিত স্বরে বলিয়া ফেলিল: তাহলে এখন বলি, শুধু মনের জোরে বুকে সাহস বেঁধে আজ এখানে এসেছিলাম, মনে মনে কত কল্পনাই করেছিলাম—আপনাদের কাছে কি রকম ব্যবহার পাব—সে সম্বন্ধে। কিন্তু এমন ভাবে পরিপূর্ণ তৃপ্তি আর বিপুল প্রত্যাশা নিয়ে যে ফিরে যাবো, সেটা তখনো ভাবিনি।

আরো কি বলিতে যাইতেছিল রাজীব উচ্ছ্বসিত আবেগে, কিন্তু এই সময় বালক-ভৃত্য দুর্গাদাস কুণ্ঠিত পদে আস্তে আস্তে সেখানে আসিয়া

সসম্ভ্রমে মাথাটি নিচু করিয়া শ্রদ্ধা জানাইল; সঙ্গে সঙ্গে হাতের লম্বা লেফাফাখানি চণ্ডীর হাতে দিয়া বলিলঃ কর্তাবাবু আপনার কাছে পাঠালেন, বউরাণী!

লেফাফাখানি হাতে লইয়াই চণ্ডী তাহার ভিতর হইতে দরখাস্তখান বাহির করিয়া এক নিশ্বাসে পড়িয়া ফেলিল। তাহার পর সেখানি পুনরায় লেফাফার মধ্যে পূরিয়া গম্ভীর মুখে বলিলঃ আচ্ছা, তুমি এখন যাও দুর্গাদাস।

মাথা নিচু করিয়া পুনরায় শ্রদ্ধা জানাইয়া দুর্গাদাস চলিয়া গেল। চণ্ডী লেফাফাখানি স্বামীর দিকে আগাইয়া দিয়া বলিলঃ আর এক বিশু ডাক্তার আসছেন—পড়ে দেখ।

নীরবে লেফাফাখানা লইয়া গোবিন্দনারায়ণ তার ভিতরের পত্রখানা গম্ভীর মুখে পড়িতে লাগিল।

এরূপ অবস্থায় অন্যের পক্ষে এখানে মনে মনে অস্বস্তি-ভাব আসাটা খুবই স্বাভাবিক; রাজীব এ ক্ষেত্রে বিদায় লইবার জন্য উঠি-উঠি করিতেছে, এমন সময় চণ্ডী নিজেই সম্ভবত তাহার অবস্থা বুঝিয়া তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলঃ এই চিঠির ব্যাপারটা বিশেষ কিছু গোপনীয় নয়, তাছাড়া, আপনি যখন অল্পক্ষণের আলাপেই আমাদের মধ্যে এসে পড়েছেন রাজীব-বাবু, তখন আপনার সামনেই এ নিয়ে আলোচনা করতে কোনও বাধা আছে বলে মনে করছিনে।

গোবিন্দনারায়ণও ইতিমধ্যে চিঠিখানি পড়িয়া এই সময় চণ্ডীর দিকে চাহিয়া বলিলঃ ঠিকই বলেছ—দ্বিতীয় বিশু ডাক্তারই বটে! মা আবার এর মধ্যে হাত দিতে গেলেন কেন?

মুখখানা গম্ভীর করিয়া চণ্ডী উত্তর করিলঃ মা জানেন যে, তাঁর হাত দেওয়া মানেই এ ব্যাপারে আর কেউ হাত দিতে পারবে না। কিন্তু বাবা যে এদিকে আমাকেও হাত বাড়াবার ভারটি দিয়ে ফেলেছেন,

মা নিশ্চয়ই তা জানতেন না। তাই এখন বাবাকেই মুস্কিলে পড়তে হয়েছে।

অসংলগ্ন কথাগুলি রাজীব উপলব্ধি করিতে পারিতেছে না বুঝিয়া গোবিন্দনারায়ণ ব্যাপারটি তাহাঁকে বুঝাইয়া দিবার অভিপ্রায়ে বলিল: রাজীববাবু হয়ত আমাদের কথাগুলো ঠিক ধরতে পারছেন না—

মৃদু হাসিয়া রাজীব বলিয়া ফেলিল: প্রথম আলাপেই যখন এতখানি আপনার করে নিয়েছেন, কথা পড়তেই যদি মোটামুটি বুঝতে না পারি—তাহলে আপনারাই হয়ত মনে মনে ভাববেন, আমাকে ভুল বুঝেই অতখানি প্রশ্রয় দিয়েছেন। আমি কি বুঝেছি শুনবেন—বিশু ডাক্তারের জায়গায় এক জন ডাক্তারকে ত নিতে হবে। কর্তাবাবু বোধহয় বৌমার উপরেই ভার দিয়েছিলেন—যেহেতু, তাঁর মনে এখন এমনি একটা ধারণার স্থষ্টি হয়েছে, বৌমার নির্বাচনে ভুল হবে না—অযোগ্য স্থান পাবে না। এদিকে রাণীমা নিজের খেয়াল-খুশী মত এমন কাউকে কথা দিয়েছেন—বৌমার যাঁকে মোটেই পছন্দ নয়। এখন কর্তা পড়ে গেছেন মুস্কিলে—বৌমাও যদি কোন যোগ্য ব্যক্তিকে কথা দিয়ে থাকেন—

মুখখানা কঠিন করিয়া চণ্ডীকে এই সময় বলিতে হইল: আপনি ঠিক অনুমানই করেছেন রাজীববাবু! আপনি ত জানেন, লাইব্রেরীর মত এখানকার ডাক্তারখানাটিও সাধারণ প্রতিষ্ঠান—অথচ উপযুক্ত ডাক্তার এখন নেই। ভার পেয়েই আমি খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিই ভালো ডাক্তারের জন্যে। দরখাস্ত যে-ক'খানা পেয়েছি, তার মধ্যে একখানি সত্য সত্যই অদ্ভুত রকমের। যিনি দরখাস্ত করেছেন—আমার মনে হয়, সে ডাক্তারটিও ঠিক আমাদের জাতের।

রাজীব সহাস্যে বলিল: আমাকে যেন চোখে দেখে, খানিকটা আলাপ করে আর এর আগেই জেনে-শুনে আমার জাতটা চিনতে পেরেছিলেন; কিন্তু এই ডাক্তারটিকে না দেখেই শুধু তাঁর দরখাস্ত পড়েই কি করে

চিনতে পারলেন বলুন ত? মাপ করবেন, শোনবার জন্যে আমার ভারি কৌতূহল হোচ্ছে।

তেমনি গম্ভীর মুখেই চণ্ডী বলিল: তাঁর দরখাস্তখানা উপস্থিত কাছে নেই—আজই বাপুলি কাকার সেরেস্তায় পাঠিয়েছি, নৈলে আপনাকে পড়ে শোনাতাম রাজীববাবু, আপনিও আশ্চর্য হয়ে যেতেন। উনি গুটি কয়েক ছত্রে জানিয়েছেন যে, দেশমান্য আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র যে সব ছেলেকে নিজের হাতে তৈরী করেছিলেন এবং তাদের মধ্যে যে ক'টি ছেলে তাঁর কাছে স্বতন্ত্র ভাবে শিক্ষা পেয়ে তাঁকেই আদর্শ করে জনসেবার ব্রত নিয়েছেন—এই ডাক্তারটি তাঁদেরই এক জন। বি-এ পর্যন্ত তিনি কৃতিত্বের সঙ্গেই উত্তীর্ণ হয়েছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ বৃত্তিগুলিও তাঁকে উচ্চশিক্ষার সুযোগ দিয়েছে। এম-বি পরীক্ষাতেও তিনি বিশেষ মেডেল পেয়েছেন। ডাক্তার হয়ে বছর কয়েক মেডিকেল কলেজে হাউস-সার্জেনের কাজ করে হাতে-কলমে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন, তার পর তিন বছর আচার্যের আজ্ঞা মত বেগার খাটতে হয়েছে দেশের জন্যে—বিভিন্ন জন-কল্যাণ-আশ্রম, বন্যা, দুর্ভিক্ষ বা ব্যাধি-পীড়িত অঞ্চলগুলিতে সেবাব্রতী-রূপে। এখন তাঁর ইচ্ছা হয়েছে, পল্লী-অঞ্চলে চিকিসার কাজ করবার। আচার্যও অনুমতি দিয়েছেন। অর্থের দিকে মোটেই তাঁর লোভ নেই; তবে মস্ত একটা ঝোঁক বা আশা আছে, সেটি হোচ্ছে—একটা আদর্শ চিকিৎসালয় খুলে দেশের বড়লোকদের এবং গবরমেণ্টের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া যে, ইচ্ছা করলে আর চেষ্টা থাকলে, প্রত্যেক জমিদারের এলাকায়, কিম্বা মহকুমায়, এমন এক-একটা হাসপাতাল করা যেতে পারে—যেগুলো ও-দেশের নার্সিং হোমের মত ধনী-দরিদ্রদের আপদকালের আশ্রয় হোয়ে উঠে। যদি কর্তৃপক্ষের মনে বাশুলীর দাতব্য চিকিৎসালয়কে ঐ ভাবে উন্নত ও আদর্শ করবার বাসনা থাকে, তাহলে সে দায়িত্ব নিতে তিনি প্রস্তুত আছেন। আর একটি কথাও ঐ সঙ্গে

তিনি লিখেছেন—অন্যের প্রশংসাপত্র দিয়ে নিজের যোগ্যতাকে তিনি বড় করে দেখাতে অনিচ্ছুক। আচার্য রায়ের তিনি ছাত্র ও সেবক—এর চেয়ে বড় পরিচয় বা খ্যাতির পুঁজি তাঁর আর নেই।

দরখাস্তকারীর এই বৃত্তান্ত বলিয়া চণ্ডী চুপ করিতেই রাজীব বলিয়া উঠিল: বা! এ যে একবারে খাঁটি সোনা। সত্যিই এ সব কথা যিনি লিখতে পারেন—পল্লীকে আদর্শ করে গড়ে তোলবার উচ্চ পরিকল্পনা যাঁর মাথায় ঘুরচে, তাঁকে চোখে না দেখেও মেনে নেওয়া যায়। কিন্তু এটাও জানতে কৌতূহল হোচ্ছে বৌ-রাণীমা, খামের ঐ দরখাস্তখানি যিনি পাঠিয়েছেন···

চণ্ডী তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল: তিনিও অবিশ্যি এক জন এম-বি ডাক্তার,—হেমন্তপুরের রাজ এষ্টেটে প্র্যাক্‌টিস করে চুল পাকিয়েছেন; এখন ছেলে এম-বি হোয়েছেন, তাই তাঁকে পুরোনো মনিব-বাড়ীতে বাহাল করে নিজে এখানে এসে বিশু ডাক্তারের চেয়ারে বসতে চেয়েছেন। মা তাঁকে কথা দিয়ে তাঁর দরখাস্তখানি নিজেই নিয়ে এসেছেন; আর তিনিও নিবারণবাবুকে নিয়ে খুব শীঘ্রই এখানে আসছেন। দরখাস্তের সঙ্গে খানকতক প্রশংসা-পত্রও এঁটে দিয়েছেন।

রাজীব: আর ঐ যে ডাক্তারটির দরখাস্ত পেয়েছেন, তাঁকে কি আপনি—

চণ্ডী: হ্যাঁ, ডাক্তার রায়কে এখানে আসবার জন্যে আমিও লিখেছি। হাতের লেখাটার সঙ্গে মুখের কথাটা ত মিলিয়ে দেখতে হবে! তা ছাড়া জিজ্ঞাসা করবারও অনেক কিছু থাকতে পারে।

রাজীব: কর্তার কি ইচ্ছা—জানতে পারি?

লম্বা লেফাফাখানি টানিয়া লইয়া ভিতরের দরখাস্তখানি বাহির করিয়া নিচের ছত্র কয়টি চণ্ডী পড়িল: 'চণ্ডী মা, ডাক্তার বাগচির এই দরখাস্তখানা তোমার মা নিজেই এনেছেন এবং তাঁকে কথা দিয়েও এসেছেন—তিনি

নিবারণের সঙ্গে শীঘ্রই এখানে আসছেন। এ সব ভার তোমার উপরে আগেই যে দেওয়া হয়ে গেছে, উনি তা জানতেন না। ওঁর যুক্তি হচ্ছে—বাড়ীর ব্যাপারে ডাক্তার রাখা ওঁরই এক্তিয়ারের মধ্যে। এখন তোমার কথাও মনে পড়ছে—হাতের তীর বেরিয়ে গেছে ভেবে আমাকে সব বিষয়েই নিরস্ত থাকতে হবে। কাজেই আমার বলবার মুখ নেই; তবে, তুচ্ছ এই ব্যাপারটিকে উপলক্ষ করে অশান্তির সৃষ্টি হয়—এটাও চাই নে।' দেখুন দেখি, অসুস্থ দেহে নিজের হাতে বাবাকে এই কথাগুলি দরখাস্তের নিচে লিখতে হয়েছে। একেই বলে সুস্থ শরীরকে ব্যস্ত করা।

রাজীব বলিল: এখন দেখছি, শাসনতান্ত্রিক জটিল সমস্যা উপস্থিত; আপনার অবস্থা আমি বুঝতে পারচি।

মুখখানা আরক্ত করিয়া চণ্ডী বলিল: বুঝতে যদি পেরে থাকেন রাজীববাবু, তাহলে বলুন ত—সমাজের কল্যাণ ও সংসারের শান্তি একসঙ্গে কি করে একই পথে এই ভাবে আসতে পারে? আর, সংস্কারনিষ্ঠ নিরপেক্ষ মন সাংসারিক শান্তির জন্যে সামাজিক কল্যাণকে ঠেকিয়ে রেখে নিজের জীবনকেই কি ব্যর্থ করে তোলে না? বলতে পারেন—সেখানে বেঁচে থাকায় কি সার্থকতা? তার চেয়ে আদর্শের জন্যে সংগ্রাম করে হীন স্বার্থের কদর্য রূপটা নগ্ন করে দেখিয়ে দেওয়াই কি বড় কথা নয়?

চণ্ডীর তেজোদৃপ্ত কথাগুলি শুনিতে শুনিতে রাজীবের মনে হইতেছিল যে, এ সব কথা এমনি মনস্বিনী মেয়ের পক্ষেই সম্ভব। বিধাতা পুরুষ বুঝি হিসাব করিয়াই সাংগ্রামিক কার্য-কলাপের পরিপ্রেক্ষিতে এই শ্রেণীর দুঃসাহসিকা মনোবলশালিনী নারীদের জীবন-যাত্রার ক্ষেত্র নির্দিষ্ট করিয়া দিয়া থাকেন। সাংসারিক শান্তির মুখ চাহিয়া অন্যায় বা অনাচারকে প্রশ্রয় দিবার পাত্রীই নহেন ইঁহারা—বরং সমষ্টিগত সমাজের কল্যাণকল্পে সাংসারিক গোষ্ঠীগত সুখ-শান্তিকে উপেক্ষা করিয়া সাংগ্রামিক পরিবেশের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িতেই ইঁহারা অধিকতর অভ্যস্ত।

রাজীব কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু সহসা অনেকগুলি শঙ্খের মিলিত ধ্বনি দালানটির বায়ু-মণ্ডলকেও বুঝি স্তব্ধ করিয়া দিল। পরক্ষণে বিভিন্ন বয়সের প্রায় পঁচিশটি মেয়ে শঙ্খধ্বনি করিতে করিতে দালানের মধ্যে ঢুকিল। সামনের মেয়েগুলির প্রত্যেকের হাতেই এক একটি শাঁক; অল্পবয়স্কা পাঁচটি মেয়ে—বয়স ছয়-সাত বছরের বেশী নয়—বরণডালা মাথায় করিয়া হাসিমুখে বড়দের মাঝেই স্থান লইয়াছে।

দালানের তিনটি প্রাণীই চমৎকৃত হইয়া আসন ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িয়াছে। এই সময় মাধুরা দেবীর পরিচারিকা দামিনী চণ্ডীর কাছে আসিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল: এরা সব পাড়ার মেয়ে, তোমাকে বরণ করতে এসেছে বৌ-রাণী! রাণীমার মহলেই গিয়েছিল, তিনি আমাকে দিয়ে এখানে পাঠিয়ে দিলেন।

তরুণী দলটির প্রথমেই ছিল তরলা। এই সময় সে চণ্ডীর কাছে আসিবার জন্য পা বাড়াইতেই রাজীবের সহিত চোখাচোখী হইয়া গেল। তরলার পিছনে শিবানী মেয়েটিও ছিল। তরলা বলিল: এই যে রাজীবদা, তুমিও এখানে এসেছ দেখছি! বুঝেছি, লাইব্রেরীর তরফ থেকে আসা হয়েছে। কিন্তু তোমাদের আগেই আমরা এসেছি আমাদের গাঁয়ের মেয়েদের তরফ থেকে বৌ-রাণীকে সম্বর্ধনা করতে।

চণ্ডী নিজেই অগ্রসর হইয়া তরলার হাতখানি সাদরে ধরিয়া স্নিগ্ধ স্বরে জিজ্ঞাসা করিল: কি ব্যাপার বলুন ত? আমরা ত এ ভাবে আপনাদের দেখে সত্যিই অবাক হোয়ে গেছি।

সুন্দর মুখখানি মিষ্টি হাসিতে ভরাইয়া তরলা বলিল: সত্যি বলছেন বৌ-রাণী, এখনো অবাক হোয়ে আছেন? কিছুই বুঝতে পারেননি··· আমাদের দেখেও—রাজীবদা'র মুখে শুনেও?

চণ্ডীও সহাস্যে উত্তর করিল: কিন্তু এ যে সত্যিই আপনাদের বাড়াবাড়ি হোচ্ছে! শাঁখ বাজিয়ে এত ঘটা করে আমার সঙ্গে আলাপ

করতে এসে একি লজ্জায় ফেললেন বলুন ত ? যাই হোক, এখন সকলে বস্থন দেখি—

তরলা বলিল : বসব কি ? আগে আপনার পা ধুইয়ে দিই, আলতা পরাই, চরণে অর্ঘ দিই, সবাই মিলে বরণ করি—

চণ্ডী বলিল : যা করবার পরে করবেন। কিন্তু তার আগে আপনাদের বসতেই হবে। শাঁখ বাজিয়ে যখন এসেছেন, এ কথা অবিশ্যিই মানবেন যে, কারুর বাড়ীতে এলেই আগে বসতে হয়, নৈলে গৃহদেবতা রাগ করেন, আর গৃহীর তাতে অকল্যাণ আসে। বস্থন দেখি সকলে—

দালানটির তুই পার্শ্বেই সারি সারি অনেকগুলি কেদারা ছিল। চণ্ডী সাদরে প্রায় প্রত্যেকের কাছে গিয়া হাতে হাত দিয়া সযত্নে এক একখানি আসনে সকলকে বসাইয়া দিল।

রাজীব বলিল : এঁরা দেখছি আমাদের উপরে টেক্কা দিয়ে আগেই পথপ্রদর্শিকা হলেন।

তরলা মেয়েটীও ছাড়িবার পাত্রী নয়, তৎক্ষণাৎ রাজীবের কথার উত্তরে টিপ্পনী কাটিয়া বলিল : যাঁকে নিয়ে এই আয়োজন, তিনি যে আমাদেরই জাত রাজীবদা, তাই এ কাজটা আমাদেরই করণীয়। তবে তোমাদের হিংসা করবার কিছু নেই—আমরা বৌ-রাণীকে 'বিদ্যা-ভারতী' উপাধি দিয়ে যে ছড়াটি পড়বো, ইচ্ছে করলে তোমাদের সভায় সেটি ঘটা করে আমাদের দিয়েই গান করাতে পার, নেমন্তন্ন পেলে আমরা যোগ দিতে রাজী আছি।

রাজীব সহাস্যে বলিল : তোমরা রাজী থাকলে আমাদের পক্ষ থেকে প্রচুর ধন্যবাদও পাবে—তোমাদের এই প্রচেষ্টা সত্যিই কল্পনাতীত, আমি ভাবতেও পারিনি যে, তোমরা এমন করে এগিয়ে আসবে। যদি এমন করে এগিয়ে লাইব্রেরীর কাজেও আমাদের সঙ্গে যোগ দাও, তাহলে ত অনেক কিছুই হতে পারে।

চণ্ডী বলিল : আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন রাজীববাবু, চণ্ডীর দেউলে সাহস করে আসার মানেই মনের বেড়ি ভেঙে ফেলা—

গোবিন্দ এই সময় দিব্য স্নিগ্ধ স্বরে কথাটির সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া বলিল : আমার মনটি বেড়ি পরে কি রকম আড়ষ্ট হয়ে থাকত, সে ত তোমরা জানতে ; কিন্তু এখন দেখছ ত, মা সরস্বতী প্রসন্ন হয়ে নিজেই সে বেড়ি খুলে দিয়েছেন। আমি এখন মুক্তি পেয়েছি, সত্যকার মানুষ হয়েছি।

তরলা এই সময় খপ করিয়া উঠিয়া একেবারে গোবিন্দনারায়ণের সম্মুখে আসিয়া সহাস্যে বলিল : আমাকে চিনতে পারেন ? অনেক দিন আগে—ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলাম বলে ; আপনার বাবা আমাকে একখানা সোনার পদক দিয়েছিলেন ; তারপর আদর করে নেমন্তন্নও করেছিলেন। আপনাদের বাড়ীর লাইব্রেরী ঘরখানা দেখতে গিয়ে, আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে যায়, আপনি তখন—

গোবিন্দনারায়ণ এতক্ষণ নিবদ্ধ দৃষ্টিতে তরলার মুখের দিকে চাহিয়াছিল ; তাহার স্নায়ুপুঞ্জেও বুঝি অতীত স্মৃতিগুলি এই মেয়েটির প্রতিটি কথার সঙ্গে ধীরে ধীরে সঞ্চারিত হইতেছিল ; এই সময় সহসা সে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল : হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে পড়ছে, মনে পড়ছে···সেই বয়সেই আপনি খুব বিদুষী হয়েছেন শুনে আমি চমকে গিয়েছিলাম—তখন আমাকে কি ছোটই মনে হয়েছিল আপনার কাছে,—লজ্জায় বুঝি মাথা কাটা যাচ্ছিল, আমার মাথাটা তখন গোবর-ভরা ছিল ত—তাই তাড়াতাড়ি ছুটে পালিয়েছিলাম ! হ্যাঁ, হ্যাঁ, বেশ মনে পড়ছে—

গোবিন্দনারায়ণের কথা শুনিতে শুনিতে তরলার মুখখানি আরক্ত হইয়া উঠল, মৃদু হাসিয়া ধীরে ধীরে সে বলিল : আমি কিন্তু সেই দিনটির কথা আজও ভুলতে পারিনি—মনে পড়লেই সেই ঘরখানা শুদ্ধ সব-কিছুই যেন চোখের সামনে ভেসে ওঠে। দেখুন, আপনি হয়ত ভুলে গেছেন, আমার কিন্তু ঠিক মনে আছে, আমাকে দেখেই সেদিন বলেছিলেন—

'তুমি কি গো? আমার চেয়ে ছোট্টটি মাথায়, কিন্তু বিদ্যেয়—ওরে বাবা, কতো বড় বল ত! ইচ্ছে করে তোমাকে গড় করি গো।'

পূর্ব্ববৎ উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে গোবিন্দনারায়ণ বলিল: হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে পড়েছে, মনে পড়েছে, বলেছিলাম বটে! এমনি করেই তখন কথা বলতাম যে!

মুখ টিপিয়া হাসিয়া তরলা বলিল: তাহলে দেখুন—আমি ঠিক মনে করে রেখেছি আপনার সেদিনের কথাগুলি। তার পর মনে আছে—আমি আপনার কথা শুনে শিউরে উঠে দাঁত দিয়ে জিভটা কেটে বলেছিলাম—ও মা, ও-কি কথা? বামুনের ছেলে তুমি গড় করবে কি? ও-কথা বলতে নেই। তার পরেই আপনিও দাঁত দিয়ে জিভটা কেটে মুখখানা কেমন এক রকম করে বলে উঠলেন—'বলতে নেই? ভাগ্যিস্ কেউ শুনতে পায়নি!' তার পরেই আপনার তোড়জোড় সব নিয়েই ছুট!

গোবিন্দনারায়ণ বলিল: আপনার কথাগুলো শুনতে শুনতে আমার সবই মনে পড়ছে।

তরলা বলিল: কিন্তু সেদিন যে ভুল করেছিলাম, আগে ত সেটা শুধরে নিই। আপনি গড় করবার কথা বললেও, আমি কিন্তু গড় করতে সেদিন মাথা হেঁট করিনি—মুখ্যু মনিষ্যি, তায় মাথায় গোবর-ভরা—কি করে গড় করি বলুন! কিন্তু আজ যখন চাকা ঘুরে গেছে—সেই ভুলটা আগে সেরে নিই—

কথাগুলি বলিতে বলিতেই তরলা সাড়ির অঞ্চলটি গলায় দিয়া গোবিন্দনারায়ণের পায়ের কাছে বসিয়া ভক্তিভরে মাথাটি নিচু করিয়া দিল। চণ্ডীও অনুরূপ ভক্তিলাভে বঞ্চিত হইল না।

হঠাৎ কি মনে ভাবিয়া আপন মনেই একটি মেয়ে শাঁখে ফুঁ দিল—তাহার দেখাদেখি অপর মেয়েগুলিও তাহাকে অনুসরণ করিল। শঙ্খ-ধ্বনিতে দালানটি পুনরায় মুখরিত হইল।

চার

বৈকালে হরিনারায়ণ বাবু বিশ্রামকক্ষে সেদিন বাপুলির সহিত আলাপ করিতেছিলেন। আলাপ-আলোচনার মধ্যে পাছে হঠাৎ বৈষয়িক কথা আসিয়া পড়ে, এই আশংকায় বাপুলী ইদানীং ভিতরে আসিতে চাহিতেন না; কিন্তু হরিনারায়ণ বাবু এ ব্যাপারে একেবারে নাছোড়বান্দা; লোকের উপর লোক পাঠাইয়া বাপুলিকে স্বকক্ষে আনাইয়া তবে নিরস্ত হইতেন।

সেদিনও এই ভাবে বাপুলিকে ডাকাইয়া আনিতে হইয়াছে উপরের বিশ্রামকক্ষে। হরিনারায়ণ বাবু গম্ভীর মুখে বলিলেন: দেখ বাপুলি, বাঁধা-ধরারও একটা সীমা আছে। যে লোক সমস্ত এষ্টেটের আগা-গোড়া নথ-দর্পণে ছকে রাখত, তোমরা ত এখন তাকে এক রকম কয়েদ-ঘরে পূরেছ। কিন্তু তার ভাত হজম যাতে হয়, তার উপায় করে দিতে হবে ত! তুমি এলে আর কিছু না হোক, কতক চর্চা করা যেতে পারে ত! কথায় আছে, পরচর্চা না করতে পারলে বাঙালীর অন্ন পরিপাক হয় না। সে সুযোগটি থেকে আমাকে বাপু আর বঞ্চিত করো না।

কাজেই এখন বিকালের দিকে বাপুলিকে নিত্য-নিয়মিত ভাবেই আসিতে হয় এবং আসিলেই কিছু-কিছু চর্চাও আপনি আসিয়া পড়ে। হরিনারায়ণ বাবু বলেন—সত্যিই এতে ক্ষুধা বাড়ে হে বাপুলি! আমার কি বল না—হাতের তীর যখন ছুঁড়ে দিয়েছি, এখন বলবার কিছু নেই। তবু শুনতে বা চর্চা করতে দোষ কি?

সে দিন চর্চা করিতে করিতে চিকিৎসক মনোনয়নের কথা আসিয়া পড়িল। বাপুলি যে কথাটি এত দিন চাপিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা অবশেষে শুনাইতে হইল। চণ্ডী দেবী ডাক্তারদের দরখাস্তগুলি বাপুলির

কাছেই পাঠাইয়াছিলেন এবং আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়ের শিষ্য-স্থানীয় ডাক্তার প্রতাপ রায়ের দরখাস্তখানিকেই গুরুত্ব দিয়া তাঁহাকে আসিবার জন্য পত্র লিখিবার নির্দেশও দিয়াছেন বাপুলিকে। সেদিন আলোচনা প্রসঙ্গে কথাটা সহসা বলিয়া ফেলিলেন বাপুলি।

হরিনারায়ণ কিছুক্ষণ স্তব্ধ ভাবে থাকিয়া তাহার পর বলিলেন: কৈ, এ কথা ত আমাকে বলনি?

বাপুলি: বললেই বা কি হতো বলুন? এ ডাক্তারের কত এলেম, তিনি এলে কত বড়-বড় কাজ হতে পারে, তারও ত আভাস পেলেন! তা ছাড়া, ডাক্তার বাগচির দরখাস্ত এখানে আসবার আগেই তাঁকে আসবার জন্য লেখা হয়েছে। জানতাম, শুনলেই আপনি উদ্বিগ্ন হবেন, তাই কথাটা চেপে রাখা হয়েছিল। কিন্তু আপনাকে ত পারবার যো নেই!

হরিনারায়ণ: ওদিকে রাণীও ডাঃ বাগচিকে কথা দিয়ে এসেছেন, নিবারণ তাঁকে নিয়ে আজ-কালের মধ্যেই আসছে। তখন কি করে সামলাবে?

বাপুলি: চণ্ডীমা বলেছেন—দু'জনই আসুন; যাঁকে বেশী উপযুক্ত দেখা যাবে, তাঁকেই আমরা রাখব।

হরিনারায়ণ: সেটা দেখবে কে? সেরেস্তার লোকেরা ত আর ডাক্তারদের যোগ্যতা বিচার করতে পারবে না!

বাপুলি: চণ্ডীমা বলেছেন—যাদের জন্য ডাক্তার, তারাই না-কি ঠিক বিচার করতে পারবে। তারাই বুঝবে—কাকে পেলে তাদের উপকার হবে।

হরিনারায়ণ: আচ্ছা বাপুলি, তোমাকেই জিজ্ঞাসা করি—রাণী যখন না জেনে-শুনেই এক জনকে কথা দিয়ে এসেছেন, আর সে লোক অনুপযুক্তও নয়—তখন চণ্ডীমা রাণীর দিকে তাকিয়েও ত নিজের

জেদটাকে ছাড়তে পারতেন! এই ডাক্তারকে জরুরী তার করে দিলেই হতো—তাঁকে আর প্রয়োজন নেই।

বাপুলি: আপনি রাণীমার প্রকৃতি যত ভাল করে জেনেছেন, আপনার চণ্ডীমার প্রকৃতি তাহলে এখনো তেমন করে জানেননি, তাই এ প্রস্তাব করতে পারলেন। তার চেয়ে রাণীমাকেই কেন তাঁর জিদটা ছাড়বার জন্য অনুরোধ করুন না।

হরিনারায়ণ: তুমি যে কথাটার এমন চোখা জবাব দেবে, তা ভাবিনি বাপুলি!

বাপুলি: আপনি গোড়াতেই বলেছেন—যে সব কথা আমাদের মধ্যে হবে, সেগুলো পরচর্চা মাত্র—স্বাধীন ভাবেই আমরা মতামত প্রকাশ করব।

হরিনারায়ণ: আচ্ছা বাপুলি, এই ব্যাপারটার ভার যদি তোমার ওপর দেওয়া যায়, তুমি কি ভাবে নিষ্পত্তি করতে চাও? কারুর সঙ্গে তোমার কোন বাধ্য-বাধকতা নেই মনে করেই তুমি জবাব দাও দেখি।

বাপুলি: তাহলে আমার মত শুনুন—আপনার শ্বশুরের এষ্টেটের একজন ঝুনো ডাক্তারকে আমি কখনই এ এষ্টেটে আনতাম না; আর, রাণীমা নিজে থেকে তাঁকে কথা দিয়ে এসেছেন বলে, তার জন্য কোন সঙ্কোচ না করে ওঁকে দিয়েই জরুরী ডাক্তারকে ডাকে জানাতাম যে, তিনি যেন না আসেন; কারণ, এখানে রাণীর ফেরবার আগেই অন্য ডাক্তার নেওয়া হয়ে গেছে।

জোরে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া হরিনারায়ণ বলিলেন: বুঝিছি, রাণীর দলপুষ্টি তুমি পছন্দ কর না। তোমারো ইচ্ছা—চণ্ডীর জিদটাই রক্ষা হয়।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কর্ত্তার মুখখানা নিরীক্ষণ করিয়া গম্ভীর মুখে বাপুলি বলিলেন: আপনি যদি এ ব্যাপারটি ভাল করে তলিয়ে বুঝতেন,

তাহলে এর মধ্যে চণ্ডীমার জিদটাই শুধু দেখতেন না—তিনি যে কি কঠিন সমস্যার মধ্যে পড়েছেন, সেটাও উপলব্ধি করতে পারতেন। সাধারণ স্তরের একটা মেয়ে হলে ঐ দরখাস্ত আর তার নিচে আপনার হাতে লেখা মন্তব্যটা পড়েই তিনি ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলতেন—সব চুকে-বুকে যেত। কিন্তু আপনার দেওয়া ভার হাত পেতে নেবার সঙ্গে সঙ্গে একটা দায়িত্বও তাঁকে মেনে নিতে হয়েছে। এখন ঐ দরখাস্ত মঞ্জুর করতে হলে তাঁর সেই দায়িত্বকে হত্যা করতে হয়—এইখানেই সাধারণ স্তরের মেয়ের সঙ্গে চণ্ডীমার পার্থক্য। কিন্তু আপনার আর রাণীর মর্যাদার দিকে চেয়েই তাঁকে যোগ্যতা নির্ণয়ের ব্যবস্থা করতে হয়েছে। যিনি বেশী উপযুক্ত হবেন, তাঁকেই নেওয়া হবে। এতে ত আপত্তি করবার কিছু নেই; আর, এ রকম ব্যবস্থাকে চণ্ডীমার জিদ-রক্ষাও বলা যায় না।

সশব্দে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া হরিনারায়ণ বলিলেন: চেপে যাও বাপুলি, চেপে যাও—আর ও কথায় কাজ নেই, এর পর দেখে নিও—দুই ডাক্তারের মধ্যেই গজ-কচ্ছপের লড়াই বাধবে।

বাপুলিও গম্ভীর মুখে উত্তর করলেন: কিন্তু আপনি যদি 'হাতের তীর ছেড়ে দিয়েছেন' ভেবে এর মধ্যে হাত না গলান—কিছুই হবে না।

পাঁচ

প্রতিদিনের মত সেদিনও সকালের দিকে চণ্ডী শ্বশুরের কক্ষে আসিয়াছে। দিক্-চক্রবাল রাঙ্গাইয়া প্রভাতের সূর্য তখন রক্তবর্ণ মেঘস্তূপের মধ্য দিয়া অনেকটা উপরে উঠিয়াছে—ছাদে অলিন্দে বাতায়ন-গুলির গায়ে তাহার কিরণ আসিয়া সবে মাত্র পড়িয়াছে। তাহারই একটি শিখার আভা বাতায়নটির সার্শির ফাঁক দিয়া চণ্ডীর সীমন্তের গভীর সিন্দুর-রেখাটির উপর পড়িয়া যেন উপলমণির মত জ্বলিতেছে।

হরিনারায়ণ মুগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়াছিলেন বধূর অপরূপ শোভাময় স্নিগ্ধোজ্জ্বল মূর্তির পানে। ইতিমধ্যেই সে স্নান ও পূজা সারিয়া সূর্যার্ঘের জবা-কুসুমটি তাম্র-টাটে লইয়া সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই শ্বশুর-সম্ভাষণে উপস্থিত। প্রত্যহই ঠিক এই সময় এই ভাবে বধূর শুভাগমন হয় এবং তৎপূর্বেই প্রাতঃকৃত্যাদি সারিয়া এই আসনখানিতে বসিয়া হরিনারায়ণ বধূর প্রতীক্ষা করিয়া থাকেন। সাধারণতঃ এ বাড়ীর কেহই সূর্যোদয়ের পূর্বে শয্যাত্যাগে অভ্যস্ত ছিলেন না—সূর্যের আলো প্রখর হইয়া গৃহমধ্যে ছড়াইয়া না পড়িলে তাঁহাদের নিদ্রালস চক্ষুর জড়তা কাটিত না। চণ্ডী প্রথমেই শ্বশুরকে লইয়া পড়ে; তাঁহার উপর আবদারের শাসন প্রয়োগ করিয়া বলে: আপনার অসুখ আমি সারিয়ে দেব বাবা, কিন্তু আমার কথা মত নিয়ম মেনে আপনাকে চলতে হবে।

হরিনারায়ণ হাসিয়া উত্তর করেন: সে আর এমন বড় কথা কি মা! তোমার কথা মত নিয়ম মেনে চললে যদি অসুখ সেরে যায়—কেনই বা না মানব বলো?

চণ্ডী বলে: তাহ'লে কাল থেকেই আপনাকে খুব ভোরে উঠতে হবে—সূর্য ওঠবার আগেই। আপনার চাকরকে আমি বুঝিয়ে পড়িয়ে ঠিক করে নেব—সে সব করবে। আপনি এই আরাম-কেদারায় বসে আকাশে সূর্যোদয় দেখবেন। তার পর আমি এসে ওষুধ দেব আপনাকে।

চণ্ডীর নির্দেশ মত ভৃত্য দুর্গাদাস সূর্যোদয়ের আগেই প্রভুর শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত হয়—তাহার সাহায্যে হরিনারায়ণ প্রাতঃকৃত্যাদি সারিয়া ঘরের বাতায়নটির কাছে রক্ষিত আরাম-কেদারায় বসেন। এমন স্থানটিতে চণ্ডী কেদারাখানি রাখিয়া গিয়াছিল যে, তাহাতে বসিলেই আকাশের প্রশান্ত বুকে স্বাভাবিক ভাবে দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় এবং সূর্যোদয়ের সংগে সংগে সূর্য-রশ্মি সর্বাংগে ছড়াইয়া পড়ে। সূর্য-স্নানের

কথা হরিনারায়ণ শুনিয়াছিলেন; বুঝিলেন, বধূ তাহারই ব্যবস্থা করিয়াছেন। প্রভাতী আকাশের মনোরম দৃশ্য দেখা এবং স্নিগ্ধ বায়ুর মধুর পরশ পাওয়া—উভয়ই হরিনারায়ণের পক্ষে দুর্লভ ছিল। আরাম-কেদারায় অঙ্গ ঢালিয়া মনে মনে তিনি অনুতাপ করিতে থাকেন—প্রকৃতির এই অপূর্ব সুষমা, এমন অফুরন্ত স্বাস্থ্য-সম্পদ এত দিন তিনি উপেক্ষা করিয়া আসিয়াছেন; তাঁহার মত কত দুর্ভাগা এই ভাবে স্বভাব-সম্পদকে উপেক্ষা করিয়া থাকে!

খানিক পরেই চণ্ডী কক্ষে প্রবেশ করিল। সদ্যস্নাতা, আলুলায়িত-কুন্তলা, ক্ষৌমবস্ত্র-পরিহিতা অপরূপ শোভনা প্রতিমা! যৌবন যেন জীবন্ত হইয়া তাহাকে পরিবেষ্টন করিয়াছে; সুন্দর সীমন্তে সিন্দূরের রেখাটি যেন আকাশের সূর্য-রশ্মির মতই আভাময় হইয়াছে। হাতের তাম্রপাত্র হইতে পঞ্চমুখী জবাফুলটি লইয়া সে শ্বশুরের ললাটে, মস্তকে ও বক্ষে তাহার পরশ দিয়া কেদারার সামনে আধারটির উপর রাখিয়া দিল; তাহার পর অঞ্চলটি গলায় দিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া শ্বশুরকে প্রণাম করিল।

ইহা হইল প্রথম দিনের ঘটনা—পূর্ব-দিন মাধুরী দেবী পিত্রালয়ে গিয়াছেন। এ পর্যন্ত চণ্ডীর পক্ষে শ্বশুরের উপর ক্ষমতা প্রয়োগের এরূপ সুযোগ ঘটে নাই। তিনি এবং তাঁহার আদরিণী ভ্রাতৃকন্যা মৃণালিনীর মধ্যে যেন নিদ্রার দীর্ঘসূত্রীতার প্রতিযোগিতা চলিত—কে কত বেলা পর্যন্ত শয্যালীন হইয়া থাকিতে পারে! তবে, এ বিষয়ে মৃণালিনীই অগ্রগণ্যা হইয়াছিল।

এ অবস্থায় চণ্ডী শ্বশুরের নিদ্রাকে নিয়ন্ত্রিত করিতে এই ভাবিয়া নিরস্ত ছিল যে, পাছে মাধুরী দেবী ও মৃণালিনী তাহার এই প্রচেষ্টাকে অনধিকার-চর্চা ভাবিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া উঠেন। অবশ্য, সুসঙ্গত ও বাঞ্ছনীয় ব্যাপারের অনুকূলে হস্তক্ষেপ করিতে কোন দিনই সে শঙ্কিত ছিল না বা সঙ্কুচিত হইত

না ; তথাপি সাম্প্রতিক অপ্রীতিকর ঘটনার কথা ভাবিয়া চণ্ডী সর্বতোভাবে নিজের চিত্তকে সংহত রাখিতে সচেষ্ট থাকিত—এ বাড়ীর এই দুইটি মহিলার সম্পর্কে কোন দিক্ দিয়া তাহার কোন ব্যবহারে যাহাতে পাণ হইতে চূণটুকুও না খসিয়া পড়ে !

গৃহিণীর পিত্রালয় গমনের ফলেই চণ্ডীর পক্ষে শ্বশুরের উক্ত বদভ্যাসটি দূরীকরণের এই সুযোগ ঘটিল। প্রথমে তিনি একটু বিরক্তই হইয়াছিলেন বধূর এই প্রচেষ্টাকে তাহার বাহাদুরী দেখাইবার নূতন একটা ফন্দী ভাবিয়া। অথচ, তাহার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিবার মত সাহসও তাঁহার ছিল না ; বিরক্ত ভাবেই তিনি প্রত্যূষে ভৃত্য দুর্গাদাসের পরিচর্যা গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। কিন্তু খানিকটা পরেই আরাম-কেদারায় আত্মসমর্পণ করিয়া সত্যই দেহে ও মনে এমন কিছু স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন, যাহা তাঁহার জীবনে অভিনব। ইহার পর চিত্তের সমস্ত বিরক্তি কোথায় সরিয়া গেল এবং বধূ চণ্ডীর ব্যবস্থায় অতিশয় প্রসন্ন হইয়া উঠিলেন।

মাধুরী দেবীর প্রত্যাবর্তনের পর নিজেই কথা-সূত্রে বলিয়া ফেলিলেন : শুনেছ, তুমি যাবার পরই বৌমা আমার চিকিৎসা সুরু করে দিয়েছেন ?

মাধুরী দেবী উত্তর করিলেন : আমি আসতেই দুর্গাদাস আমাকে সে কথা বলেছে। ভালোই ত। বৌমার খুব ভোরে ওঠা অভ্যাস তা জানি। তিনি যে তোমাকেও দলে টানতে পেরেছেন, তাতে তাঁর বাহাদুরী আছে। ভোরের বাতাস আর প্রথম রোদের তাপ গায়ে লাগানো তোমার পক্ষে খুবই ভালো। তা বলে, তুমি যেন ভেবো না, তোমার দেখাদেখি আমিও ঐ অভ্যাস আরম্ভ করব। 'যার কাজ তারে সাজে অন্যের তায় লাঠি বাজে'—এ কথা মনে রেখো।

ইহার পর হরিনারায়ণ আর কোন কথা বলেন নাই—এ প্রসঙ্গ এইখানেই বন্ধ হইয়া যায়। কিন্তু চণ্ডী তাহার অভ্যাস ত্যাগ করে নাই—মাধুরী দেবী ফিরিয়া আসা সত্ত্বেও, পার্শ্বের ঘরে তিনি যখন নিদ্রাচ্ছন্ন—চণ্ডী

তখন শ্বশুরের ঘরে প্রবেশ করিয়া অভ্যাস মত তাঁহার গায়ে ও মাথায় সূর্ধার্ঘের ফুলটির পরশ দিয়া প্রণাম করিয়া চলিয়া যায়। কোন কোন দিন শ্বশুর-বধূতে দুই-চারিটি কথাও হয়, কোন দিন হয়ত তাহার সুযোগ ঘটে না।

এ দিন শ্বশুরকে প্রণাম করিয়া অর্ঘপাত্রটি হাতে করিয়া চণ্ডী বলিল: লাইব্রেরীর সভার কথা ত শুনেছেন বাবা?

হরিনারায়ণ বলিলেনঃ শুধু কানে শোনা নয় মা, ওখান থেকে নিমন্ত্রণ-পত্রও পেয়েছি—সভা করে ওরা ওখানে তোমাদের সম্বর্ধনা করবে।

চণ্ডী বলিল: সেদিন পাড়ার যে মেয়েগুলি এসেছিলেন, শুনছি তাঁরাও সভায় যাবেন। তার জন্য মেয়েদের বসবার আলাদা ব্যবস্থাও হয়েছে শুনেছি। আপনার এ সম্বন্ধে কি মত বাবা?

হরিনারায়ণঃ কথাটা ত অনেক আগেই উঠেছে, আজকেই সভা। অথচ, আমার মতের কথা এমন অসময়ে জিজ্ঞাসা করবার অর্থ?

চণ্ডীঃ আমি জানতাম বাবা, আপনার কোন অমত এখানে হতে পারে না। আর এ-ও জানি বাবা—এ বাড়ীর আর কোন বধূর পক্ষে সভায় যাওয়া দূরের কথা—যাবার কথা তোলাটাও রীতিমত ধৃষ্টতার কথা হতো।

হরিনারায়ণঃ তুমি ঠিকই বলেছ মা! এ বাড়ীর কোন বধূর পক্ষে কোন সভায় সম্বর্ধনা নিতে যাবার কথাটা কেউ তুলতেও ভরসা পেত না কোন দিন। কিন্তু তুমিই তার ব্যতিক্রম হয়েছ ঘটনাচক্রে। আমি যখন তোমাকে কলেক্টর সাহেবদের সঙ্গে বোঝা-পড়ার জন্যে যাবার পথ খুলে দিয়েছি এক দিন, তখন সে পথে আর বাধা দিতে পারি না। লাইব্রেরী-ওয়ালারাও এটা বুঝতে পেরেছে, বোঝবার মতন মাথাওয়ালা লোকও সেখানে এসেছে। আর আমিও বুঝেছি, এর পর এ ব্যাপারে আমার

কাছে আবার নূতন করে অনুমতি নেওয়া তোমার পক্ষে সম্ভব নয়—প্রয়োজনও নেই।

চণ্ডী: সত্যি বাবা, আমার সামনের পথ নিজের হাতে যে ভাবে আপনি খুলে দিয়েছেন, এর পর পথে পা বাড়াবার আগে আপনাকে আবার জিজ্ঞাসা করতে যাওয়া মানে আপনার উপর বিশ্বাস হারানো; আর, নিজেকেও ছোট করা। তাই, ও সম্বন্ধে কোন কথা তুলিনি; এখন শুধু জানতে চেয়েছি, বাগুলীর মেয়েরাও লাইব্রেরীর সভায় যোগ দিচ্ছে। এতে আপনার কি মত ?

হরিনারায়ণ: অর্থাৎ তুমি ঐ সভায় যাচ্ছ, যেহেতু—সে অধিকার তুমি আগেই পেয়েছ নিজের যোগ্যতায়। এখন, পাড়ার মেয়েদের কথা তুলে আমার মতটা আর একবার যাচাই করতে চাইছ। এর উত্তর তাহলে শোন বলি—গ্রামে এমন একটা মানুষ যদি জেগে ওঠে, পথের সন্ধান যে পেয়েছে, তাহলে সে গ্রাম আর ঘুমিয়ে থাকতে পারে না—গ্রামশুদ্ধ লোকের চোখ থেকে তখন ঘুমের নেশা কেটে যাবেই। এখানেও হয়েছে তাই। আজ তোমাকে আদর্শ করে গ্রামের মেয়েরা এগিয়ে যেতে চায়। এর পরও তুমি আমার মত জিজ্ঞাসা করছ মা ?

চণ্ডী পুনরায় গলায় শাড়ীর আঁচলটি দিয়া শ্বশুরের পদতলে হেঁট হইয়া গড় করিল। হাত তুলিয়া মনে মনে আশীর্বাদ করিয়া হরিনারায়ণ বলিলেন: কিন্তু এ কথাও বলি মা, তোমার শাশুড়ী আর ননদ মৃণালিনী তোমার এই কাজটির সমর্থন করতে পারছেন না কিছুতেই। গ্রামের মেয়েরা যে প্রেরণা পেয়েছে, তারা যে-সাহসে এগিয়ে যেতে পেরেছে—এঁরা তাদের দিক্ দিয়েই যাননি। এঁরা বলতে চান যে, তোমার জন্যে এ বাড়ীর সুনামে দাগ পড়বে, এর পর যারা বধূ হয়ে আসবে এ বাড়ীতে, তাদেরও ক্ষতি করেছ তুমি। থাক সে কথা ; ও-নিয়ে এখন সুস্থ দেহকে ক্লান্ত করে কোন লাভ নেই। আমি কারুর আদর্শে বিঘ্ন হতে চাই নে

বৌমা। নিবারণের বৌ এলে উনি যদি তার পায়ে শিকল বেঁধে রাখেন কিংবা ঘেরাটোপের মধ্যে তাকে আটকে রাখতে চান, আমি যেমন কোন বাধা দেব না, তেমনি, তোমার স্বাধীনতাও আমি কোন দিন কোন দিক্ দিয়েই খর্ব করব না জেনো।

স্নিগ্ধ হাসিতে মুখখানি ভরাইয়া চণ্ডী বলিল: আপনার সে মহত্ত্ব আমি জানি বাবা! এখন ছেলেদের মত দেশের মেয়েদের মধ্যেও যে শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রচার খুব প্রয়োজন হয়ে পড়েছে, এ সত্য ত আপনি অনেক আগেই স্বীকার করেছেন। আর, মা'র কথা যা বললেন, তাঁরও মত শীগ্‌গিরই বদলে যাবে—মুখে তিনি যাই বলুন, তাঁর অন্তরটা এত দরাজ যে, সংকীর্ণতা ওখানে বেশীক্ষণ থাকতে পারে না।

হরিনারায়ণ প্রসন্ন ভাবে বলিয়া উঠিলেন: তুমি ঠিক ধরেছ মা, সত্যিই ওঁর মনটা খুব দরাজ। এই দেখ না—অতগুলি মেয়ে এলেন তোমাকে উপাধি দিয়ে বরণ করতে। উনি কিন্তু এখানে গৃহিণীর কর্তব্য ভোলেননি মা—প্রত্যেক মেয়েকে একখানি করে শাড়ী, আর এক জোড়া করে সোনা-বাঁধানো শাঁখা দেবার ব্যবস্থা করেছেন। ওঁর খাস দাসীকে পাঠিয়েছেন সেই তরলা মেয়েটির কাছে, যাতে সে হাতের মাপ যোগাড় করে দেয়—যারা এ বাড়ীতে সেদিন এসেছিল তাদের প্রত্যেকের। তাহলেই বোঝ মা, মেয়েদের ও-কাজটি ওঁর কাছে খুবই ভালই লেগেছিল। আর, তোমার উপর ওঁর যদি বিদ্বেষই থাকবে, তাহলে এ সব খয়রাতি কাণ্ড করতে যাবেন কেন? হোতে পারে মা, অনেক বিষয়ে তোমার সঙ্গে মতের হয়ত মিল নেই ওঁর, তা বলে তোমাকে ভালবাসেন না উনি, এ কথা কেউ বলবে না।

গাঢ় স্বরে চণ্ডী বলিল: আমিও ত কোন দিন সে কথা ভাবিনি বাবা! আর, মত নিয়ে তর্ক মনোবাদ সব জায়গাতেই হয়ে থাকে, সেই ত জীবনের পরিচয়।

এই সময় বাহিরে একটা কলরব উঠিল—একসঙ্গে বহু লোকের কণ্ঠধ্বনি শোনা গেল। শ্বশুর ও বধূ উভয়েই দ্বারের দিকে চাহিতেই দেখিলেন, দুর্গাদাস দ্রুতপদে আসিতেছে।

হরিনারায়ণ জিজ্ঞাসা করিলেন: ব্যাপার কি রে?

দুর্গাদাস বলিল: খোকা রাজা এলেন; তাঁর সঙ্গে এসেছেন একজন ডাক্তার—বুড়ো ডাক্তার।

হরিনারায়ণের প্রসন্ন মুখখানি সহসা ছাইয়ের মত বিবর্ণ হইয়া গেল। জোরে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া তিনি চণ্ডীর মুখের পানে চাহিলেন। চণ্ডীর মুখে কোন পরিবর্তন দেখা গেল না—স্বাভাবিক শান্ত স্বরে সে বলিল: আমি এখন যাই বাবা!

হরিনারায়ণ এমনই বিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, তাঁহার মুখ দিয়া কোন কথা বাহির হইল না। চণ্ডীও কোন উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়া একটু ক্ষিপ্রপদেই চলিয়া গেল।

এই ডাক্তারটি যে কে—তাহা বুঝিতে কাহারও বিলম্ব হয় নাই এবং এই ডাক্তারটিকে উপলক্ষ করিয়া যে এক অপ্রীতিকর আবহাওয়া সবার অদৃশ্যে তালগোল পাকাইতেছে, তাহাও শ্বশুর ও বধূর অবিদিত ছিল না।

বধূর আশঙ্কা, পাছে এই অভ্যাগত ডাক্তারটির অনুকূলে কোন সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিবার জন্য শ্বশুরের পক্ষ হইতে অনুরোধ আসে—যাহা রক্ষা করা তাহার পক্ষে কিছুতেই সম্ভবপর নহে; শ্বশুরও উদ্বিগ্ন ছিলেন—অবাঞ্ছিত ডাক্তারটিকে এরূপ অতর্কিত ভাবে আসিতে দেখিয়া বধূর মনটি যদি তিক্ততায় বিষাইয়া উঠে। চণ্ডীর প্রস্থানে তিনি আশ্বস্ত হইলেন।

খাস দাসী দামিনী আসিয়া রাণীর ঘুম ভাঙাইয়া দিল।

খানিক পরে মাধুরী দেবী কর্তার ঘরে আসিয়া বলিলেন: শুনেছ, খোকা এসেছে, আর ডাক্তার কাকাকে সঙ্গে করে এনেছে?

শুষ্ক স্বরে হরিনারায়ণ বলিলেন : শুনেছি—আর এ ত জানা কথা, তুমি ত ওখান থেকে ফিরেই এ কথা বলেছিলে।

অপাংগে স্বামীর দিকে চাহিয়া মাধুরী দেবী বলিলেন : আমার মনে হচ্ছে, আজকের দিনটায় ওরা না এলেই ভাল করত।

হরিনারায়ণ : কেন ?

মাধুরী : আজ বিকেলে সেই লাইব্রেরীর উৎসব যে! তোমার বৌমা সভায় গিয়ে বক্তৃতা করবেন। কথাটা কি আর ডাক্তারবাবুর কানে না যাবে ?

হরিনারায়ণ : গেলেই বা—আমাদের তাতে কি ক্ষতি-বৃদ্ধিটা হবে ?

মাধুরী : গাঙ্গুলী-বাড়ীর বৌ-এর কীর্তির কথা শুনবেন, আর সেখানে গিয়ে সবাইকে শোনাবেন। আমার মুখখানাই পুড়ে যাবে।

হরিনারায়ণ : কিন্তু এই ডাক্তারটি যখন তোমার ছেলের কীর্তি সব শুনবে, আর সেখানে গিয়ে তাই নিয়ে ঢাক পিটে বেড়াবে, তাতে বুঝি তোমার মুখখানা খুব উজ্জ্বল হবে ?

খর-দৃষ্টিতে স্বামীর পানে একটি বার চাহিয়া মুখখানা শক্ত করিয়া মাধুরী দেবী বলিলেন : নিবারণকে মানুষ করবার জন্যেই ডাক্তারবাবুকে আনা হয়েছে—সে ভয় করবার কিছু নেই।

দৃঢ় স্বরে হরিনারায়ণ বাবু উত্তর করিলেন : তাহলে বৌমার বক্তৃতার ব্যাপারে তোমার ডাক্তারের কথা বলবারও কিছু নেই। ডাক্তার এখানে চাকরী পাবার জন্যে উমেদার হয়েই এসেছে, এ কথা ভুলে যেও না।

মাধুরী দেবী কি বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু এই সময় নিবারণ আসিয়া বলিল : বাবা, ডাক্তার দাদু আপনার সঙ্গে দেখা করতে আস্‌ছেন।

হরিনারায়ণ বলিলেন : এত তাড়াতাড়ির কি দরকার! এসেছেন যখন, বিশ্রাম করুন, স্নানাহার হোক—

ডাক্তার শশীনাথ বাগচি দরজার আড়ালে দাঁড়াইয়াছিলেন। হরি-

নারায়ণের কথা শুনিয়া তাড়াতাড়ি গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। খর্বাকৃতি এবং খুব ক্ষিপ্র-প্রকৃতির মানুষ। বিধাতা-পুরুষ যেন সিদ্ধ-হস্তে রীতিমত দম দিয়া ইঁহাকে সংসারে পাঠাইয়াছেন—কথা বলিতে ক্লান্তি নাই, দেহ-খানিও যেন ছুটাছুটি করিবার জন্য ছটফট করিতেছে—বার্ধক্যকে দাবাইয়া রাখিয়া। যুক্ত হাত দুইখানি মাথার দিকে তুলিয়া সশ্রদ্ধ নমস্কার জানাইয়া দিব্য টানিয়া টানিয়া তিনি বলিলেন: বিলক্ষণ, স্নানাহার আর বিশ্রামের প্রত্যাশায় আপনাকে দর্শন করবার পাটটা মুলতুবি রাখব—তা কি কখনো হয় গাঙ্গুলীমশাই! আপনার কত কীর্তি-কাহিনীই ত শুনি; দেখেছিও দু-এক বার আপনাকে ওখানে: কিন্তু সামনা-সামনি বসে, আলাপের সুযোগ কখন ঘটেনি। তাই ত বললুম দাদাভাইকে, নিয়ে চল দাদা—আগে খোদ কর্তার সঙ্গে বোঝা-পড়া করি—

সামনের দিকে একখানা চৌকি হাত বাড়াইয়া দেখাইয়া দিয়া হরিনারায়ণ ডাক্তার বাগচিকে বসিতে ইঙ্গিত করিলেন। ডাক্তার বসিলে হরিনারায়ণ বলিলেন: খোদ কর্তা এখন খোলস ছেড়ে বাণপ্রস্থ নিয়েছেন—বুঝলেন?

ডাক্তার সহাস্যে বলিলেন: বাণপ্রস্থ থেকে তাহলে আবার আপনাকে গার্হস্থ্যে টেনে আনতে হবে। কত আর বয়েস আপনার হয়েছে—হিসেব সেখানে হয়েছিল যে মাধুমা'র সামনেই; তাতে আমিই বছর দুয়েকের বড় হই। আর অসুখ-বিসুখ কার না হয়—তার জন্যে ভয় পাবার কি আছে? একটা মাসেই আপনাকে চাঙ্গা করে তুলব দেখবেন। এই নিবারণকে জিজ্ঞাসা করুন না, দু'টো হপ্তাতে তিন পাউণ্ড ওজন বাড়িয়ে দিয়েছি। আর, ওর জন্যই ত আমার এখানে আসা।

মাধুরী এই সুযোগে মৃদু স্বরে বলিলেন: দাদার যে অসুখ করেছিল, কাউকে ত জানাননি—কিন্তু ডাক্তার কাকাই—

ডাক্তার অমনি এইখানে মাধুরীর মুখ হইতে কথাটা কাড়িয়া লইয়া

তাড়াতাড়ি বলিলেন ঃ আমিও জানাতে দিইনি। অসুখ-বিসুখে লোক-জানাজানি আমি পছন্দ করি না গাঙ্গুলীমশাই! বুক ঠুকে বলে দিলাম, ভয় নেই—সারিয়ে আমি তুলবই। উঠলেন সেরে—আর চেহারা এখন ডবল হয়েছে। এই যে দাদাভাইটির ভার নিয়েছি, দেখবেন একটা মাস পরে।

মাধুরী বলিল ঃ নিবারণকে ত দেখবেনই, এখন এঁকে ভাল করে একবার একজামিন করুন দেখি ডাক্তার কাকা!

উৎসাহের সুরে শশীনাথ ডাক্তার বলিলেন ঃ নিশ্চয় করব—উনি হচ্ছেন গাছ, ওঁকে ত দেখতেই হবে! আমি বলি কি আজ থেকেই তাহলে—

হরিনারায়ণ তাড়াতাড়ি বলিলেন ঃ না না না—আমাকে এখন দেখতে হবে না ডাক্তার! আমার এখন স্বভাব-চিকিৎসা চলেছে। এর সঙ্গে আর কোন চিকিৎসা আপাতত থাপ থাবে না।

বিস্ময়ের সুরে ডাক্তার বলিলেন ঃ স্বভাব-চিকিৎসা! চিকিৎসকটি কে?

হরিনারায়ণ বলিলেন ঃ আমার বৌমা। তিনি আমার উপর সূর্য-শক্তি প্রয়োগ করছেন। ভোরে উঠে রৌদ্র-স্নান করি। সূর্য-স্তব পড়ি, আর সূর্য-পূজার পর সূর্যার্ঘের পরশ দিয়ে বৌমা আমাকে আস্তে আস্তে আরোগ্যের পথে এগিয়ে দিচ্ছেন। ডাক্তারী ওষুধ এর উপরে চালাতে গেলে হিতে বিপরীত হবে ডাক্তার!

ডাক্তারের মুখের কথা বন্ধ হইয়া গেল। মাধুরী দেবী উদাস দৃষ্টি সামনের বাতায়ন-পথে নিবদ্ধ করিলেন। নিবারণের মুখখানা আরক্ত হইয়া উঠিল।

ছয়

গোবিন্দনারায়ণ ও চণ্ডী মুখোমুখী বসিয়া পাঠাগারের অভিভাষণ সম্পর্কে আলোচনা করিতেছিল। গোবিন্দনারায়ণ যে অভিভাষণ প্রদান করিবে, তাহা বেশ প্রাঞ্জল বাঙ্গলা ভাষায় লিখিয়াছে—সভায় পাঠ করিবার জন্য। চণ্ডী অভিভাষণ লিখে নাই; তাহার ইচ্ছা, সভার পারিপার্শ্বিক অবস্থা দেখিয়া বক্তব্য বিষয় মুখেই বলিবে।

গোবিন্দ তাহার অভিভাষণটির প্রায় উপসংহারে আসিয়াছে, এমন সময়ে দুর্গাদাস আসিয়া বলিল: বড় দাদাবাবু, ডাক্তারবাবু আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।

কাগজ হইতে মুখখানা তুলিয়া গোবিন্দ জিজ্ঞাসা করিল: কে ডাক্তারবাবু?

পরক্ষণে দীর্ঘ দালানটির মধ্যে প্রবেশ করিয়া শশীনাথ ডাক্তার হাসিমুখে উত্তর করিলেন: আমি বড় দাদাভাই। নাম আমার শশীনাথ বাগচি। হেমন্তপুর রাজ-এষ্টেটের—

ডাক্তারের কথায় বাধা দিয়া চণ্ডী বলিল: জানি আপনাকে ডাক্তারবাবু। আপনি বসুন।

গোবিন্দ চণ্ডীর মুখের দিকে জিজ্ঞাসু-দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকায় চণ্ডী বলিল: ঠাকুরপোর সঙ্গে ইনিই এসেছেন হেমন্তপুর থেকে। বিশু ডাক্তারের জায়গায় ইনিও প্রার্থী—

একখানা চেয়ারে বসিতে বসিতে ডাক্তার বাগচি বলিলেন: ও-কথা আমাকে বলা ঠিক নয় দিদিমণি, প্রার্থী বললে আমাকে ছোট করা হয়।

স্থির-দৃষ্টি ডাক্তারের মুখে নিবদ্ধ করিয়া চণ্ডী জিজ্ঞাসা করিল: কেন?

ডাক্তার বলিলেন: প্রার্থী বলে তাদের—যারা চাকুরীর উমেদারীতে দরখাস্ত হাতে করে লাইন দিয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু আমি ত সে ভাবে

আসিনি; মাধু—ঐ নিবারণের মা—ওরা সব আমার কোলে-পিঠে মানুষ ত! সাধ্য-সাধনা করে আমাকে এক রকম টেনে এনেছে। তাই বলছিলাম—

মুখখানা শক্ত করিয়া চণ্ডী বলিল: কিন্তু আপনিও একখানা দরখাস্ত পাঠিয়েছিলেন বলে মনে হচ্ছে,—আর আমাদের সেরেস্তাতেই সেখানা আছে।

মুখের একটা বিচিত্র শব্দ করিয়া ডাক্তার বলিলেন: ওটা হোচ্ছে 'নেম-কর্ম' দিদি—সরকারী বড় বড় অফিসারদের সরকার আগে থেকে মনোনীত করলেও, তাঁদের দরখাস্ত করতে হয়—এটা দস্তুর কি না। তা—

চণ্ডী বলিল: আচ্ছা, আপনি একটু বসুন। ইনি একটা লেখা পড়ছিলেন, একটু বাকী আছে—ওটা শেষ করবেন।

উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে ডাক্তার বলিলেন: বেশ ত, বেশ ত! দু'-চারটে কথা আমারও কানে গিয়েছে—বেশ লিখেছেন দাদাভাই, বেশ বলেছেন। পড় ভাই, পড়—

গোবিন্দনারায়ণ অবাক হইয়া মানুষটির কথা শুনিতেছিল লেখা-কাগজ কয়খানি হাতে লইয়া। এই সময় চণ্ডীর ইঙ্গিতে বাকী কয় ছত্র মিনিট-তিনেকের মধ্যেই পড়িয়া শেষ করিল।

সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার চীৎকার করিয়া উঠিলেন: বা! বা! দাদাভাইয়ের কণ্ঠে যেন মা-সরস্বতী বসেছিলেন! কথাগুলো যেমন জোরালো, আর তেমনি খাঁটি। ঐ যে গো···আমার পানে চেয়ে দেখ—ছিলাম আগে মূর্খ, অমানুষ। লেখা-পড়া শিখে এখন হয়েছি মানুষ। দেশের অমানুষরাও আমার মত বিদ্যালাভ করে মানুষ হোক!···বেশ বলেছ।. নিজে ভুক্তভোগী বলেই বলতে পেরেছ এ কথা। তোমার কথা—এই বৌ-দিদিমণির কথা—সব শুনিছি, মাধু সব বলেছে।

চণ্ডী জিজ্ঞাসা করিল: আপনি কি তাহলে সভায় যাবেন?

ডাক্তার বলিলেন : নিশ্চয় যাব। তুমি নিজে সভায় গিয়ে বসবে—বক্তৃতা করবে ; এ যে আমাদের পক্ষে স্বপ্ন। কলকাতায় ঠাকুর-বাড়ীর মেয়েরা সভা করেন শুনিছি—চোখে দেখবার সৌভাগ্য কখনো হয় নি।

গোবিন্দ বলিল : আপনার যখন এত উৎসাহ, সভায় তাহলে আপনিও কিছু বলবেন ত ?

গোবিন্দের কথায় ডাক্তারের উৎসাহ বাড়িয়া গেল। গলায় জোর দিয়া বলিলেন : নিশ্চয় বলব, বলা ত উচিত। শিক্ষার জন্যেই ত আমরা মানুষ। দেখবে তখন দাদাভাই, থাকা যদি এখানে হয়—তাহলে কি কাণ্ডই না করি এই শিক্ষা নিয়ে।

ডাক্তারের কথায় মনে মনে কৌতুক বোধ করিয়া চণ্ডী বলিল : ভবিষ্যতের কথা পরে—কিন্তু এ জীবনে শিক্ষা সম্বন্ধে কি করেছেন তারই দু'চারটে কথা বলবেন ডাক্তারবাবু ?

ডাক্তার বোধ হয় ভাবেন নাই তাঁহার মুখের উপর এমন প্রশ্ন তুলিয়া বসিবে এই মেয়েটি। প্রশ্নটি শুনিয়া আত্ম-সমর্থনের উদ্দেশ্যে তিনি বলিয়া ফেলিলেন : সে ফুরসৎ ত কোন দিন জীবনে পাইনি দিদি, রোগ আর রুগী নিয়েই সারা জীবনটা কেটে গেছে—

চণ্ডী বলিল : আপনি ত শিক্ষাব্রতী নন ডাক্তারবাবু—যে বৃত্তি আপনার, তার অঙ্গ হচ্ছে সেবা। আপনি ইচ্ছা করলে এই চিকিৎসার ভিতর দিয়েই অনেক কিছু করতে পারতেন। সকলকেই যে শিক্ষার আলো ছড়াতে হবে, তার কি কথা আছে ! আপনার ব্রতও খুব মহৎ—আপনি সমাজের কত উপকারই করতে পারেন—আপনার এই চিকিৎসা-বিদ্যা দিয়েই।

চণ্ডীর কথাটা ডাক্তার তলাইয়া না বুঝিয়াই তাড়াতাড়ি বলিয়া ফেলিলেন : পারি বৈ কি—নিশ্চয়ই পারি। সেই জন্যেই ত এখানে এসেছি দিদি ! জানি ত, বাগুলীর গাঙ্গুলীদের মেজাজই আলাদা—টাকা

এরা খরচ করতে জানে; কাজেই, এখানে অনেক কিছুই করা যেতে পারে।

ডাক্তারের কথা শুনিয়া চণ্ডী স্বামীর মুখের দিকে চাহিল; সে দৃষ্টি অর্থপূর্ণ। নিজেও সে উপলব্ধি করিল যে, এই ধরণের কথা বলিতে যাহারা অভ্যস্ত, স্বার্থকেই তাহারা ভাল করিয়া চিনিয়াছে—পরার্থে তাহাদের কোন দান নাই। এই ডাক্তারটি মুখে যাহা বলিতেছে, অন্তরের সহিত তাহার কোন যোগ নাই ইহা যেমন সত্য, ইহাদের শিক্ষানুরাগ সম্বন্ধে তাহার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা এবং সহানুভূতিও তেমনি অবাস্তব। এক আঁচড়েই চণ্ডী এই বিজ্ঞ বিচক্ষণ প্রবীণ চিকিৎসকটির হাড়-হদ্দ সুস্পষ্ট ভাবে চিনিতে পারিয়া একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিল।

গোবিন্দ একটু গম্ভীর হইয়াই এই সময় বলিল: দেখুন ডাক্তারবাবু, কোন ভালো কাজ করবার ইচ্ছা যদি মনে থাকে, টাকার জন্যে তা আটকায় না; সেই ইচ্ছাটাই হচ্ছে খুব বড় কথা। এই আমাদের লাইব্রেরীর কথাটাই বলছি—এত দিন ঝিমিয়ে ছিল—কাজ কিছু হচ্ছিল না। কিন্তু হঠাৎ একটি ছেলে এসেই একার ইচ্ছা আর চেষ্টায় তাকে কি রকম প্রাণবন্ত করে তুলেছে—আজকের সভায় যদি দয়া করে যান, স্বচক্ষেই তা দেখতে পাবেন। এখন আপনার কথা শুনে আমার যা মনে হয়েছে, সেইটিই বলছি—দেখুন, একটানা অত-বড় একটা ষ্টেটের সংস্রবে থেকেও যদি দেশের কিছু কাজ করতে না পেরে থাকেন, শেষ বয়সে এখানে এর পর আর কিছু করা কি সম্ভব হবে?

জমিদার হরিনারায়ণ গাঙ্গুলীর এই ছেলেটির গল্প এখানে আসিবার কালেই ডাক্তার বাগচি ভাল করিয়াই শুনিয়াছেন এবং শুনিয়াও মনে মনে সংশয় পোষণ করিয়াছেন। কিন্তু সেই ছেলের মুখের কথাগুলি তাঁহার মনের সন্দেহ যে শুধু দূর করিয়া দিল তাহা নহে—কথাগুলি যেন হুলের মত তাঁহার সর্ব্বাংগে ফুটিয়া একটা জ্বালার সৃষ্টি করিল এ

অবস্থায় নীরব থাকাও ঠিক নয়, সুতরাং বিজ্ঞের মত মুখখানা মচকাইয়া চক্ষু দুইটি ঘুরাইয়া তিনি বলিলেন ঃ আচ্ছা বাবাজী, একটা কথা তাহলে জিজ্ঞাসা করি ; এই যে আজকাল যার-তার মুখেই হামেশা শুনি—দেশের কাজ। যেন এর জন্যে দেশের লোকের চোখে আর ঘুম নেই! এখন আমাকে বুঝিয়ে দিতে পারো—এই দেশের কাজটা কি ? আর এই—দেশের কাজ বলতে তোমরা কি বোঝ ? উত্তরটা শুনে তখন তোমার ঐ জিজ্ঞাসার উত্তর আমি দেব।

গোবিন্দ বলিল ঃ দেশের কাজ বলতে আমরা এইটিই সার বুঝে থাকি—ভগবান যাঁকে যে রকম সম্পদ বা সামর্থ্য দিয়েছেন, তার অন্তত কিছুটা তিনি যদি অন্তরের টানে দেশ বা দেশবাসীর কল্যাণের জন্যে দিতে পারেন—তাহলেই তাঁর পক্ষে সেটা হলো দেশের কাজ। একটা দৃষ্টান্ত দিয়ে কথাটা ভালো করে বুঝিয়ে দিচ্ছি শুনুন—স্বদেশী আন্দোলনের সময় কলকাতার অনেক ভিখিরীও তাদের অতি কষ্টের সঞ্চয় থেকে কিছুটা স্বদেশী ভাণ্ডারে খুব শ্রদ্ধার সঙ্গেই দান করেছিল। তাহলেই আমি বলবো ডাক্তারবাবু, তাদের সেই দান যত সামান্যই হোক—সত্যি সত্যিই তারা দেশের কাজ করেছিল। এমনি—টাকা দিয়ে, অন্ন-বস্ত্র দিয়ে, ওষুধ-পত্র, সেবা, শ্রম দিয়ে প্রত্যেকেই দেশের কাজ করতে পারে। চিকিৎসা-ব্যবসায়ী, শিক্ষাব্রতী, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, বাগ্মী, বৈজ্ঞানিক, শিল্পী—এঁদের প্রতিভা দিয়েও দেশের কাজ করেছেন, তার অনেক নজির আছে। জানি নে, আপনার চিকিৎসা-ব্যবসার সঙ্গে তার কতখানি সম্বন্ধ আছে।

কথাগুলি শুনিতে শুনিতেই ডাক্তার তাঁহার উত্তর প্রস্তুত করিতেছিলেন। এখন তাঁহাকে কিছু বলিতেই হইবে। দেশের কাজের সংজ্ঞা গোবিন্দ শুনাইয়া দিয়াছে, তাহা হইতে কাজের ফিরিস্তি দেওয়া কঠিন নহে—কে বা তাহার হিসাব লইতে যাইতেছে! তাই ডাক্তার

অম্লান বদনে বলিয়া ফেলিলেন : এই কথা! এই তোমার দেশের কাজ? আমি ভেবেছিলাম, বুঝি ক্ষুদিরাম, কানাই দত্তর মত প্রাণবলি দেবার কথা বলবে। আরে, এ যে তোমার সেই পর্বতের মূষিক প্রসবের জো হলো! ভিখিরী তার ভিক্ষের পাওয়া পুঁজির কিছুটা দিয়ে ফেললেই তার দেশের কাজ করা হয়ে গেল! তার মানে—কিছু দেওয়া। তা সে টাকাই হোক, জিনিস-পত্রই হোক, নিদেন এই মেহন্নত—তা দিলেও চলবে। তাহলে ত চুটিয়ে বলতে পারি বাবাজী,—দেশের কাজে আমি সবার উপরে টেক্কা দিয়েছি। এই ধর না—পঁয়ত্রিশটি বছর ধরে রুগী দেখছি; দিনে দশটি রুগী ধরলে পঁয়ত্রিশ বছরে কত হয়—তার হিসেব ত পড়েই রয়েছে। এ-ও ত দেশের কাজ বাবাজী—দেশের লোকের চিকিৎসা করেছি, ওষুধ দিয়েছি, ব্যবস্থা দিয়েছি—এ-ও ত সেবা। তার পর, এক দেশের কাজ এত দিন এক নাগাড়ে করে, আর এক দেশে এসেছি নূতন করে চিকিৎসার সঙ্গে সেবার উদ্দেশ্য নিয়ে! তাহলে, বুঝছ ত—কাজ কত এগিয়ে চলেছে?

ডাক্তার বাগচির চিকিৎসা ব্যবসায়-সম্পর্কে দেশের কাজের এই পাটোয়ারী হিসাব শুনিয়া গোবিন্দ অবাক হইয়া তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া রহিল। চণ্ডী এই সময় মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল : সত্যিই আপনি দেশের কাজের যে লম্বা ফিরিস্তি দিলেন ডাক্তারবাবু, সেটা হিসেব করে দেখবার মত। এক দিন ধীরে-সুস্থে সেটা করা যাবে'খন। এখন আমাদের মাথায় লাইব্রেরীর অধিবেশনটাই ঘুরছে কি না, কাজেই এটার নিষ্পত্তি ত আগে হোক। আর আপনিও ত সভায় যাচ্ছেন। এর পর কথা হবে।

এ কথার পর আর থাকা চলে না—ডাক্তারকে অগত্যা উঠিতে হইল। চণ্ডীর আহ্বানে এক জন ভৃত্য আসিয়া তাঁহাকে পথ দেখাইয়া লইয়া গেল।

সাত

বাশুলীর সাধারণ পাঠাগারটি পরিপাটীরূপে উৎসব-সজ্জায় সজ্জিত হইয়াছে। জমিদার-ভবন হইতে পাঠাগার পর্যন্ত সারা পথের উভয় পার্শ্বে সারিবদ্ধ পত্রপল্লবাবৃত স্তম্ভ এবং মধ্যে মধ্যে পুষ্পাচ্ছন্ন সুদৃশ্য তোরণ নির্মাতাদের রুচি ও অনাড়ম্বর সৌন্দর্য-প্রীতির পরিচয় দিতেছে।

ধীরপদে এই পথ অতিক্রম করিতেছিল গোবিন্দ ও চণ্ডী; পাঠাগারের সভায় ইহাদিগকে লইয়া যাইবার জন্য হরিনারায়ণবাবুর সাদা যুড়ি বাড়ীর দেউড়ীর সম্মুখে প্রতীক্ষা করিতেছিল। কিন্তু ইহারা পদব্রজেই পথটুকু দেখিতে দেখিতে যাইবে জানাইয়া গাড়ী আস্তাবলে পাঠাইয়া দেয়। দেউড়ীর দ্বারবান ও সদর-সেরেস্তার কর্মচারিগণ অবাক-বিস্ময়ে তাকাইয়া থাকে। এ-বাড়ীর শুদ্ধান্ত হইতে কোন মহিলাকে তাহারা এ-পর্যন্ত পদব্রজে পথ অতিক্রম করিতে দেখে নাই।

পথ-সজ্জা দেখিতে দেখিতে চণ্ডী সহাস্যে বলিল: এদের রুচি আশ্চর্য ভাবেই আমাদের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। কলা গাছ, বাঁশ, দেবদারুর ডাল-পাতা, লবঙ্গলতা—এই সব যোগাড় করে কেমন চমৎকার সাজিয়েছে দেখ! প্রত্যেকটি পল্লীর জিনিস, ইচ্ছা করলেই পাওয়া যায়, পয়সা খরচ করে কিনতে হয় না।

গোবিন্দ বলিল: এর আগেও এই রাস্তা সাজানো হয়েছে অনেক বার; যদিও তখন সৌন্দর্য বোঝবার মত বুদ্ধি ছিল না, কিন্তু মনে আছে। দামী লাল রঙের সালু, রঙ-বেরঙের কাগজের শিকল, কত রকম ফানুষ দিয়ে সব সাজানো হোত। সে সবের তুলনায় এবারকার এই সাদাসিদে সাজ-সজ্জা অনেক ভালো লাগছে বৈ কি! আমার মনে হচ্ছে, রাজীবের মাথা থেকেই সব বেরিয়েছে

চণ্ডী বলিল: যাদের মাথার মধ্যে সত্যিকার বস্তু কিছু থাকে তারা

যে-কাজে হাত দেবে, তার মধ্যেই কিছু-না-কিছু নতুনত্ব দেখিয়ে দেবেই। আমারও বিশ্বাস, রাজীববাবুই পথ-সজ্জার এই নূতন পরিকল্পনাটি করেছেন। ভালো, এখন দেখতে দেখতে চলো—এই সাজানোর ভিতর থেকেই ওঁর মনের পরিচয় পাওয়া যাবে। তোরণগুলোর দিকে চেয়ে দেখ—আমাদের নতুন জাতীয় পতাকাকেও ভোলেননি। কোন পল্লী-গ্রামের সাধারণ সভায় এ ভাবে এখনো জাতীয় পতাকাকে এনে সম্মান দেওয়া হয়নি।

গোবিন্দ বলিল : আর একটা লক্ষ্য করেছ—ফুল দিয়ে তোরণের গায়ে কেমন পরিপাটি করে 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্রটি ফুটিয়ে তুলেছে!

তোরণ হইতে মুখ তুলিয়া চণ্ডী জবাব দিল : তুমি তাহলে পড়েছ! পাকা চোখ না হলে ও লেখা কিন্তু খুঁজে বার করা শক্ত।

গোবিন্দ সহাস্যে বলিল : আমার চোখও তাহ'লে হাতের মতই পেকে গেছে বলো।

চণ্ডীর গাম্ভীর্য সহসা প্রসন্ন হাসিতে ভরিয়া গেল, উত্তর করিল : একটা কথা আছে না—জহুরী ছাড়া আর কেউ জহর চিনতে পারে না। বন্দে মাতরমের বেলায়ও ঐ কথা বলা চলে। মনে দেশাত্মবোধের আলো না পড়লে, পত্র-পল্লবের মধ্যে ঐ লুকোনো মন্ত্র চোখে পড়ে না।

গোবিন্দ : তাহলে দেশাত্মবোধের আলোও আমার মনে পড়েছে বলতে চাও?

চণ্ডী : নিশ্চয়ই। যেদিন হয়েছে তোমার আত্মপ্রকাশ—একটা মিথ্যা খবরের উপর জোর দিয়ে কলেক্টর সাহেব বাঙুলীতে আসেন আমার বিচার করতে; সেই দিন দেশাত্মবোধের আলো ওরাই আমাদের চোখের উপর ফেলেছিল। ঐ দিনটিকে আমি সেই জন্যে চিরস্মরণী
করে রাখতে চাই। সত্যি, ঐ দিন থেকে আমার চোখের দৃষ্টিও খা
গেছে। সেই থেকে আমি—

ধন
তেচেষ্টা
রদিকের

গোবিন্দ: কথাটা বলতে তোমার মুখে আটকে গেল, কিন্তু আমি বুঝতে পেরেছি, চণ্ডী।

চণ্ডী: বুঝতে পেরেছ! না, না, আমার জিজ্ঞাসা করাই ভুল হয়েছে—আমাকে বোঝবার মত দৃষ্টি তুমি ত পাবেই। তবু আমার শুনতে ইচ্ছা করছে তোমার মুখেই।

গোবিন্দ: সেই যে একটা কথা আছে না—ঘুমন্ত বাঘকে জাগিয়ে দেওয়া! তোমারো হয়েছে তাই—মনের মধ্যে যে বাঘ ঘুমিয়ে ছিল, সেদিনের ব্যাপারে তার ঘুম ভেঙে গেছে; এখন সে জেগে উঠে খুঁজে বেড়াচ্ছে খাদ্য।

ঊষার শুকতারার মত চণ্ডীর আয়ত চক্ষুর তারা দু'টি সহসা প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠিল গোবিন্দের কথায়। চোখের এ রূপ বুঝি গোবিন্দের দৃষ্টিতে নূতন। সে বুঝিল, যন্ত্রের ঠিক স্থানটিতেই তাহার হাত পড়িয়াছে। গোবিন্দ বলিয়া চলিল: মহাশক্তি তাঁর ভাঁড়ার উজাড় করে তোমাকে তাঁর শক্তি ঢেলে দিয়েছিলেন। একটা জড় পদার্থকে প্রাণবন্ত করতে কতটুকুই বা তার খরচ হয়েছে! এখনো যে সঞ্চয় রয়েছে তোমার ভাঁড়ারে—তারই ভার যে তোমাকে অস্থির করে তুলেছে। তার পর, ওঁরা এলেন সাজানো একটা অপবাদ নিয়ে তোমাকে রীতিমত আঘাত দেবার উদ্দেশ্যে। তুমি সে আঘাত তোমার ঐ সঞ্চিত শক্তি দিয়ে ঠেকাতে গিয়েই ওদের অনাচারের মস্ত একটা ফাটল দেখে শিউরে উঠলে। যাকে ভুলতে চেয়েছিলে, ঘুম পাড়িয়ে রেখেছিলে মনের গহন বনে—ওরা তার পথ খুলে দিয়ে গেছে। তাই বলছিলাম—ঘুমন্ত বাঘ জেগে উঠে তোমাকেও অস্থির করে তুলেছে।

চণ্ডী: ঠিক মিলে যাচ্ছে—তুমি বলে যাও।

গোবিন্দ: জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংসতা দেশের বুকে যে আগুন [illegible]লে, তোমারও বুকের ভিতরে তার একটা ফুলকি এসে পড়েছিল।

সাদা বা

কিন্তু সেই ফুলকিটুকু দিয়ে একটা অগ্নিকাণ্ড না ক'রে তার শিখার আলোকে শুধু তোমার মনের প্রদীপটিই জ্বালিয়ে নিয়েছিলে তুমি—অগ্নি-হোত্রী যে ভাবে অগ্নি রক্ষা করে, তেমনি করে সেই অগ্নি-দীপটিকে অন্যের অগোচরে অতি সন্তর্পণে ঢাকা দিয়ে রেখেছিলে বরাবর। কিন্তু দুর্ভাগ্য কি সৌভাগ্য তা জানি না—তোমাকে অপরাধী ভেবে বিচার করতে এসে সাহেবরাই হঠাৎ সেই ঢাকাটা খুলে দিয়ে গেছেন। ফলে ওটা হোয়ে দাঁড়িয়েছে ঠিক খোলস-ছাড়া সাপের গায়ে খোঁচা দেওয়া, কিংবা ঘুমন্ত বাঘকে ঐ ভাবে জাগিয়ে দেওয়ার মত। আগুনের ঐ ফুলকিটাই ক্রমশঃ স্ফুলিঙ্গ হোয়ে উঠেছে; এও এক সমস্যা। জানি না, আমার অনুমানটা ঠিক কি না—তোমার মনের ভিতরকার অবস্থা আমি যেটুকু উপলব্ধি করেছি, তাই বললাম।

পার্শ্ববর্তিনী পত্নী স্বামীর গতির সঙ্গে গতির সমতা রাখিয়া ধীরে ধীরে পদচালনা করিতেছিল। এই সময় পথ-পার্শ্ববর্তী একটি বৃক্ষসংলগ্ন তোরণ সম্মুখে আসিয়াই চণ্ডী সহসা স্থির হইয়া দাঁড়াইল। গোবিন্দকেও থামিতে হইল। পিছনের দিকে অনেকটা দূরত্ব বজায় রাখিয়া কতিপয় কৌতূহলী কিশোর ধীরে ধীরে ইহাদের অনুসরণ করিয়া আসিতেছিল; একবার পিছনের দিকে চাহিয়া পরক্ষণে সে দৃষ্টি স্বামীর মুখে নিবদ্ধ করিয়া গাঢ় স্বরে চণ্ডী বলিল: আমিও জানলাম যে, তোমার শিক্ষা সত্যই সার্থক হয়েছে। তুমি মানুষের অন্তর পড়ার বিদ্যায়ও পণ্ডিত হয়েছ। বই পড়ে জ্ঞান অর্জন করা শক্ত নয়—চেষ্টা করলেই পারা যায়। কিন্তু মানুষকে পড়ে তার অন্তর সম্বন্ধে সর্বজ্ঞ হওয়া দুঃসাধ্য ব্যাপার—সাধনা ছাড়া এটা সম্ভব হয় না। অল্প কথায় আমার ভিতরকার যে অবস্থা তুমি বললে, সেটা এত বাস্তব যে, শুনে আমি নিজেই আশ্চর্য হচ্ছি। সত্যিই—দেশে যখন ফিরে এলাম, জালিয়ানওয়ালাবাগের জলন্ত স্মৃতিটাকে আমি জাগাতে চেষ্টা করিনি—আমরা ছাপোষা বাবা, কাচ্চা-বাচ্চা নিয়ে বিব্রত মা, চারদিকের

দুর্বল পরিবেশ আমার মনের গতি তখন ঘুরিয়ে দিয়েছিল। সত্যিই যদি ঐ ধরণের কোন সমিতি সেখানে থাকত, আর তার সঙ্গে আমার সংযোগ ঘটত সেই সময়, তাহলে হয় ত আমার মন—সেই সঙ্গে আমার জীবনের গতিও ঐ দিকেই ছুটে যেত। তাই এখন বলছি, সাম্রাজ্যবাদী সরকারের বিরুদ্ধে যে বিদ্বেষ মনের মধ্যে চাপা থেকেও এক-একবার গুমরে গুমরে উঠতো, তারই কিছুটা আশে-পাশের ছোট-খাটো অত্যাচার অনাচার অসৈরণগুলোর প্রতিকার করতে কোন্ ফাঁকে আপনিই বেরিয়ে আসে। সেই সম্পর্কেই ত তোমার বাবার কাছে নালিশ ওঠে, আর আমার বিচার করতে এসেই সব শুনে সন্তুষ্ট হয়েই তিনি দুষ্ট মেয়েটিকে তাঁর কুলবধূ করেন।

গোবিন্দ এই সময় মৃদু স্বরে বলিল: সেই মিশনারী ইস্কুলের কাণ্ড ত? কিন্তু আমি কি ভাবি জানো, সত্যিকার শক্তিকে কিছুতেই চেপে রাখা যায় না। যে শক্তি তুমি জোর করে চেপে রেখেছিলে—ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে তাকে চালানো সম্ভব না হলেও, ইংরেজ মিশনারীদের দারুণ একটা আস্পর্ধা আর অনাচার নিবারণের উপলক্ষ হয়ে ওঠে সেটা। মনে হয়, দেশের ভাগ্য-বিধাতার মনেও সেই ইচ্ছাই ছিল। কেন না, অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা নিয়ে দেশকে স্বাধীন করবার ব্রত অনেকেই নিয়েছে; অনেক সমিতি গড়ে উঠেছে দেশের ছেলেদের গড়ে তুলতে—মনে-প্রাণে তাদের শক্তির প্রেরণা দিতে। কিন্তু দেশের মেয়েদের পানে তাকাতে কেউ নেই। ঐ যে কুশিক্ষা, তাদের জন্মগত সংস্কারকে সংস্কার না করে আরো বিকৃত করবার চেষ্টা, আষ্টে-পৃষ্ঠে বিধি-নিষেধের বাঁধন দিয়ে তাদের আড়ষ্ট করে রাখা—এ সবের প্রতিকার করতে কেউ এগিয়ে আসেনি। দেশকে স্বাধীন করবার চেষ্টা বা ভাবনা নিয়ে নেতারা থাকুন, কিন্তু দেশের মেয়েদের দেহ আর মন গড়ে তুলে তাদের জাগিয়ে তোলবার ভার নেওয়া

উচিত নেত্রীস্থানীয়া কোন মেয়ের। ঐ মিশনারী ইস্কুলের ব্যাপারটি উপলক্ষ করে বিধাতা তোমাকেই চিহ্নিত করেছেন—এ কথা তুমি মনে রেখ।

প্রশান্ত দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে চাহিয়া চণ্ডী বলিল: সত্যই, আমি একে নির্দেশ বলে মেনে নিয়ে ছিলাম। তাই যখন আমার বিচার করতে বসে কমিশনার সাহেব জিজ্ঞাসা করেন—'আচ্ছা চণ্ডী দেবী, ইংরেজ এ দেশ ছেড়ে চলে গেলে আপনি নিশ্চয়ই খুব সুখী হন?' তখন আমি সত্য কথাই বলি—'বিদেশী শাসক অধীন দেশকে মুক্তি দিয়ে চলে গেলে শুধু আমি কেন, সারা দেশের লোকই সুখী হবে।' এর পরই সাহেব প্রশ্ন তুললেন—'আচ্ছা, স্বেচ্ছায় তারা চলে না গেলে কি উপায়ে তাদের তাড়াবেন কিছু ঠিক করেছেন?' তখন আমাকেও বলতে হলো—'নেতারা সে নির্দেশ দেবেন। আমি নেতা নই, সে বিষয়ে চিন্তাও করিনি।'

প্রসন্ন মুখে গোবিন্দ বলিয়া উঠিল: তোমার ঐ কথাই তখন জোঁকের মুখে নূণ পড়ার মত সাহেবদের মুখ চূণ করে দিয়েছিল।

গম্ভীর মুখে চণ্ডী বলিল: তাই ত বলছিলাম—ওরাই কার্যসিদ্ধির জন্যে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে আমাদের মনে 'সিডিসান' জাগিয়ে দেয়; অন্তত আমি নিজের সম্বন্ধে ভাল করে জেনেই কথাটি বলছি। পাঞ্জাবে আমি দাদা-মশায়ের তত্ত্বাবধানে লালিত-পালিত হয়েছি জেনে আমাকে সাহেব যখন জালিয়ানওয়ালাবাগের কথা জিজ্ঞাসা করলেন, তার উত্তর দেবার আগেই আমার হাত দু'খানা আপনিই যুক্ত হয়ে কপালে ঠেকেছিল। তাতেই চোখ পাকিয়ে জানতে চাইলেন—'কার উদ্দেশে নমস্কার করলেন চণ্ডী দেবী? আমার চোখের দৃষ্টিও তখন স্বাভাবিক থাকবার কথা নয়, সেই দৃষ্টিতেই সাহেবের দিকে চেয়ে বললাম—'পুণ্য ভূমি জালিয়ান-ওয়ালাবাগের উদ্দেশে শ্রদ্ধা জানালাম।' তখনই পাল্টা প্রশ্ন হলো—

'পুণ্য ভূমি কিসে হলো ও স্থানটি?' উপযুক্ত উত্তর আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো—'শত শত দেশভক্ত যেখানে প্রাণ বিসর্জন করে শহীদ হয়েছিলেন—আমার দাদামশায়ও ছিলেন তাঁদের মধ্যে একজন, সে স্থানকে আমি পুণ্যভূমিই বলব।' অমনি সাহেব সাব্যস্ত করে নিয়ে বললেন—'তাহলে সেখানকার ঘটনা আপনার প্রাণে ইংরেজ জাতির বিরুদ্ধে বিদ্বেষ সৃষ্টি করেছে বলুন।' যেই উত্তর করলাম—'ইংরেজ জাতির বিরুদ্ধে নয়—তবে ঐ ধরণের নৃশংস কাজ যারা করেছিল, তাদের বিরুদ্ধে আমার প্রাণে ঘৃণা এনে দিয়েছে নিশ্চয়ই।' এর পরও নির্লজ্জের মত জিজ্ঞাসা করলেন—'সুযোগ পেলে আপনি তাদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিতে চান ত?' শোন কথা! তাই শক্ত হয়ে আমাকেও বলতে হলো—'আপনার এ প্রশ্নের উত্তর আমি দেব না।' শুনে সাহেবের মুখখানা কালো হয়ে যায়—আমি তা বেশ লক্ষ্য করেছি, এখনো সে মুখ আমার চোখের উপর ভাসছে। ওরা ভেবেছিল, এর পর ভালো করেই এক হাত নেবে—কিন্তু তার পরেই মামলা সাজাবার গলদটা যেই ধরা পড়ে গেল, বুঝলো যে গোড়াটাই ভূয়ো—মাথা খেলিয়ে তাকে শক্ত করা হয়নি, তখনই ভূতের মুখে রাম নাম সুরু হলো। কিন্তু আমি জানি—আমার কথাগুলোকে ওরা ভুলতে পারবে না, সেই সঙ্গে আমাকেও। আর, আমিও নিজের এই ঘটনা থেকেই ওদের স্বরূপটাও দেখতে পেয়েছি, সেই সঙ্গে বৃটিশ বুরোক্রেশীকেও চিনে ফেলেছি। তাই আমার চিন্তাও এখন নূতন পথে ছুটে চলেছে; তুমি ঠিক কথাই বলেছ—ঘুমন্ত বাঘ জেগে উঠে তার খাদ্য খুঁজছে।

গোবিন্দ সামনের দিকে চাহিয়া বলিল: থাক, এ সব কথা পরে হবে। এখন একটু তাড়াতাড়ি চলো।

চণ্ডী বলিল: একটু দেরীই করে ফেলেছি বটে, চল। ওরাও বোধ হয় এগিয়ে আসছে আমাদের দেরী দেখে। কিন্তু কাছে এসেই আশ্চর্য হয়ে যাবে।

গোবিন্দ বলিল : আশ্চর্য ত আজ অনেককেই করেছ—রাস্তায় নেমে।

চণ্ডী : কিন্তু রাজীব ছোকরা আশ্চর্য হবে না, খুশী হবে।

মৃদু স্বরে কথা বলিতে বলিতেই ইহারা পথ চলিতেছিল। খানিকটা যাইতেই পতাকাধারী স্বেচ্ছাসেবক দল ইহাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিল, তাহারাও দূর হইতে সম্মানীয় দম্পতিকে পদব্রজে আসিতে দেখিয়া বিস্ময়ানন্দে বলিয়া উঠিল : বন্দে মাতরম্।

রাজীব দৃঢ়তার সহিত স্বেচ্ছাসেবক ও কর্মিবৃন্দকে জানাইয়া দিয়াছে যে, কোন রকমেই যেন ভক্তির বাড়াবাড়ি কেহ্ না করে। আমরা যাঁদের সম্বর্ধনা করতে চেয়েছি, সাধারণ মানুষের মতই তাঁরা আসছেন আমাদের সঙ্গে পরিচিত হতে ; জমিদার-পুত্র বা বধূ বলে তাঁদের বাড়িয়ে জয়ধ্বনি তুললে সেটা তাঁদের পক্ষে লজ্জাব কারণ হবে।

মিছিলের প্রথমেই ছিল রাজীব। তার পিছনে বিভিন্ন বয়সের বালক ও বালিকাগণ। বালিকাদের মিছিলটি চালাইতেছিল তরলা, তার পাশেই শিবানী।

তরলাই প্রথমে সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল : এ কি অবাক কাণ্ড! আপনারা পায়ে হেঁটে আসছেন!

শিবানী বলিল : ও-মা, লোকে বলবে কি!

রাজীব শিবানীকে লক্ষ্য করিয়া বলিল : এ কথা তুমি বলবে, আমি তা ভাবতে পারিনি শিবানী, এর জন্য তোমার লজ্জিত হওয়া উচিত। লোকে কি বলবে—সে কথা ভেবে কাজ করবার দিন আর নেই—অন্ততঃ আমাদের এই গ্রামে ; এ কথা ভুলে যেও না।

চণ্ডী শিবানীকে সস্নেহে কাছে টানিয়া হাসিমুখে বলিল : তোমরা ত সেদিন আমাকে বরণ করতে গিয়েছিলে, গাড়ী চড়ে যাওনি নিশ্চয়ই। আজ তোমরা আমাকে ডেকেছ, তোমাদের মধ্যেই ; তাই আমিও তোমাদেরই একজন হয়ে চলেছি। রাজীববাবু যে আমাদের কাণ্ড

দেখে চমকে উঠবেন না, সেটা আমার জানা ছিল—এই মাত্রই সে কথা বলছিলাম।

তরলা বলিল: আমি কিন্তু এতটা আশা করতে পারিনি ভাই!

চণ্ডী বলিল: সেদিন অতক্ষণ ধরে আলাপ করেও কি আমাকে চিনতে পারেননি? এই একটু আগেই ইনি বলছিলেন—দেশকে জাগাতে নেতারা আছেন; কিন্তু দেশের মেয়েদের পানে চেয়ে তাদের ঠিক পথ দেখিয়ে দিতে লোকের বড় অভাব; এ ভার মেয়েদেরই নিতে হবে। আমি ত জেনেছি, আপনি উচ্চ-শিক্ষা পেয়েছেন; তার পর আপনি যখন এখানকার মেয়ে, আপনাকে ত আগেই কোমর বেঁধে দাঁড়াতে হবে।

তরলা মৃদু হাসিয়া বলিল: বেশ ত, আজ সভায় সেই কথাই বলবেন। আমাদের কথা কেউ নেবে না; আমরা যাতেই হাত দিতে যাই—অমনি ওপর থেকে বাধা আসে। আমাদের স্বাধীনতা কেউ সহ্য করতে পারে না বউ-রাণী! পুরুষরাও নয়; মেয়েরাও নয়। আবার এমনই অবাক কাণ্ড যে, মেয়েরাই মেয়েদের সইতে পারে না; নতুন কিছু করতে গেলেই বলবে—এ সব আধিখ্যেতা! মেয়েদের এ সব কেন?

চণ্ডী বলিল: নতুন কিছু করতে গেলেই বাধা আসে অনেক; কিন্তু সেই সব বাধা-বিপত্তি কাটাতে হবে কাজের ভিতর দিয়ে কাজ দেখিয়ে। শুধু বচনে কিছু হবে না ভাই!

কথায় কথায় তাহারা সুসজ্জিত পাঠাগারটির সম্মুখে আসিয়া পড়িল। দ্বারদেশে বহু পল্লীর বহু ব্যক্তি এবং অনেকগুলি মহিলাও উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা গোবিন্দ ও চণ্ডীকে অভ্যর্থনা করিয়া সভা-মণ্ডপে লইয়া গেলেন।

মণ্ডপে প্রবেশ করিতেই একটি মেয়ে আসিয়া চণ্ডীকে জড়াইয়া ধরিল। চণ্ডীও তাহাকে দেখিয়া সহর্ষে বলিয়া উঠিল: গৌরীদি! তুমিও এসেছ!

গৌরী বলিল: লাইব্রেরী থেকে চিঠি পেয়েছি যখন, না এসে কি থাকতে পারি!

রাজীব নিকটে আসিয়া বলিল : আমি জানতে পারি যে, গৌরী দেবী আপনার পরম বান্ধবী। শ্যামাপুরের চণ্ডী বিদ্যাপীঠের ভার আপনি এঁরই উপর অর্পণ করে নিশ্চিন্ত ছিলেন। তাই এঁকেও আসবার জন্য নিমন্ত্রণ করেছিলাম।

চণ্ডী সপ্রশংস দৃষ্টিতে রাজীবের দিকে চাহিয়া বলিল : আপনি দেখছি সত্যই চৌখস লোক, সব দিকেই আপনার সমান লক্ষ্য।

রাজীব বলিল : আপনার পিতাঠাকুরকেও আমরা আমন্ত্রণ করেছিলাম, কিন্তু কাজের ঝঞ্ঝাটে তিনি আসতে পারবেন না জানিয়েছেন। তিনি এলে আমরা অত্যন্ত আনন্দ পেতাম।

মুখখানা ঈষৎ গম্ভীর করিয়া চণ্ডী বলিল : এ সভায় তাঁর পক্ষে আসা নানা কারণে সত্যই সম্ভব নয় রাজীববাবু। তার জন্য আপনারা দুঃখ করবেন না।

চণ্ডীর বুঝিতে বিলম্ব হয় নাই, এ ক্ষেত্রে তাহার পিতার পক্ষে এই নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসা অসম্ভব—যেখানে বৈবাহিক নিলিপ্ত, এমন কি কন্যা-জামাতাও। কিন্তু তাঁহার কন্যা-জামাতার সম্বর্ধনা উৎসবে বৈবাহিক বা কন্যা-জামাতার পক্ষ হইতে নিমন্ত্রণ করাও ত শোভন নহে।

সম্বর্ধনা-সভায় বিশিষ্ট আসনে গোবিন্দনারায়ণকে বসাইয়া মহিলাদের জন্য সুনির্দিষ্ট স্থানে স্বতন্ত্র ভাবে রক্ষিত আসনে চণ্ডীকে বসান হইল। চণ্ডীই এ সম্বন্ধে এরূপ নির্দেশ দিয়াছিল রাজীবকে। সে জানাইয়াছিল যে, আমন্ত্রিত মহিলাদিগকে সভায় আহ্বান করিয়া তাঁহাদের জন্য নির্দিষ্ট স্বতন্ত্র স্থানে বসানো হইবে; কিন্তু সভা-স্থলে মেয়েদের সামনে চিকের পরদা ফেলিবার যে গতানুগতিক প্রথা চলিয়া আসিতেছে, তাহা তুলিয়া দিতে হইবে। এ অবস্থায় চণ্ডী এবং প্রগতিবাদিনী তরুণীরাই পুরোভাগে আসন গ্রহণ করিয়া পশ্চাদ্বর্তিনীদের লজ্জা নিবারণ করিবে। গৌরীও

তরলাকে দুই পার্শ্বে বসাইয়া চণ্ডী তাহাদের মধ্যেই বিশিষ্ট আসন গ্রহণ করিল।

গৌরীকে পাইয়া চণ্ডীর আর আনন্দের সীমা নাই। কুমারী-জীবনে পাঞ্জাব হইতে শ্যামাপুরে আসিয়া এই মেয়েটির সাহচর্য চণ্ডীকে অনেকটা আশ্বস্ত করিয়াছিল। শ্যামাপুরেই গৌরীর পিত্রালয়। তাহার পিতা রামধন ভট্টাচার্য পোষ্ট অফিসে চাকরী করিতেন, বর্তমানে পেনসনভোগী। এক শিক্ষাব্রতীর হাতে কন্যাকে তুলিয়া দিয়াছিলেন তিনি। স্বামি-প্রেমে কন্যা সুখী হইয়াছিল এবং স্বামী-সাহচর্যে শিক্ষার পথেও অনেকটা অগ্রবর্তিনী হইতে পারিয়াছিল। বিবাহের কয়েক বৎসর পরে স্বামী বিসূচিকায় আক্রান্ত হইয়া অকালে মৃত্যুবরণ করেন। স্বামীহারা হইয়াও গৌরী তাহার সুদৃঢ় প্রকৃতির উপর আস্থা রাখিয়া স্বামীর পরিজনদের সংসর্গেই বৈধব্যজীবনের কর্তব্য পালনে সচেষ্ট ছিল। কিন্তু কোপণ-স্বভাব শ্বশুর, রূঢ়ভাষিণী শাশুড়ী ও অশিষ্ট দেবরদের উৎপীড়নে তাহার সে আশা ব্যর্থ হয়। অগত্যা পিতা রামধন ভট্টাচার্য তাহাকে নিজের কাছে লইয়া আসেন। এই সময় চণ্ডীও পাঞ্জাব হইতে শ্যামাপুরে আসিয়া তাহার বলিষ্ঠ ও দুর্বিনীত ব্যবহারে সারা পল্লীকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছে। চণ্ডীর সহিত গৌরীর কিন্তু ভাব হইয়া যায়—আলাপ-পরিচয়ের পর চণ্ডীকে পাইয়া গৌরী যেন তাহার অভিশপ্ত জীবনযাত্রার একটা স্বপ্ননির্দেশ পায়। দুই বান্ধবী মিলিয়া চিন্তা করিতে থাকে—কেমন করিয়া গ্রামে সত্যকার শিক্ষার আলোকপাত এবং তাহাকে তাহাদের জীবনের আদর্শ করিয়া তুলিবে। এমনই সময় মিশনারী বিদ্যালয়ে সেই অপ্রীতিকর পরিস্থিতির উদ্ভব হয় এবং বাগুলীর জমিদার-ভবনে তাহার বিবাহ-সম্বন্ধ পাকা হইয়া যায়। সেই সূত্রে দুই বান্ধবীর শিক্ষালয় স্থাপনের স্বপ্নটিও বাস্তব হইয়া উঠে। বিপুল ব্যয়ে যে 'বিদ্যা-মন্দির স্থাপিত হয়, বিবাহের পরদিন শ্বশুরালয়ে যাইবার প্রাক্কালে তাহার দ্বারোদ্ঘাটন করিয়া চণ্ডী বান্ধবী গৌরী দেবীর উপর

তাহার পরিচালনার ভার দিয়া নিশ্চিন্ত থাকে। সেই গৌরীকে অপ্রত্যাশিত ভাবে তাহাদেরই সম্বর্ধনা-সভায় উপস্থিত দেখিয়া চণ্ডী আনন্দে অভিভূত হইয়া পড়িবে ইহা স্বাভাবিক।

পাঠাগারের প্রাঙ্গণে সুবৃহৎ মণ্ডপ বাঁধিয়া সভাধিবেশনের ব্যবস্থা হইয়াছে। জন-সমাগমে সমস্ত মণ্ডপটি ভরিয়া গিয়াছে। সভারম্ভের পূর্বে উদ্বোধন সঙ্গীতের ব্যবস্থা হইতেছে, সেই অবসরে গৌরী দেবী চণ্ডীর দিকে ঈষৎ হেলিয়া আস্তে আস্তে বলিল: এই সময় একটা কথা বলে তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি শোন—মিশনারী ইস্কুলের সেই খৃষ্ট-কুমারীর দাদা আই সি এস হয়ে দেশে ফিরে এসেছেন। তিনিই এখন আমাদের মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট। স্কুল উঠে যাওয়ার পর খৃষ্ট-কুমারী ভাইয়ের আশ্রয়েই গিয়ে উঠেছে। তোমার কথা সে ভোলেনি। তাই বলছি ভাই, সভায় বুঝে-সুঝে কথা বলবে। জান ত, দুরাত্মার ছলের অভাব হয় না।

কথাগুলি শুনিতে শুনিতে চণ্ডীর মুখখানা দৃপ্ত হইয়া উঠিল।

আট

উদ্বোধন সঙ্গীতের পর স্থানীয় বিদ্যালয়ের বর্ষীয়ান পণ্ডিত শ্রীহৃষীকেশ শাস্ত্রী মহাশয়ের পৌরোহিত্যে সভার কার্যারম্ভ হইল। গানটির রচনা যেমন মার্জিত ও বাহুল্যবর্জিত, ভাষা বলিষ্ঠ ও সুললিত, সুর-সংযোজনা এবং সম্মিলিত কণ্ঠের দ্যোতনাও তেমনি মর্মস্পর্শী। যাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া গানটি রচিত হইয়াছে, প্রতিভার সাধারণ প্রশস্তি ব্যতীত, তাঁহাদের ব্যক্তিত্বকে অনন্যসাধারণ করিয়া লজ্জা দিবার বাড়াবাড়ি নাই। সভার উদ্যোক্তাদিগকে চণ্ডী পূর্বেই নির্দেশ দিয়াছিল—'আমাদের সম্বর্ধনা করছেন বলে এমন করে যেন বাড়াবেন না, যাতে লজ্জা পেয়ে সভা ছেড়ে

পালিয়ে আস্‌তে হয়। এমন ভাবে আমাদের সম্বন্ধে আলোচনা করবেন, আমরা সভায় বসে ধৈর্য ধরে স্থির হয়ে শুনতে পারি। মনে রাখবেন যে, অসাধ্য কাজ আমি কিছু করিনি, আর সাধারণ মানুষ ছাড়া আমি আর কিছু নই।' সভাপতির আসন হইতে শাস্ত্রী মহাশয় পাঠাগারের সম্পাদক রাজীব রায়ের বিশিষ্ট পরিচয়ের সহিত তাহার দেশাত্মবোধ ও কর্মকুশলতার উল্লেখ করিয়া তাহাকেই সভার উদ্বোধন করিতে অনুরোধ জানাইলেন।

রাজীব প্রাঞ্জল ভাষায় গোবিন্দ ও চণ্ডীর আনুপূর্বিক কাহিনী গল্পের মত মনোরম অথচ বাহুল্য-বর্জিত ভাবে লিখিয়া আনিয়াছিল; প্রায় একটি ঘণ্টা ধরিয়া সেই বাস্তব উপাখ্যান উদাত্ত কণ্ঠে পাঠ করিয়া সে সভায় সমবেত বিভিন্ন শ্রেণীর শ্রোতাদিগকে প্রচুর আনন্দ দিল। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সহর্ষে এমন এক অপূর্ব গল্প এই প্রথম শুনিয়া ধন্য হইল—যে গল্পের নায়ক-নায়িকা সভাস্থলেই তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত!

রাজীবের পড়া শেষ হইলে বহুক্ষণ ধরিয়া উল্লসিত জনতার করতালি ও কণ্ঠধ্বনি জনপূর্ণ সভামণ্ডপ মুখরিত করিয়া রাখিল।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় স্বহস্তে গোবিন্দনারায়ণকে পুষ্পমাল্যে ভূষিত করিয়া বলিলেন: যাঁর বিচিত্র কাহিনী আপনারা এইমাত্র অবাক্‌-বিস্ময়ে শুনলেন, বিদ্যাশিক্ষার বয়স অতিক্রম করেও যিনি জড়ভাবাপন্ন ছিলেন—যাঁর মূর্খতার পরিচয় পেয়ে হেসেছেন, আবার বাসর-ঘরে বসেই যিনি কালিদাসের গল্প শুনে পণ্ডিত হবার জন্য উৎসাহে বুক বেঁধেছিলেন, বিবাহের পর ফুলশয্যার শুভরাত্রি থেকে যিনি বিদ্যা-সাধনা শুরু করে সুম্বৎসরের মধ্যে সিদ্ধিলাভে সমর্থ হন—ইনিই সেই অদ্ভুত সাধক—আপনাদের সামনে। আপনারা এখন এঁকে দেখে এবং এঁর মুখের বাণী শুনে চক্ষুকর্ণের বিবাদভঞ্জন করুন।

সভাস্থ সকলেই পুনরায় করতালি দিয়া গোবিন্দনারায়ণকে সম্বর্ধনা

জ্ঞাপন করিল। জনপূর্ণ সভায় ইহার পূর্বে আর কোন দিন গোবিন্দকে এ ভাবে জনসাধারণের দ্রষ্টব্যরূপে দাঁড়াইতে হয় নাই। কিন্তু সভায় সর্বসমক্ষে কোন কিছু পড়িবার বা বলিবার সময় কি ভাবে চিত্ত স্থির রাখিতে হয়, মানসিক উত্তেজনাকে দমন করিয়া সংকোচ কাটাইয়া ইন্দ্রিয়গুলিকে আয়ত্ত করা প্রয়োজন—গোবিন্দকে তাহাও শিখিতে হইয়াছে। নতুবা বিদেশী শাসকদের সহিত সেদিন সে অকম্পিত কণ্ঠে নির্ভীক ভাবে কথোপকথন করিতে পারিত না।

সভাপতি, সমবেত মহিলা ও সুধীবৃন্দকে যথারীতি সম্বোধন করিয়া গোবিন্দ তাহার লিখিত অভিভাষণ পাঠ করিবার পূর্বে সংক্ষেপে যে কথাগুলি বলিল, তাহার প্রতিটি ভাবময়, শিক্ষণীয় ও প্রত্যেকের অন্তরস্পর্শী। সে গাঢ় স্বরে বলিল: আমার কথা আগেই রাজীববাবু আপনাদের শুনিয়েছেন। আমি আশ্চর্য হয়ে ভাবছি, তিনি কি করে এমন নিখুঁত ভাবে আমার জীবনের অন্ধকার দিক্‌টা আপনাদের চোখের আলোকে ফুটিয়ে তুললেন! তিনি যে বাড়িয়ে কিছু বলেননি, এ কথা আপনারা হয়ত আমার চেয়েও বেশী জানেন। তার কারণ, তখনকার কথা আমার নিজেরই সব মনে পড়ে না—আমি ছিলাম চিহ্নিত এক গণ্ডমূর্খ, আমার নামের আগে গোবর-গণেশ, জড়-ভরত, গবা-পাগলা—এমনি কত বিশেষণই ছিল। কিন্তু একটা কথা আমার বেশ মনে পড়ে—লেখা-পড়া শিখবার একটা আগ্রহ আমার সেই গোবর-ভরা মাথা আর বুদ্ধি-ছাড়া মনের মধ্যেওচাপা ছিল; তাই বিয়ের রাতে কনে-বউয়ের কাছে প্রচুর উৎসাহ পেয়েই আমি বড় আপনার ভেবে বলে ফেলেছিলাম সে কথা—'তাহলে তোমাকে বলি—আমার ভারি ইচ্ছে করত পড়তে!' তিনিও বুঝি আমার মনের ইচ্ছাটি বুঝেই আমাকে সেই বাসর-ঘরেই বিদ্যাবতী রাজকন্যা আর মূর্খ কালিদাসের গল্পটি শুনিয়ে জিজ্ঞাসা করেন—'তোমার ঐ রকম হতে ইচ্ছা হয়, না?' বেশ মনে পড়ে—আমার মন তখন আহ্লাদে ভরে গেছে,

আমি উৎফুল্ল হয়ে বলে উঠি—'হ্যাঁ, হয়; কেউ যদি আমাকে শেখায়, পড়াবার ভার নেয়, সত্যি—আমিও তা হলে মানুষ হতে পারি।' উনিও সে কথা শুনে বললেন—'মানুষ তোমাকে হতেই হবে। আমি তোমাকে সাহায্য করব; তুমি মনে বিশ্বাস রাখো—তুমিও কালিদাসের মত পণ্ডিত হবে।' একটা প্রবচন আছে আপনারা জানেন—'বিশ্বাসে মিলায় বস্তু, তর্কে বহু দূর'। গোবর-ভরা মাথা আর বুদ্ধি-ছাড়া মন ছিল বলেই হয়ত তর্ক তুলিনি—বিশ্বাস করেছিলাম ওঁর কথা; তাই বস্তু পেয়েছি; আর আপনারাও দেখছেন, সেই অমানুষ সত্যই মানুষ হয়েছে। এখন মানুষ হয়ে আমি যা জেনেছি, সেটা আপনাদের সকলকে জানানো আমার কর্তব্য মনে করছি। সেই কথাগুলিই এই সভায় বলছি।

এর পরের বক্তব্য কথাগুলি গোবিন্দ লিখিয়াছিল; এখন তাহা পাঠ করিতে লাগিল। তাহার লিখিত অভিভাষণের মর্ম এইরূপঃ আমার বিবাহের পর সহধর্মিণীর সাহায্যেই আমি যে শিক্ষালাভে সমর্থ হয়েছি, এ সত্য আজ আর অজ্ঞাত নেই; সকলেই এ কথা শুনেছেন, আর এই রহস্যময় ব্যাপারটি স্বকর্ণে শোনবার জন্যেই যে কৌতূহলী হয়ে এ সভায় এসেছেন, একথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু সত্য কথা বলতে কি, এটা বিশেষ কিছু আশ্চর্যের বিষয় নয়। কেন, সেই কথাই আমি সভায় সবার সামনে বলছি। আপনারা সকলেই স্বীকার করবেন যে, মানুষ যদিও নিজের পায়েই ভর দিয়ে দাঁড়ায়, কিন্তু তার জন্যে তাকে অন্যের সাহায্য নিতে হয়। তবে অন্যের সাহায্যটুকু যতখানি তাকে নিতে হয়, ততখানিই আবার ভবিষ্যতের বন্ধন-স্বরূপ হয়ে পড়ে। এই জন্যেই এমন লোকের সাহায্য নেওয়া উচিত, যার সঙ্গে আত্মিক সম্বন্ধ আগে থেকেই আছে—আর উভয়ের মধ্যে পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে এমন একটা বন্ধনের গিট পড়েছে যা খুলে যায় না, আর যেখানে সাহায্য চাইবার প্রশ্নই ওঠে না—পরস্পরই পরস্পরকে সাহায্য করতে বাধ্য। এটি সহজসাধ্য করবার জন্য সমাজে

বিবাহরূপ বন্ধন পরিয়ে পুরুষের সঙ্গে নারীকে সংযুক্ত করা হয়েছে। ফলে, বিবাহিত স্বামী ও স্ত্রী হয়েছেন দম্পতি। বিবাহের পর আর পুরুষ বা নারীর স্বতন্ত্র সত্তা নেই, এখন থেকেই স্বামি-স্ত্রীর শিক্ষা ও সাধনা—আত্মোপলব্ধির সাধনা ; আপনাকে জানা ও পাওয়ার তপস্যা একই ভাবে উভয়কে করতে হবে—নিজেদের মনের মধ্যে মহাশক্তিকে জাগাবার জন্য কঠোর সাধনায় আত্মনিয়োগ করবে স্বামি-স্ত্রী সমান ভাবেই। বাইরে অবশ্য তাঁদের জীবনভঙ্গি—পরস্পরের আকৃতিগত ভেদের মত—স্বতন্ত্র বা প্রভেদ থাকবে, কিন্তু অন্তরে উভয়েই একাত্ম—সেখানে কোন পার্থক্য নেই। তাই, স্ত্রী স্বামীর শক্তি, অর্ধাঙ্গিনী, সহধর্মিণী। স্ত্রী স্বামীকে সাহায্য করবে ব্যবহারিক জগতে তার অধ্যাত্ম সাধনায়। পত্নীর শিক্ষা-দীক্ষা-সাধনা সবই স্বামীর জন্য। পত্নী স্বামীকে নিত্য স্মরণ করিয়ে দেবে—'সাধনার পথে তুমি একা নও, আমিও তোমার সঙ্গে আছি—আমি তোমার চিরসঙ্গিনী।' স্বামীর প্রতি স্ত্রীর এই দিব্য অনুরাগই স্বামীকে সাফল্যের পথে, সিদ্ধির পথে এগিয়ে নিয়ে যায়। এই ভাবে শুধু স্বামীর দিকেই লক্ষ্য নিবদ্ধ রাখাই হচ্ছে স্ত্রীর ধর্ম। নারী ত পুরুষের জন্যই, আর পতির ধর্মই ত নারীর ধর্ম। পতির অন্তরের সব-কিছু দৈন্য দূর করে স্ত্রী যদি নিজের সঞ্চিত বিভূতি দিয়ে তাকে পূর্ণ করতে পারে, সে কি তার পক্ষে সামান্য গৌরবের কথা? এর ফলে শুধু স্ত্রীর নয়—স্বামি-স্ত্রী দু'জনের জীবনই ধন্য হবে। অন্য দিকে স্বামীরও কর্তব্য হচ্ছে স্ত্রীকে অনুগ্রহপ্রার্থিনী দাসীরূপে না দেখে জীবনের সুযোগ্য সঙ্গিনীরূপে শ্রদ্ধা করতে শেখা—নিজের সঞ্চয় দিয়ে স্ত্রীর দৈন্য দূর করে তার জীবনকেও পূর্ণ করে তোলা। স্বামীকেও এখানে বলতে হবে—'ভয় কি, তুমি যে আমার অর্ধাঙ্গিণী, সহধর্মিনী ; আমার মতন করে তোমাকে তৈরী করে নেওয়াই যে আমার ধর্ম।' আর স্ত্রীরও উচিত হচ্ছে—নিজের শিক্ষা-দীক্ষার দৈন্য ঘুচিয়ে তাকে শিখিয়ে পড়িয়ে নেবার জন্য স্বামীকে

বলা ; এবং তা বলবার অধিকারও স্ত্রীর আছে। এখন কথা হচ্ছে, স্বামী ও স্ত্রী উভয়েই যদি অশিক্ষিতা হন, আর দু'জনেই যদি বিদ্যাশিক্ষা করে আমার মতন মূর্খ নামটা খণ্ডন করতে চান, তাহ'লে এমন এক জন দরদী শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রীর সাহায্য আবশ্যক—দু'জনেই একসঙ্গে বসে যাঁর কাছে শিক্ষা নিতে পারেন। আমাদের সমাজে এমন দম্পতি আছেন—স্বামী বা স্ত্রীর মধ্যে এক জনও লেখা-পড়া শেখেননি, কিম্বা কেউ হয়ত যেটুকু শিক্ষা পেয়েছেন তা এত সামান্য যে, তার উপর নির্ভর করে শিক্ষা দেওয়া চলে না। এখানে বাইরের সাহায্য নিতেই হবে। এমনি যাঁদের অবস্থা—শিক্ষার সঙ্গে কোন পরিচয়ই নেই, কিংবা সামান্য কিছু শিক্ষা পেয়েছেন—তাঁদের সকলকে আমি বলছি, শিক্ষালাভ করে জীবনকে ধন্য করুন। নিজে ভুক্তভোগী বলেই আমি অন্তরের সঙ্গে এই অনুরোধ করতে পারছি। মনে করুন, শৈশব থেকে এমন একটা ঘরে আপনাকে রাখা হয়েছে, যার ছোট ছোট জানালা দিয়ে অল্প সল্প আলো-বাতাস এসে কোন রকমে আপনার জীবনটাকে বাঁচিয়ে রেখেছে। সেই ঘরেই ঐ ভাবে জীবন রক্ষার যা-কিছু ব্যবস্থা সেটা বজায় রাখা আছে মাত্র—কিন্তু বাইরের সঙ্গে কোন পরিচয়ই আপনার নেই। দীর্ঘকাল পরে হঠাৎ হয়ত আপনি ঐ ঘর থেকে মুক্তি পেলেন—এসে দাঁড়ালেন অজস্র আলো-বাতাস-ভরা সৌন্দর্যময় পৃথিবীর বুকে। তখন দুই চোখ আপনার আনন্দে ভরে গেল, মনে জাগতে লাগল কত উচ্চ আশা—মানুষের মতন মানুষ হয়ে বাঁচবার আকাঙ্ক্ষা। শিক্ষা-জীবনও ঠিক এমনি আনন্দময়। শিক্ষার আলো চোখে পড়লে তখন মনে হবে—কি বিশ্রী এক কদর্য জগতে এত কাল ছিলেন, সেখান থেকে বেরিয়ে এসে এ কি এক অপরূপ সুন্দর স্থানে এলেন—যেখানে শোভা ও সৌন্দর্যের শেষ নেই, কখনো দেখেননি, ভাবেননি, কোন দিন, কল্পনা করেননি এমন সব দেখবার বস্তু চার দিকে ছড়িয়ে রয়েছে—খাওয়া-পরা খেলা-ধুলা আরাম-নিদ্রা সবই ভুলিয়ে দেয়।

নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই আমি বলছি—শিক্ষার আলো যখন আমার চোখে পড়ল, মনে হলো যেন আমাকে একটা অন্ধকার গহ্বর থেকে তুলে এনে এমন এক সাজানো রাজ্যের রাজ-সভায় বসিয়ে দিলে, আমার কাছে যা অপূর্ব! আমার মন ভরে গেলো, বুকখানা আনন্দে উৎসাহে ফুলে উঠলো, আমি একেবারে বদলে গেলাম। সত্যিই, এত আনন্দ আমি জীবনে কোন দিন পাইনি! এ আনন্দ একা ভোগ করে আমি তৃপ্তি পাচ্ছি না; আমি বিলিয়ে দিতে চাই—বহুদিন ধরে মারা অন্ধকারে পড়ে আছে তাদের মধ্যে। তাই তাদের লক্ষ্য করে আমি বলছি—আমার পানে চেয়ে দেখ; ছিলাম আগে মূর্খ, অমানুষ; লেখা-পড়া শিক্ষা করে এখন হয়েছি মানুষ। দেশের অমানুষরাও আমার মত বিদ্যালাভ করে মানুষ হোক। এর বেশী আজকের সভায় আমার আর কিছু বলবার নেই। বন্দে মাতরম্!

মন্ত্রমুগ্ধের মত স্তব্ধ ভাবে সমবেত শ্রোতৃবর্গ গোবিন্দের অভিভাষণ শুনিতেছিলেন। পাঠ সমাপ্ত হইলে করতালির শব্দে সমস্ত মণ্ডপ প্রতিধ্বনিত হইল—স্বেচ্ছাসেবকগণ এবং সভায় সমবেত তরুণদল 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি তুলিয়া বক্তাকে অভিনন্দিত করিল।

সভাপতি মহাশয় এইবার উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে শ্রীমতী চণ্ডী দেবী বিদ্যা-ভারতীর নাম উচ্চারণ করিতেই তরলা অগ্রবর্তিনী হইয়া তাহার গলায় মালা পরাইয়া দিল। শাস্ত্রী মহাশয়ও সঙ্গে সঙ্গে বলিলেন: পুরাণ ইতিহাস থেকে আমরা এমন কতকগুলি কন্যা ও বধূর কাহিনী শুনেছি, পুরুষানুক্রমে আমাদের কাছে যাঁরা নমস্য হয়ে আছেন। তাঁদের কুলের কোন চিহ্নই আজ নেই, কিন্তু তাঁদের নাম কালজয়ী হয়ে আজও আমাদের মনে প্রেরণা যোগাচ্ছে। রাণী ভবানী, ভবশংকরী, সতী বেহুলা, কবি চন্দ্রাবতী, রাণী রাসমণি,—এঁরাও ছিলেন এই বাঙলা দেশের মেয়ে। কেউ দেশের জন্যে, কেউ বা স্বামীর জন্যে, কেউ বিদ্যা ও সংস্কৃতির জন্যে অসাধ্য সাধন

করে আমাদের দেশকে—সেই সঙ্গে বাঙালী জাতটাকেও ধন্য করে গেছেন; তাঁদের প্রতিষ্ঠা-দিনেও তখনকার লোকেরা হয়ত কত সাধুবাদই তাঁদের উদ্দেশে দিয়েছিলেন। আজ আমাদের পরম সৌভাগ্য এই যে, আমাদের জন্মভূমি—এই গণ্ডগ্রামখানিও আমাদের চোখের উপর এক অসামান্য প্রতিভাময়ী কুলবধূর সংস্পর্শে ধন্য ও চিরস্মরণীয় হতে চলেছে। তাঁর অপূর্ব কাহিনী এই পাঠাগারের তরুণ সম্পাদক তাঁর বলিষ্ঠ ভাষায় পূর্বেই বিবৃত করেছেন। সত্যই এ এক অপরূপ আখ্যান। এই শিক্ষিতা রূপ-গুণান্বিতা নারী ঘটনাচক্রে তাঁর পক্ষে একান্ত অনুপযুক্ত ও অবাঞ্ছিত স্বামীর সহধর্মিণী হয়েও আত্মশক্তির প্রতি আস্থা হারাননি। সাধারণ নারীর পক্ষে এক্ষেত্রে হতাশ হয়ে অদৃষ্টের উপর নির্ভর করা ছাড়া উপায়ান্তর ছিল না; হয়ত অপদার্থ স্বামীর প্রতি বিতৃষ্ণায় তাঁর পক্ষে নিষিদ্ধ পন্থাবলম্বনও সম্ভব হতে পারত। কিন্তু ইনি শুভদৃষ্টির সঙ্গেই অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে স্বামীর শাশ্বত রূপ দেখেছিলেন। আর সকলে যে বস্তুটীকে মরচে-পড়া এক-খণ্ড লোহা ভেবে উপেক্ষা করেছিল, ইনি জেনেছিলেন—আসলে সেটি ইস্পাত, ময়লা জমে বিশ্রী হয়ে আছে। সার্থক এঁদের দৃষ্টি—কি শুভক্ষণেই দু'জনের শুভদৃষ্টি হয়েছিল—দুজ'নেই পরস্পরকে চিনেছিলেন। তাই বাসর ঘরেই এঁরা স্থির করে ফেলেছিলেন দাম্পত্য-জীবনের ভবিষ্যৎ পন্থা। এঁদের সে পথ যে নিরঙ্কুশ হয়ে এক বিরাট আদর্শ সৃষ্টি করেছে, আমরা সবাই সে পরিচয় পেয়েছি। সুখের কথা, এই পল্লীর মেয়েরা আমাদের আগেই আনন্দে অভিভূত হয়ে তাঁদের কর্তব্য পালন করেছেন—তাঁরা নতুন করে বরণ-ডালা সাজিয়ে চণ্ডী দেবীকে বরণ করে বিদ্যা-ভারতী উপাধি দিয়েছেন। এতে এই অঞ্চলের মুখ এঁরা উজ্জ্বল করেছেন। দরদ দিয়ে যে উপাধি এঁরা চণ্ডী দেবীকে দিয়েছেন, যে কোন টোল বা সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের দেওয়া উপাধির চেয়ে তার মর্যাদা বেশী। স্বদেশী যুগে দেশবাসী দানবীর সুবোধ মল্লিককে রাজা উপাধি দিয়েছিলেন—যে কোন

রাজ্যের রাজার তুলনায় রাজা সুবোধ মল্লিক ছিলেন শ্রেষ্ঠতম মর্যাদাশালী। তেমনি 'বাশুলীর বিদ্যা-ভারতী' জাতির ইতিহাসে শিক্ষা ও সংস্কৃতির অধ্যায়ে অমর হয়ে থাকবেন। এখন ওঁরই শ্রীমুখ থেকে আমরা নতুন কথা শুনে জ্ঞান সঞ্চয়ের প্রত্যাশী।

প্রবীণ সভাপতির কালোপযোগী কথাগুলি শুনিয়া সকলেই সহর্ষে করতালি দ্বারা সভামণ্ডপ মুখরিত করিয়া তুলিল। সেই সময় চণ্ডী ধীরে ধীরে আসন ত্যাগ করিয়া তাহার জন্য নির্দিষ্ট সন্নিহিত মঞ্চে উঠিবা মাত্র সমগ্র মণ্ডপ মথিত করিয়া যে বিপুল আনন্দ-রোল উঠিল তাহা অবর্ণনীয়। অবস্থা দেখিয়া চণ্ডী মঞ্চ হইতেই যুক্তকরে এমন বিশিষ্ট ভঙ্গিতে জনতাকে নীরব হইতে আবেদন জানাইল যে, পলক মধ্যে জনপূর্ণ মণ্ডপ নিস্তব্ধ হইয়া গেল। শ্রদ্ধেয় সভাপতি ও অন্যান্য শ্রদ্ধাভাজনদের প্রতি সর্বাগ্রে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়া চণ্ডী তাহার অভিভাষণ সুস্পষ্ট স্বরে মুখেই বলিতে লাগিল।

কথায় জড়তা নাই, কোন রকম সঙ্কোচ নাই। বক্তৃতায় বাহ্যাড়ম্বর বা বাক্যের বাড়াবাড়ি না করিয়া শিক্ষা সম্বন্ধে এমন সহজ ভাবে মেয়েদের করণীয় বিষয়গুলি বলিয়া গেল যে, প্রতি কথাটি যেন মনের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে—তাহার কোনটি ভুলিবার নয়। ভূমিকায় শুধু স্বল্প কথায় তাহার সম্বন্ধে উচ্চ প্রশস্তির প্রতিবাদ ছাড়া আর কোন বাজে কথা শোনা গেল না। পরক্ষণেই কথার মোড় ফিরাইয়া সে বলিতে আরম্ভ [illegible]লঃ শ্বশুর-বাড়ী এসে আমাকে যা-যা করতে হয়েছে, সে কথা আ[illegible]রা সকলেই জেনেছেন। তার জন্যে আমাকে বাড়াবার বা সুখ্যাতি[illegible]বার বিশেষ কিছু নেই। আমি মনে করি—আমার মতন অবস্থায় পড়লে প্রত্যেক মেয়েরই উচিত আমারই মতন ঐ সব কাজ করা। কিন্তু সেটা কি করে সম্ভব হোতে পারে, সেই কথাই এখন আমারও বলা উচিত। আমি যে এতখানি সহস পেয়েছি, সাহেবদের সামনে

দাঁড়িয়ে জবাবদিহি করতে পেরেছি—তার গোড়ায় রয়েছে শিক্ষা, শুধু আমার শিক্ষা। এই শিক্ষাই আমার মনের সাহস বাড়িয়ে দিয়েছে, জড়তা আড়ষ্টতা সঙ্কোচভাব ভেঙে দিয়ে আমাকে সপ্রতিভ ও আত্ম-নির্ভরশীল করে তুলেছে। শিক্ষার ফলেই আমি জেনেছি—অন্যায়ের বিরুদ্ধে একবার যদি মাথা তুলে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারি, অন্যায় যারা করে—তাদের মাথা আপনি নুইয়ে পড়বে। আমাদের সমাজের গৃহস্থ ঘরে বেশীর ভাগ মেয়েই লিখতে-পড়তে জানেন না বলেই, নানা রকম কুসংস্কার তাঁদের শিক্ষাহীন মনকে যেন আঁকড়ে ধরে থাকে; এই জন্যেই তাঁরা জীবনের সব ক্ষেত্রেই একেবারে অসহায়। সাহস করে কোন কাজে হাত দিতে পারেন না, মুখ খুলে জোর-গলায় কথা বলতে বাধে, অন্যায় করছে জেনেও অন্যায়কারীর বিরুদ্ধে মাথা তুলে প্রতিবাদ করতে ভয় পান। মেয়েদের এই দুর্দশার প্রতিকারের জন্য চাই শিক্ষা, আরো শিক্ষা।

অর্থাৎ, যাঁরা সামান্য লেখা-পড়া জানেন অথচ তাঁদের সেই অল্প বিদ্যার কোন শুভ ফল দেখতে পান না—তাঁরাও যাতে আরো শিক্ষা পান, ভাল করে শিক্ষা পান, তার ব্যবস্থা করা চাই। প্রথমে নিজেদের গ্রামে-গ্রামে ঘরে-ঘরে এই শিক্ষার আলো জ্বেলে নিরক্ষরতা ও অশিক্ষার অন্ধকার দূর করতে হবে। তার পরে ক্রমে ক্রমে সেই আলো ছড়িয়ে পড়বে গ্রামের পর গ্রামে, মৌজায়, পরগণায়, মহকুমায়, জেলায়—সারা প্রদেশে।

এই সময় তরলা তার আসন হইতে উঠিয়া সবিনয়ে বলিল: সভাপতি মহাশয়ের অনুমতি নিয়ে মেয়েদের পক্ষ থেকে আমি বিদ্যাবতীকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই; যদি তিনি অন্য কিছু মনে না করে—

চণ্ডী স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে তরলার দিকে চাহিয়া প্রসন্ন ভাবেই উত্তর করিল:

এতে মনে করবার ত কিছু নেই। আমার কথাগুলি শুনতে শুনতে যেখানেই মনে প্রশ্ন উঠবে, তখনি জিজ্ঞাসা করবেন বৈ কি! এটা আপনারা কেউ মনে করবেন না যে, কতকগুলি বাঁধা বুলি বলেই আমার কর্তব্য শেষ করব। আমি যা বলেছি, আর এর পর বলবো, সেগুলো যাতে কার্যকরী হয়—তার উপায়ও আমাকে করতে হবে। কাজেই, আমি শ্রদ্ধেয় সভাপতি মহাশয়কে অনুরোধ করছি, আমার কথায় যাঁরই মনে কোন সন্দেহ জাগবে, সে সম্বন্ধে তাঁকেই যেন জিজ্ঞাসার অধিকার দেওয়া হয়।

সভাপতি মহাশয় চণ্ডীর এই উক্তি অনুমোদন করিয়া তরলাকে তাহার প্রশ্ন তুলিবার নির্দেশ দিলেন। তরলা তখন প্রশ্ন করিল: গ্রামের ঘরে-ঘরে শিক্ষা প্রচারের যে ব্যবস্থার কথা বিদ্যা-ভারতী বললেন, এ তাঁরই পক্ষে সম্ভব। এর পূর্বে এমন ভাবে আর কেউ এ রকম নির্দেশ দিয়েছেন বলে মনে পড়ে না। এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে—এই শিক্ষা কি কেবল পুঁথিগতই হবে—যে ভাবে স্কুল-কলেজে কতকগুলো বইয়ের মাধ্যমে শিক্ষা নেবার ব্যবস্থা আছে?

মৃদু হাসিয়া চণ্ডী উত্তর করিল: আমি এ পর্যন্ত শিক্ষা দেবার কথাই বলেছি; কিন্তু কি ভাবে শিক্ষা দেওয়া হবে, সে তার পরের কথা। আপনার প্রশ্ন অধিকন্তু হলেও আমি এই ভেবে খুশী হচ্ছি যে, আপনারা সাগ্রহেই [illegible]মার কথাগুলি শুনছেন। এখন আপনার প্রশ্নেই আসা যাক। [illegible] যে শিক্ষার কথা বলেছি, নিশ্চয়ই সে শুধু পুঁথিগত বিদ্যাভ্যাস [illegible]র না; তার লক্ষ্য হবে—মেয়েরা যাতে গৃহ-সংসারে শান্তিময়ী [illegible] আদর্শ গৃহিণী, স্বামীর সহধর্মিণী ও সন্তানের জননী হতে পারেন, সে[illegible]বে তাঁদের গড়ে তোলা। এখনকার স্কুল-কলেজের শিক্ষার মত সে শিক্ষা কখনই ব্যয়বহুল ও কৃত্রিম হবে না, আর কেবল মাত্র কতকগুলো বইয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না। শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে

জ্ঞান আহরণ করা। জ্ঞানহীন জীবন মৃত্যুর মতই স্থির। আমরা এই জ্ঞান ও শিক্ষার সঙ্গে শরীর ও মনের পরিপূর্ণ বিকাশ চাই। আমাদের শিক্ষার কিছুই অকেজো, অবাস্তব বা বাজে হবে না—স্কুল-কলেজের মতন শিক্ষার ভারে দেহ ভেঙে পড়বে না, প্রাণ-রস শুকিয়ে যাবে না। আমাদের শিক্ষার ধারা হবে একেবারে আলাদা; এর মধ্যে বাহ্যাড়ম্বর থাকবে না সত্য, কিন্তু আমাদের নিজস্ব ভাবের সঙ্গে—আমাদের বাস্তব জীবনের সঙ্গে তার এমন সংযোগ থাকবে যে, সার্থক না হয়ে পারে না। সব দেশেই জাতীয় ভাবধারার দিকে লক্ষ্য রেখে শিক্ষার ব্যবস্থা হয়ে থাকে। কিন্তু আমাদের এমনি দুর্ভাগ্য যে, আমরা পরাধীন জাতি বলে আমাদের শিক্ষার উপরেও পাশ্চাত্য ভাবধারার প্রভাব পড়েছে। আবার এমনি আশ্চর্য যে, এ দেশের পুরুষ ও নারীর কর্মক্ষেত্র আলাদা হলেও, ছেলে-মেয়েদের শিক্ষার ব্যাপারে কোন পার্থক্য নেই—একই ধারায় তাদের শিক্ষা চলে আসছে। আমাদের দেশের মেয়েদের বাস্তব জীবনের সঙ্গে সে শিক্ষার কোন যোগাযোগ নেই। অথচ, সহরের মেয়েরা এই শিক্ষার মোহে অন্তঃসারশূন্য হয়ে পড়ছে—শিক্ষাকালেই তাদের জীবন-রস নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। তাই, আমাদের দেশের কোন বিজ্ঞ নেতা সরকারী এই শিক্ষা-ব্যবস্থাকে আত্মক্ষয়কারী 'মেসিন' বলেছেন। কিন্তু আমাদের শিক্ষায় যেমন জ্ঞানলাভ হবে, সেই সঙ্গে স্বাস্থ্যরক্ষা আর শক্তি সঞ্চয়ও করবে। উপরন্তু উপস্থিত-বুদ্ধি ও প্রত্যক্ষদর্শীতায় পটীয়সী [illegible] উঠবে; দেশ-বিদেশের অবস্থা জানবার আগ্রহ এতে বাড়বে, দে[illegible]র সঙ্গত দাবীগুলি স্বীকার করবার মত মানসিক দৃঢ়তা জন্মাবে[illegible]তাই বলে এ কথা আমি বলবো না যে, ঐ দাবীগুলি আদায় করবার [illegible]-গৃহস্থালী ফেলে মেয়েদেরই ছুটতে হবে—সে ব্যবস্থা করবেন নেতারা[illegible]থাযোগ্যের উপরে যথাযথ ভার দেবেন। তবে ঘরে থেকেও প্রত্যেক মেয়েকে জাতীয় দাবীকে সমর্থন করতে হবে; তাতে মনের শক্তি বাড়বে, আর

তার প্রভাব বর্তাবে সন্তানে। আমার মনে হয়, এই ভাবে শিক্ষাকার্য এই গ্রন্থাগারের তত্ত্বাবধানে চালু করলে তার ফল হবে খুব ভালো। এর পর স্থানে স্থানে এক-একটি শাখা-গ্রন্থাগার খুলে কাজের প্রসার বাড়ানো যাবে। শিক্ষা-সংস্কৃতিমূলক যত সব প্রতিষ্ঠান আছে, তাদের মধ্যে গ্রন্থাগারের সাহায্যেই এ কাজ ব্যাপক ভাবে চলতে পারে। অবশ্য এ কাজের জন্য বাগুলী ষ্টেটই এই গ্রন্থাগারকে অবলম্বন করে আমার প্রস্তাব-গুলির বাস্তব রূপ দেবে। এর জন্য পুরুষ ও মহিলাদের ভিতর থেকে এমন সব কর্মী নেওয়া হবে, এ ব্যাপারে যাঁরা একান্ত আগ্রহশীল, আর, যোগ্যতা বা কোন-না-কোন বিষয়ে অভিজ্ঞতাও আছে। অবশ্য, ষ্টেট থেকেই তাঁদের পরিপোষণের ব্যবস্থাও থাকবে। এ ছাড়া, আর একটা পরিকল্পনাও আমি স্থির করেছি। যে কোন গ্রামের উৎসাহী ছেলে-মেয়েরা যদি একশো টাকা মাত্র যোগাড় করতে পারেন তাঁদের গ্রামে একটি গ্রন্থাগার খোলবার জন্যে, তাহলে ষ্টেট থেকে আমরা তার দ্বিগুণ টাকা দেব। এই যৌথ টাকায় ছোট-খাটো একটা লাইব্রেরী গড়ে তোলা কঠিন হবে না। এর পর, লেখালিখি করে ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড থেকেও একটা মাসিক বরাদ্দ আদায় করা সম্ভব হতে পারে। গ্রামের লোক প্রথমে যদি আরো বেশী টাকা তুলতে পারেন, ধরুন—একশোর স্থলে, দু'শো, তিনশো কি পাঁচশো, তাহলেও ষ্টেট থেকে সেই টাকার, তা সে [illegible] বেশীই হোক—দ্বিগুণ দেওয়া হবে। তবে একশো টাকার কম হ[illegible] না—এই যা কথা। গ্রন্থাগারের চাঁদা কিন্তু মাসিক চার আনার [illegible] করা যাবে না। আর, এই ভাবে যে সব গ্রন্থাগার গড়ে উঠবে, [illegible] লক্ষ্যই হবে—নিরক্ষরতা মোচন করা, ঘরে ঘরে গিয়ে পুরুষ [illegible]দের মধ্যে শিক্ষা দেওয়া। তার পর কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগাররূপে বাগুলীর এই প্রতিষ্ঠান ঐ সব শাখা-গ্রন্থাগারগুলি পরিদর্শন করবে, প্রয়োজন মত নির্দেশ দেবে। এখন আমার কথা হচ্ছে, আজকার সভায়

এই কথার সঙ্গে সঙ্গে যাতে কাজের তাড়া পড়ে, তার ব্যবস্থা করা চাই। আমাদের যে কথা—সেই কাজ। বন্দে মাতরম্!

বক্তৃতার মধ্যে যখন চণ্ডী তাহার সুচিন্তিত জনকল্যাণকর প্রস্তাবগুলি উত্থাপিত করে, তখনই শ্রোতাদের মধ্য হইতে বিপুল হর্ষধ্বনি উঠিয়া তাহাকে অভিনন্দিত করিতেছিল। এইখানে তাহার অভিভাষণ শেষ হইবামাত্র বিবিধ উল্লাসকর ধ্বনি দেবী বিদ্যা-ভারতীকে অভিনন্দিত করিল।

ইহার পর গোবিন্দ ও চণ্ডীর উদ্দেশে রচিত এবং সুবর্ণখচিত আবরণে মণ্ডিত পৃথক্ পৃথক্ দুইখানি অভিনন্দন-পত্র সভাস্থলে পঠিত ও উভয়কে উপহৃত হইলে মহিলাদের পক্ষ হইতে তরলা এবং অভ্যাগতা অতিথিরূপে গৌরী, এই আদর্শ দম্পতির মহান্ চরিত্র ও শিক্ষানুরাগ সম্বন্ধে যে বক্তৃতা দিল, শ্রোতৃবর্গ সমবেত কণ্ঠে তাহাদের পূর্ণ সমর্থন করিল। কুমারী জীবনেই শিক্ষার উন্নতি সম্পর্কে চণ্ডীর আশা, আকাংখা ও তাহার বলিষ্ঠ প্রকৃতির অনুকূলে কতকগুলি কাহিনী গৌরীর মুখে শুনিয়া সকলেই প্রচুর আনন্দ পাইলেন।

বাশুলী ষ্টেটের দেওয়ান রাধানাথ বাপুলী এবং ষ্টেটের কর্মচারিগণ শেষ পর্যন্ত সভাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। কিছু বলিবার জন্য বাপুলী মহাশয় বিশেষ ভাবে অনুরুদ্ধ হইলেও তিনি সবিনয়ে সে অনুরোধ এড়াইয়া গেলেন। নিবারণ কিম্বা শশীনাথ ডাক্তারকে সভার ত্রিসীমা[illegible] [illegible]খা যায় নাই। সভাপতি মহাশয় উপসংহারে বিদ্যা-ভারতীর গ্রন্থা[illegible] [illegible]তিষ্ঠার বিরাট পরিকল্পনা এবং ভারতীয় ভাবধারায় শিক্ষা ব্যবস্থা [illegible] তাহার অদ্ভুত মননশীলতার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া কৃতী [illegible] গর্বে গৌরবান্বিত বাশুলীর বদান্য ভূস্বামীর উদ্দেশেও ধন্যবাদ [illegible]

নয়

পরদিন প্রত্যুষে শ্বশুরের কক্ষমধ্যে যথাকৃত্য শেষ করিয়া চণ্ডী উঠিবা-মাত্র হরিনারায়ণ গম্ভীর মুখে জিজ্ঞাসা করিলেনঃ লাইব্রেরীর উৎসবটা কেমন হলো মা ?

স্থির দৃষ্টি শ্বশুরের মুখে নিবদ্ধ করিয়া চণ্ডী বলিলঃ আপনি কি সে খবর এখনো শোনেননি বাবা ?

গম্ভীর মুখে হাসির একটু রেখাপাত করিয়া হরিনারায়ণ বলিলেনঃ যদিও ইদানীং আমার কাছে খবর আসাকে নিয়ন্ত্রিত করা হয়েছে, তবুও বাতাস আমার কানে-কানে সব বলে যায়—অন্ততঃ, আমার তালুকগুলোর মধ্যে কোথায় কি হোচ্ছে। তা সত্ত্বেও খবরটা তোমার মুখেই শোনবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেছি, সে ত তুমি বুঝতেই পারছ !

শ্বশুরের নিকট অস্থায়ী ভাবে প্রাপ্ত অধিকারের উপর নির্ভর করিয়া সভা স্থলে বক্তৃতা দিবার সময় অম্লান বদনে চণ্ডী তাঁহারই সুবিস্তীর্ণ তালুকের গ্রামাঞ্চলে শিক্ষা ও সংস্কৃতিমূলক উন্নতিকল্পে গ্রন্থাগারের মাধ্যমে যে বিপুল ব্যয় বরাদ্দ করিয়াছে, তাহা যে এ-বাড়ীর অনেকের পক্ষেই একান্ত আপত্তিকর এবং এই বিরোধী প্রসঙ্গ লইয়া অনেকগুলি চক্ষু-পল্লবে সুনিদ্রার ছায়া পড়িবে না, চণ্ডীর তাহা অজ্ঞাত নহে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও সে এই বিত্তবান ভূস্বামী বংশের কর্তব্য ও বৈধতার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া সেই বিশিষ্ট দিনটিকে ঐরূপ বিশিষ্ট দানের বরাদ্দ দ্বারা চিহ্নিত করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয় নাই। চণ্ডীর মত আশ্চর্য প্রকৃতির মেয়েদের ইহাই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া পরক্ষণে প্রসন্ন মুখখানি সহসা গম্ভীর করিয়া চণ্ডী কহিলঃ সভার সব খবর কি শুনতে চান ? কি ভাবে আমরা গেলাম, কি রকম আদর-যত্ন পেলাম, সভা কেমন সাজিয়েছিল, আমাদের

সম্বন্ধে কি বলল, আমরা কি বললাম—এ সবই? তাহলে যে অনেকটা বেলা হয়ে যাবে বাবা!

নিজেকে বিব্রতের মত মনে করিয়া এবং মুখখানায় তেমনি ভঙ্গি আনিয়া হরিনারায়ণ কহিলেনঃ না, না, ও-সব নয়—ও-সব নয়, কাল রাতেই বাপুলীর কাছে আমি আগাগোড়াই সব শুনেছি। আমি কি শুনতে চাইছি, সত্যিই কি তুমি তা বুঝতে পারনি বৌমা?

কথাটা শুনিয়া চণ্ডী যেন চমকিয়া উঠিল; পরক্ষণে শ্বশুরের মুখের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া কহিলঃ কাকাবাবুর মুখে সভার আগা-গোড়া শুনেও যখন আপনি আশ্বস্ত হতে পারেননি বাবা, তাহ'লে বুঝতে পারছি— আপনি যে খবর জানতে চাইছেন, সে বাইরের নয়—মনের।

অত্যন্ত উৎফুল্ল হইয়া হরিনারায়ণ সহর্ষে বলিয়া উঠিলেনঃ হঁয়া! ঠিক ধরেছ। তুমি নিশ্চয়ই জানো বৌমা, আর শুনেছও বোধ হয়—বহু লোক নিয়ে যাদের কারবার, তাদের ব্যবহারে সদর মফঃস্বল অর্থাৎ ভিতর-বার না রাখলে চলে না। দেশের যাঁরা মাথাওয়ালা নেতা—তাঁদের এ দলে ফেলা যায়; সভায় দাঁড়িয়ে গগন ফাটিয়ে কত কথাই বলে আসেন, কিন্তু তার পর আর সে সব কথা ওঠে না, চাপা পড়ে যায়।

কথাগুলি শুনিতে শুনিতে চণ্ডীর চোখের দৃষ্টি সহসা রুক্ষ হইয়া উঠিল, পরক্ষণেই তাহা সহজ ও স্বাভাবিক করিয়া শ্বশুরের দিকে চাহিয়া সে কহিলঃ আপনার কথা আমি বুঝতে পেরেছি বাবা! আমি আপনার প্রকৃতিকে বাদ দিয়ে শুধু আপনার এখানকার এই কথাগুলোর ভিতর দিয়ে যা বুঝতে পেরেছি, তা হচ্ছে এই যে—কালকের স[illegible] অনেক লোক-জন দেখে, আর আমাদের প্রতি শ্রদ্ধাভক্তির বাড়াবাড়িতে খুশী হয়ে লাইব্রেরী সম্পর্কে ঐ দানের বরাদ্দটা সাময়িক ভাবেই তাদের শুনিয়ে দিয়েছি—আসলে ও-একটা স্তোক দেওয়া বা ভাঁওতা ছাড়া কিছু নয়। এই ত আপনার কথা?

হরিনারায়ণ : হ্যাঁ—কাল ঐ বরাদ্দ নিয়ে যখন আলোচনা হয়, এই কথাটাই অনেকে বলেছিল ; তাদের ধারণা যে, বুদ্ধিমতীর মত সভায় তুমি খুব একটা চাল চেলে এসেছ, আসলে কিন্তু সাত মণ তেলও পুড়বে না, রাধাও নাচবে না কোনদিন।

চণ্ডী : বাপুলী কাকাও এই কথা বলেছেন ?

হরিনারায়ণ : বাপুলী এ সম্বন্ধে কোন কথাই বলেনি।

চণ্ডী : আপনিও কি ওদের কথা বিশ্বাস করেছেন বাবা ?

হরিনারায়ণ : সেই জন্যই ত তোমাকে জিজ্ঞাসা করেছি—আসল খবরটা কি !

কণ্ঠস্বর এবার দৃঢ় করিয়া চণ্ডী উত্তর করিল : আমার কথা কোন দিন নড়েনি বাবা ; আমি যা বলি, তাই করি। প্রাণের কথাই আমি সভায় বলেছি, সে সম্বন্ধে আমার নজীর হচ্ছে আপনার প্রতিশ্রুতি, আর বিরাট প্রকৃতি।

কথাগুলি এক নিশ্বাসে বলিয়া তাম্র টাটখানি ডান হাতের তালুর উপর তুলিয়া লইয়া চণ্ডী চলিয়া গেল। হরিনারায়ণ বাবু নিষ্পলক নয়নে বধূর দৃপ্ত গতিভঙ্গির দিকে চাহিয়া রহিলেন।

চণ্ডী দরজার বাহিরে অদৃশ্য হইলে দৃষ্টি ফিরাইয়া পার্শ্বের দিকে তাকাইতেই হরিনারায়ণ দেখিলেন, পার্শ্বের ঘরখানির মধ্যবর্তী দ্বারদেশে টাঙানো পরদার গায়ে পিঠটি রাখিয়া দাঁড়াইয়া আছেন মাধুরী দেবী, তাঁহার সুন্দর মুখখানি অপরাহ্নের স্থলপদ্মের মত ম্লান, বিবর্ণ।

দ্বারপ্রান্ত হইতে ধীরে ধীরে ভিতরে আসিয়া মাধুরী দেবী শ্লেষের সুরে বলিলেন : বৌমার সঙ্গে বোঝাপড়া সব হয়ে গেল ?

হরিনারায়ণ একই ভাবে পত্নীর মুখের দিকে চাহিয়াছিলেন। তাঁহাকে নিকটে আসিতে দেখিয়া পাশের কেদারাখানি সামনের দিকে একটু ঠেলিয়া দিয়া স্নিগ্ধ স্বরে কহিলেন : বস। আজ এত সকালে যে উঠে পড়েছ ?

কেদারাখানি নিজেই সুবিধা মত স্থানে টানিয়া আনিয়া মাধুরী দেবী বসিতে বসিতেই বলিলেন : উঠতে হয়েছে নিজের গরজে। তুমি ভোরে উঠে একলাটি চুপ করে বসে থাকবে, বৌমা এসে পরিচর্যা করবেন—আর আমি নাক ডাকিয়ে বিছানায় পড়ে পড়ে ঘুমাব, এ কি ভাল দেখায়? তাই, এত দিনের অভ্যাসটি বদলাবার চেষ্টা করছি। শোননি, নিবারণও ভোরে উঠতে সুরু করেছে—

চমকিত হইবার মত মুখভঙ্গি করিয়া হরিনারায়ণ বলিয়া উঠিলেন : বল কি? নিবারণও নিয়মভঙ্গ করেছে? কিন্তু সে যে ন'টার আগে কোন দিনই বিছানা ছেড়ে ওঠে না!

মাধুরী দেবী বলিলেন : ডাক্তারবাবু ওর চিকিৎসার ভার নিয়েছেন শুনেছ ত? তিনিই এটা করিয়েছেন। ওঁরও খুব ভোরে ওঠা অভ্যাস কি না; নিজে উঠেই নিবারণকে তোলেন, তার পর বেড়াতে যান তাকে সঙ্গে নিয়ে।

মুখ ও চক্ষুর এক রহস্যময় ভঙ্গি করিয়া হরিনারায়ণ বলিয়া উঠিলেন : বটে! তাহ'লে এই শশী ডাক্তারের ক্ষমতা আছে এটা মানতে হবে বৈ কি! নিবারণ ভোরে উঠে রোদ ওঠা দেখছে—এ বাড়ীর সবার কাছেই এ একটা তাজ্জব ব্যাপার! তার পর, তোমার কথা—এটাও উপেক্ষা করবার মত নয়। এই, সেদিনও তুমি আমাকে শাসিয়েছিলে—'তা বলে, তুমি যেন ভেবো না যে, তোমার দেখাদেখি আমিও ঐ অভ্যাস আরম্ভ করব!' মনে আছে নিশ্চয়ই কথাগুলো?

স্বামীর দিকে চাহিয়া ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া মাধুরী দেবী উত্তর করিলেন : মনে না থাকবার ত কোন মানে নেই। কিন্তু তুমি যে কথাগুলো অক্ষরে অক্ষরে মুখস্থ করে রেখেছ, তা ভাবতে পরিনি। বৌমার উপরে ঠেস দিয়ে বলেছিলুম বলেই বোধ হয় আর ভুলতে পারনি!

হরিনারায়ণ বাবু একটু গম্ভীর ভাবে বলিলেন : যে কথাগুলো কানে

খচ্ করে লাগে, সেগুলো খুব সহজেই আমার মুখস্থ হয়ে যায়—কোন দিনই ভুলি না।

মুখখানি কঠিন করিয়া তীক্ষ্ণ কণ্ঠে মাধুরী দেবী বলিলেন: আমিও সেই কথাই ত বলছি—পুরাণো যে সব কথা তুলে আমাকে দিব্যি আঘাত দেওয়া যায়, সে কথাগুলো তুমি ঠিক মনে করে রাখ—ভুলে যাও না।

বিব্রতের মত নিজের মুখখানি ম্লান করিয়া হরিনারায়ণ বলিলেন: কি মুস্কিল! আমি তোমাকে ইচ্ছে করে আঘাত দিচ্ছি—এই কথা তুমি বল্‌তে চাইছ? কথার পিঠে কথা পড়লেই পুরানো কথা আপনি এসে পড়ে; কথাটা কিন্তু গোড়াতে তুমিই তুলেছিলে! তবে এ কথাও বলি, বৌমা কিন্তু কোন দিন ঐ কথা নিয়ে বড়াই করেন নি; বরং তাঁর জিদটাই রক্ষা করতে পেরেছেন বলে নিজে যেন সর্বদাই কুণ্ঠিত হয়ে থাকেন দেখতে পাই।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া মাধুরী দেবী বলিলেন: হ্যাঁ, ঐ নিয়ে বাড়ীময় ঢাক পিটে বেড়াননি তা সত্যি—তুমি বোধ হয় সেই জন্যেই তোমার বৌমাকে তারিফ করছ। কিন্তু সে অমন কাঁচা মেয়ে নয় যে বাজে কথা নিয়ে জাঁক করে অহংকার দেখাতে যাবে! বৌমা জানে—জোঁকের মুখে যখন নুণ দিতে পেরেছে, তার আর ঘাবড়াবার কিছু নেই। এখন চোখ রাঙিয়ে সে সবার উপরে টেক্কা দিয়ে যাবে।

ঈষৎ অসহিষ্ণু ভাবে হরিনারায়ণ বলিয়া উঠিলেন: ছি, ছি, এ কি বলছ তুমি? বৌমার সম্বন্ধে এমন ধারণা অন্ততঃ তোমার করা উচিত নয়।

মাধুরী দেবীও অকুণ্ঠিত চিত্তে পূর্ববৎ তীক্ষ্ণ স্বরে বলিলেন: তোমার বৌমাকে ঠিক মত বুঝতে এ বাড়ীতে আর কারও ক্ষমতা নেই বলেই আমাকে এ কথা বলতে হচ্ছে। মনের কথা মনের মধ্যে চেপে রাখতে আমি যেমন জানি, দরকার হলেই বলতেও তেমনি আমার মুখে আটকায় না। কি অন্যায় বলেছি যে, শুনেই ছি ছি করে শিউরে উঠলে?

তোমার বৌমা যে চোখ রাঙিয়ে এ বাড়ীর সকলকে দাবিয়ে দেবার মতলব করেছেন—এ কি মিছে কথা? যতই ন্যাকা সেজে থাকতে চাও, তুমিও যে বোঝনি তা নয়।

মৃদু হাসিয়া হরিনারায়ণ বলিলেন: এই বুঝেছি, তুমি কিছু বুঝেছ বলেই, বৌমা এ-ঘর থেকে চলে যেতেই এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলে—বৌমার সঙ্গে বোঝা-পড়া সব হয়ে গেল? তাহ'লে বল্‌ছি শোন—বৌমা এসে এমন কিছুই বলেননি, যার জন্যে তাঁর সঙ্গে নতুন করে কিছু বোঝা-পড়া করতে হবে। বৌমা বরং ঘরে এসে মুখ বুজিয়েই তাঁর নিত্যকার কাজগুলি সেরে—ভূমিষ্ঠ হয়ে আমায় প্রণাম করে, সর্বাঙ্গে তাম্র-টাটের তাজা রক্তজবাটির পরশ দিয়ে চলে যাচ্ছিলেন, আমিই তাঁকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলাম—লাইব্রেরীর উৎসবটা কেমন হলো মা?

শুষ্ক কণ্ঠে মাধুরী দেবী বলিলেন: থাক্, আর বলতে হবে না।

মুখখানি তুলিয়া নিবদ্ধ দৃষ্টিতে পত্নীর মুখের দিকে চাহিয়া হরিনারায়ণ বলিলেন: বুঝেছি, এর পর এ-ঘরে যে-সব কথা হয়েছিল, তুমি সব শুনেছ। ভালোই করেছ, কিন্তু তার মধ্যে এমন কোন কথা বৌমার মুখ দিয়ে বেরিয়েছে কি, যার জন্যে তাঁকে বলতে পারা যায় যে, তিনি চোখ রাঙিয়ে বাড়ীশুদ্ধ সবাইকে দাবাতে চাইছেন?

দুই চক্ষুর ভ্রূ দুইটি কুঞ্চিত করিয়া মাধুরী দেবী রুক্ষস্বরে উত্তর করিলেন: রোগে ভুগে আর ঘরের মধ্যে এক ভাবে বসে থেকে তুমি দেখছি বুদ্ধি-শুদ্ধিও হারিয়ে বসে আছ, তাই আমাকে এ কথা জিজ্ঞাসা করছ! বৌমা ত তোমার কথার উত্তরেই জোর-গলায় বলে গেলেন—আমার কথা কোন দিন নড়েনি, আমি যা বলি—তাই করি। এর মানে তুমি কি বলতে চাও শুনি?

গম্ভীর মুখে হরিনারায়ণ বলিয়া উঠিলেন: তুমি ও-কথাগুলোর কি মানে বুঝেছ, সেইটিই আগে শুনিয়ে দাও না কেন?

দৃঢ়স্বরে মাধুরী দেবী বলিলেন ঃ এর মানে ত পড়েই রয়েছে। বৌমা ভেবেই রেখেছেন—তাঁর মনে যে ইচ্ছা জাগবে, তাঁর নিজের বিচারে যেটা ভাল মনে হবে, তিনি তা করবেনই—কারও কোনো বাধাই মানবেন না ; আর তুমিও তার জন্যে আগে থেকেই সমস্ত ক্ষমতা তাঁকে দিয়ে রেখেছ।

বিস্ময়ের সুরে হরিনারায়ণ জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ আমি তাঁকে সমস্ত ক্ষমতা দিয়ে রেখেছি ?

কণ্ঠস্বরে জোর দিয়া মাধুরী দেবী বলিলেন ঃ হ্যাঁ। নইলে ও কথা বলবার সাহস সে কোথা থেকে পেল ? সেই যে কথা আছে না—টাকার অঙ্কটি না লিখে নাম দস্তখত করে চেক কেটে দেওয়া ? তুমিও ঠিক তাই করেছ। ব্ল্যাঙ্ক-চেক বৌমাকে লিখে দিয়েছ, তিনি এখন টাকার ঘরে ইচ্ছামত অঙ্ক বসিয়ে সেটা যদি ভাঙাতে যান, তোমার বল্‌বার কি থাকতে পারে ?

জোরে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া হরিনারায়ণ বলিলেন ঃ উঃ! মুখের একটা কথা নিয়ে তুমি যে এতদূর তলিয়ে ভেবেছ তা আমি ভাবতে পারিনি।

বিদ্যুৎ-ঝলকের মত মাধুরী দেবীর মুখের কোণে তীক্ষ্ণ হাসির একটু ঝিলিক দেখা দিল ; সঙ্গে সঙ্গে তিনি বলিয়া উঠিলেন ঃ এই জন্যেই আমি বলেছিলুম যে, তোমার বৌমা চোখ রাঙিয়ে সবার উপর টেক্‌কা দিয়ে যাবেন ! তখন কথাটা ভাল লাগেনি।

এই সময় বাহিরে ঘন ঘন বার কয়েক কাসির শব্দ হইল। মাধুরী দেবী তাড়াতাড়ি উঠিয়া ঘরের পরদাখানি সরাইতেই দেখিলেন, ডাঃ শশী বাগচি দ্বারপ্রান্তে পা ঘষিতেছেন—কর্তার গৃহে প্রবেশ করিবার উদ্দেশ্যে।

মাধুরী দেবী প্রসন্ন মুখেই তাঁহাকে আহ্বান করিলেন ঃ আসুন, ডাক্তার কাকা !

স্বামীর দিকে চাহিয়া বলিলেন ঃ ডাক্তার কাকা এসেছেন।

গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া যুক্তকরে শশী ডাক্তার হরিনারায়ণকে নমস্কার করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন : কেমন আছেন আজ ?

হরিনারায়ণ মৃদু হাসিয়া বলিলেন : দেখতেই পাচ্ছেন ত—আপনাদের শাসনাধীন অবস্থায় রয়েছি ; গৃহমধ্যে কয়েদী, বাইরে বেরুবার জো নেই, অসূর্যম্পশ্যা বধূটির মতন অসহায় অবস্থা।

মাধুরী দেবী একটু তফাতে আর একখানি কেদারা দেখাইয়া দিয়া হাসিমুখে বলিলেন : দাঁড়িয়ে রইলেন যে ডাক্তার কাকা, বসুন।

আসন গ্রহণ করিয়া শশী ডাক্তার টানিয়া-টানিয়া বলিতে লাগিলেন : বড়লোকের বাড়ীতে অসুখ-বিসুখ হলে রুগীর চেয়ে ডাক্তারকেই কিন্তু মুস্কিলে পড়তে হয়। রোগ ত আর আলাদা চেহারা নিয়ে বড়লোকের বাড়ী আসে না, আর রুগী বড়মানুষ বলে সমীহও করে না। কিন্তু রুগী চান, অন্ততঃ ডাক্তার তাঁকে রোগের পক্ষ থেকে খানিকটা তোয়াজ করে।

হরিনারায়ণ বলিলেন : বটে ! তাহ'লে আপনিও সেই রকম করেন নাকি ?

ডাক্তার উত্তর করিলেন : আজ্ঞে, তা রুগীর মেজাজ বুঝে করতে হয় বৈ কি। বড়লোকের বাড়ীর মাইনে-করা বাঁধা ডাক্তার হলে তাকেও বাঁধা পড়তে হয়। এই ধরুন, আপনারা যেন আমাকে বাড়ীর ডাক্তার করে রেখেছেন ; তাহ'লে আমার কর্তব্য হচ্ছে রোগকে ঠেকান। যেমন দরোয়ান রাখেন বাইরে চোর-ডাকাত বা দুষ্ট প্রকৃতির লোকদের রোখবার জন্যে—ডাক্তারও তাই, বাড়ীর লোকজনদের স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যাপারে তাকে ঐ দরোয়ানী করতে হয়। প্রথম লক্ষ্য হবে তার—রোগ যাতে না বাড়ীতে ঢুকতে পারে সেদিকে নজর রাখা, তার পর ডাক্তারের চোখ এড়িয়ে যদিই কোন ফাঁকে ঢুকে পড়ে, তখন তাকে তাড়ানোই হবে ডাক্তারের কাজ।

মাধুরী দেবী নিবিষ্ট মনেই ডাক্তারের কথাগুলি শুনিতে শুনিতে এক-

এক বার স্বামীর দিকে চাহিতেছিলেন। হরিনারায়ণের মুখ দেখিয়া মনে হইতেছিল তিনি এই মুখরোচক কথাগুলি পরম কৌতুকের সহিত উপভোগ করিতেছেন। মাধুরী দেবী এই সময় স্বামীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন : তাই, ডাক্তার কাকা সেদিন বলছিলেন—এ রকম শক্ত অসুখ ত বড়লোকের হবার কথা নয় ; উনি বলেন—ডাক্তার বাড়ীতে বাঁধা থাকে কি জন্যে ? *এ রোগ আগেই ধরে ফেলা উচিত ছিল। উনি ত সেই জন্যে সকালে-বিকালে দু'বেলাই স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে থাকেন। দাদা কি সেই শক্ত ব্যামোতে পড়তেন—যদি ডাক্তার কাকা ও বাড়ীতে সে সময় থাকতেন ?

হরিনারায়ণ বলিলেন : কেন, উনি ত ও বাড়ীতেই বাঁধা ছিলেন বরাবর—তবে ?

ডাক্তারই প্রশ্নটির উত্তর দিলেন : বলেন কেন দুঃখের কথা, তিনটি দিনের জন্যে ঐ সময় কলকাতায় গিয়েছিলাম। ফিরে এসেই দেখি—

সহাস্যে হরিনারায়ণ বলিলেন : আপনার অনুপস্থিতির ফুরসৎ পেয়েই রোগ তাঁর স্বাস্থ্যের ঘরে ডাকাতি করতে ঢুকে পড়েছে ?

ডাক্তার দিব্য সপ্রতিভ ভাবেই প্রশ্নটির সমর্থন করিয়া বলিলেন : আজ্ঞে হ্যাঁ, তা ছাড়া আর কি বলি ! এসেই দেখি, লাংসের দু'টো সাইড একবারে চেপে ধরেছে। তবুও ডাক্তার বেঁধে রাখার ফল সেদিন হাতে হাতে দেখতে পেলেন। ওঁর ধাতটা গোড়া থেকেই জানা ছিল, তাই সারিয়ে তুললাম কোন গতিকে। নতুন ডাক্তার কেউ এলে—কিছুতেই হালে পানি পেতেন না, তা তিনি যিনিই হোন।

ঈষৎ হাসিয়া হরিনারায়ণ জিজ্ঞাসা করিলেন : এখানে এসে কি রকম বুঝছেন ডাক্তার—হালে পানি ঠেকবে মনে হচ্ছে ?

ডাক্তারও সঙ্গে সঙ্গে উত্তর করিলেন : আজ্ঞে, হালই এখানে হাতে

যখন পাইনি, পানির কথা কি করে বলি বলুন ? তবে এ ক'দিন এখানকার হাল-চাল দেখে আন্দাজে মোটামুটি একটা অনুমান যে না করেছি তা নয়।

হরিনারায়ণ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন: আপনার অনুমানটির কিছু আভাস পেতে পারি ?

মুখখানি দৃঢ় করিয়া ডাক্তার আস্তে আস্তে উত্তর দিলেন: কিছু আভাস তার পাননি কি—আমার অনুমান চিকিৎসা কি ভাবে চলেছে ?

ব্যগ্র কণ্ঠে হরিনারায়ণ বলিলেন: হ্যাঁ, হ্যাঁ, শুনছিলাম বটে—নিবারণকে ভোরে ওঠানো অভ্যাস করিয়েছেন, তাকে নিয়ে বেড়াতেও আরম্ভ করেছেন। ইনিও তার দেখাদেখি সূর্যি ঠাকুরের আগেই এ-ঘরে আজ উঁকি দিয়েছেন। কিন্তু ডাক্তার, অপ্রিয় হলেও মানতে হবে—এর গোড়াপত্তনটি আমার বৌমাই করে গেছেন ; বুড়ো গাছটার গোড়া তিনি আগেই সাফ করে আগাছাগুলো সরিয়ে দিতেই তবে আপনার এদিকে নজর পড়েছে।

অসহিষ্ণুর মত মুখভঙ্গি করিয়া ডাক্তার বলিলেন: ওটা ঠিক যেন কাকতালীয়বৎ হয়ে দাঁড়িয়েছে। উনি আপনাকে নিয়ে না পড়লেও আমি কিন্তু এসেই ও-ব্যবস্থা দিতাম। দেখবেন, আপনার ছেলের স্বাস্থ্য একটি মাসের মধ্যেই কতখানি উন্নত হয়ে ওঠে। আমি ত এ জন্যে বেশীর ভাগ সময়ই ওঁর সঙ্গে থাকি।

মুখখানি সহসা গম্ভীর করিয়া হরিনারায়ণ বলিলেন: তাও শুনেছি, কিন্তু তাতে আশ্বস্ত হতে পারিনি ডাক্তার !

সন্দিগ্ধ কণ্ঠে ডাক্তার জিজ্ঞাসা করিলেন: কেন বলুন ত ?

মুখে একটু তিক্ত হাসি ফুটাইয়া হরিনারায়ণ বলিলেন: ডাক্তারের সঙ্গও অনেক সময় বিপজ্জনক হয়ে থাকে। কথায় আছে না—রোজা ভূত ছাড়ায় সত্যি, কিন্তু রোজার ঘাড়েই ভূত যদি চেপে বসে, তাহ'লে তার ফল

হয়ে ওঠে সাংঘাতিক। নিবারণের উপর গভীর দরদ দেখিয়ে বিশু ডাক্তারও ওকে সর্বক্ষণের সঙ্গী করেছিল। ভাবতাম, ছেলের স্বাস্থ্যোন্নতি হচ্ছে। কিন্তু চুপি চুপি ছেলেটার মাথা কি ভাবে সে চিবিয়ে খেয়েছে, সে সব ত শুনেছেন? সেই থেকে ডাক্তারের নাম হলেই শিউরে উঠি—তাই ত, ডাক্তারী চিকিৎসা সন্তর্পণে বর্জন করে বৌমার চিকিৎসাকেই স্বীকার করে নিয়েছি।

মুহূর্তের জন্য শশী ডাক্তারের মুখখানা বিবর্ণ হইয়া গেল, কিন্তু পরক্ষণেই আত্মসংবরণ করিয়া তিনি সোজা হইয়া বসিলেন, এবং জোরে বার-দুই কাসিয়া গলাটা পরিষ্কার করিয়া সহাস্যে বলিলেন: হ্যাঁ, আপনাদের সেই ডাক্তারটির যে সব কীর্তি-কথা শুনেছি, তাতে ডাক্তারদের উপরে মনে একটা বিরাগ আসা খুবই স্বাভাবিক। তবে কি জানেন, বয়সটার পানে চেয়ে তবে ডাক্তার যাচাই করতে হয়। ডাক্তার হওয়াও একটা মস্ত সাধনা—অনেক পরীক্ষার মধ্য দিয়ে বেরিয়ে আসতে হয় ডাক্তারকে। চরিত্রে দাগ নেই—এমন ডাক্তার খুব কমই মেলে। এই জন্যে ছেলে-ছোকরা ডাক্তারকে অনেকেই বড় একটা বিশ্বাস করতে চায় না—যত লম্বা-লম্বা সার্টিফিকেট তাদের থাকুক না কেন! নিজের সম্বন্ধে বড়াই করতে চাই নে—মা-লক্ষ্মী সবই জানেন। তা ছাড়া, বিশু ডাক্তারের বয়স অনেক আগেই পেরিয়ে এসেছি। কাজেই, এই বুড়ো রোজার ঘাড়ে ভূত চাপবার আর কোনো সম্ভাবনাও নেই, আশঙ্কাও হবার কথা নয়।

হরিনারায়ণ এতক্ষণ অপলক নয়নে ডাক্তারের মুখের দিকে চাহিয়া তাঁহার কথাগুলি শুনিতেছিলেন। কথা শেষ হইলে তিনি ভ্রূভঙ্গি করিয়া কহিলেন: একটা কথা জানতে আমার আগ্রহ হচ্ছে ডাক্তার, প্রথম যৌবন থেকে জীবনের সায়াহ্ন কাল পর্যন্ত এই পেশা চালিয়ে সংসার থেকে পাত্‌তাড়ি গুটাবার সময়ে আবার কেঁচে গণ্ডূষ করবার প্রবৃত্তি

আপনার কেন হলো ? আর, বিশু ডাক্তার যেখান থেকে পা পিছলে পড়ে জেলখানায় গিয়ে সেঁধুল, সেখানে এসে বসবার জন্যেই বা আপনার মনে এত আগ্রহই বা কেন জাগল ?

শশী ডাক্তার যেন প্রশ্ন দুইটির উত্তর প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন। হরিনারায়ণের কথা শেষ হইতেই তিনি বলিতে আরম্ভ করিলেন : সত্যি কথাই গাঙ্গুলীমশাই, এ বয়সে আমার চাকরীতে কেঁচে গণ্ডুষ করবার কোন প্রয়োজনই ছিল না। কিন্তু একজন ডাক্তারের পাল্লায় পড়ে আপনার এক উপযুক্ত ছেলের অধঃপতন হয়েছে শুনে আমার মাথায় রোক চেপে যায় ; আপনার সেই ছেলেটির উপরে বরাবরই আমার কেমন একটা খুব ভাল ধারণাই ছিল—সেইটে যাতে মিথ্যে না হয়, এক তরুণ ডাক্তারের দোষ-ক্রটির জন্যে যে বিগড়ে গেছে, এই প্রবীণ ডাক্তারের সাহচর্যে সে যাতে সুধরে ওঠে—তার ব্যবস্থা করা। আপনার দ্বিতীয় প্রশ্নটির উত্তর হচ্ছে গাঙ্গুলীমশাই, ডাক্তারদের বদনাম ঘোচানো। একটু আগেই আপনাকে বলেছি, ডাক্তারী বিদ্যা শিখে ডাক্তার হওয়া একটা মস্ত সাধনা। আমরা সে-যুগে শিক্ষার দিকেই একমুখী দৃষ্টি রেখে আর সংযমকে মনের বর্ম করে তবে সিদ্ধি পেয়েছিলাম। এ যুগের ছেলেদের কথা আর বলবেন না, সংযমের কোন পরোয়া করে না—শিক্ষা-জীবনেই তাদের হয় পদস্খলন ; তার কারণ, ডাক্তারী শিক্ষার মধ্যে প্রলোভনের বস্তু যথেষ্ট থাকে। সেই জন্যেই দেখতে পাই যে, পারিবারিক বা দাতব্য চিকিৎসার ব্যাপারে ছেলে-ছোকরা ডাক্তারদের উপর ভার যেখানেই দেওয়া হয়েছে, তার ফল কোথাও ভাল হয়'নি। এই বিশু ডাক্তারকেও দেখলেন, আর এর আগে ডাক্তার অমরনাথকেও দেখেছেন—তাঁর স্বভাব আর চিকিৎসার খ্যাতি আমাদের হেমন্তপুরেও ছড়িয়ে পড়েছিল—একসঙ্গেই আমরা এম, বি পাশ করেছিলাম। কোন বদনাম কখনো তাঁর রটেছে ? তার কারণ, তিনিও ছিলেন সাধক। শিক্ষার সঙ্গে আমরা

যে বরাবর সংযম-সাধনা করেছি। তাই বলছিলাম, ঐ চ্যাংড়া ছোকরা বিশু ডাক্তার যে দুর্নাম এখানে রেখে গেছে, তাতে ডাক্তারদের উপরে লোকের ঘৃণা জন্মানো আশ্চর্য নয়, সেটা আমি পাল্‌টে দিতে চাই, আর ডাক্তার হিসেবে সেটা আমার কর্তব্য বলেও মনে করি। এই হলো আমার উত্তর।

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া হরিনারায়ণ সহজ ভাবেই বলিলেন: আপনার যুক্তিগুলো সত্যিই খুব জোরালো; নিবারণকে ভালবাসেন বলে, এবং তার উপর একটা ভাল ধারণা থাকায়, আপনি যে তাকে শোধরাতে চেয়েছেন, আর চ্যাংড়া বিশু ডাক্তারের দুর্নাম ঘুচিয়ে আপনার সুনাম ছড়িয়ে ডাক্তারদের অপবাদ দূর করতে এখানকার চাকরীর প্রার্থী হয়েছেন—এ খুবই সহৃদয়তার কথা। কিন্তু মুস্কিল হয়েছে আমার বৌমাকে নিয়ে। শুনেছেন ত, আমি তাঁর উপরেই বাইরের ভারটা দেওয়ায় তিনি আগেই উপযুক্ত এক ডাক্তারের জন্যে খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে ফেলেছেন—নৈলে ত আর কথাই ছিল না। আপনার মত এমন সদুদ্দেশ্য নিয়ে বাইরে থেকে আর কোন্ ডাক্তার আসবে বলুন? কিন্তু দৈবের এমনি বিড়ম্বনা—শুনেছি, বৌমা নাকি এক রাশ দরখাস্ত থেকে একজনকে বেছে নিয়ে আসবার জন্যে চিঠি দিয়েও ফেলেছেন! তার আগে আপনাকে পেলে আর এ-সবের কোন প্রয়োজনই হ'ত না।

শশী ডাক্তার একবার মাধুরী দেবীর মুখের পানে তাকাইয়া দেখিলেন; কিন্তু তাঁহার মুখ হইতে এ সম্পর্কে কোন কথা বাহির হইবার সম্ভাবনা নাই বুঝিয়া নিজেই বলিয়া ফেলিলেন: আমি কিন্তু আশ্চর্য হয়ে গেছি গাঙ্গুলীমশাই, এত বড় একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে এই ছেলেমানুষী কাণ্ড—

হরিনারায়ণের যুগল চক্ষু একসঙ্গে যেন উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল; সঙ্গে সঙ্গে সেই জ্বলন্ত দৃষ্টি ডাক্তারের মুখে নিবদ্ধ করিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন: ছেলেমানুষী কাণ্ড?

সেই জ্বালাময়ী দৃষ্টিতে ডাক্তারের চক্ষু ধাঁধিয়া গেলেও তিনি বিহ্বল

না হইয়া সবিনয়ে বলিলেন : আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনিই বললেন এক রাশ দরখাস্ত থেকে বেছে-বেছে আপনার বৌমা একজনকে উপযুক্ত ভেবে তাঁকে আসবার জন্য চিঠি দিয়েছেন! ডাক্তারদের দরখাস্ত পড়লেন আপনার বৌমা, তাঁদের মধ্য থেকে সব চেয়ে উপযুক্ত ডাক্তারটিকে তিনিই পছন্দ করে আসবার জন্যে আমন্ত্রণ করলেন। এর চেয়ে ছেলেমানুষী কাণ্ড আর কি হতে পারে গাঙ্গুলীমশাই?

স্থির ভাবেই হরিনারায়ণ বাবু শশী ডাক্তারের এই ব্যঙ্গোক্তি শুনিলেন এবং ক্ষণকাল নীরব থাকিবার পর কিছুমাত্র উত্তেজিত না হইয়া ধীরে ধীরে বলিলেন : আমার একটা কি অভ্যাস জানেন ডাক্তার, যে কাজের ভার যখনই যার উপর দিয়ে থাকি, তার আগেই সে ভার বহনে তার ক্ষমতা কতখানি সেটা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপেই আমাকে জানতে হয়; আর, আমার সে জানাটা এমন নিখুঁত হয় যে, ভার দিয়ে কোন দিনই ঠক্‌তে বা পরে তার জন্যে পস্তাতে হয়নি। এই যে, বিগড়োবার আগে নিবারণকে আমি ষ্টেটের সেরেস্তায় একটা উঁচু আসনেই বসিয়েছিলাম; কিন্তু সে আমার ছেলে হলেও কোন দিনই তার হাতে ষ্টেটের ভার দিইনি; অথচ একটা পরের মেয়ে—আমার ঘরে যে বধূ হয়ে এসেছে, তাকেই সব চেয়ে উপযুক্ত ভেবে—বাইরের সমস্ত ভার তার উপর ছেড়ে দিয়েছি। ডাক্তার অমরনাথকে আনিয়েছিলাম আমি; আর বিশু ডাক্তার ঐ নিবারণের আমদানী। আমার কিন্তু খুব বিশ্বাস হচ্ছে ডাক্তার, বৌমা যে ডাক্তারটিকে উপযুক্ত বলে স্থির করেছেন, সেখানে কোন গলদ হতে পারে না।

নিক্ষিপ্ত শরটি ব্যর্থ হইয়াছে বুঝিয়া বিচক্ষণ শশী ডাক্তার তৎক্ষণাৎ অন্য অস্ত্র প্রয়োগ করিলেন। কণ্ঠস্বর আরও কোমল করিয়া সবিনয়ে কহিলেন : আপনার কথায় প্রতিবাদ করতে যাওয়া আমার পক্ষে হয়ত ধৃষ্টতা, তবে কারও মন রেখে কথা বলা আমার অভ্যাস নয় বলেই বলতে হচ্ছে যে, দরখাস্ত পড়ে কেরাণী নির্বাচন করাই চলে, কিন্তু ডাক্তারের বেলায় তা

খাটে না। আপনার বৌমা যে ডাক্তারটিকে পছন্দ করেছেন, তাঁর একমাত্র গুণ হচ্ছে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সাকরেদী করেছেন কিছু কাল, অর্থাৎ ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়িয়েছেন! এতেই আপনার বৌমা খুশী হয়ে তাঁকেই সব চেয়ে উপযুক্ত সাব্যস্ত করেছেন। কিন্তু এটা ভেবে দেখেন নি যে, ঐ ডাক্তারটি এখনো চ্যাংড়া ছোকরার দলে—সভা-সমিতিতে মিশে আড্ডা দিয়ে হুল্লোড় করে বেড়াতে খুব মজবুত তিনি।

সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে হরিনারায়ণ ক্ষণকাল ডাক্তারের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া কহিলেন: আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে, ঐ ডাক্তারটিকে আপনি চেনেন—নয় কি?

ডাক্তার বলিল: আজ্ঞে হ্যাঁ, কলকাতায় সায়েন্স কলেজে ডাক্তারদের একটা সম্মেলন হয়েছিল; সেইখানে ঐ ছোকরা ডাক্তার প্রতাপ রায়কে প্রেসিডেণ্ট পি, সি, রায়ের আরদালীর মত পিছু-পিছু ঘুরে বেড়াতে দেখেছিলাম। আপনাদের সেরেস্তায় আমি খোঁজ নিয়ে যতটা জানতে পেরেছি, তাতে সেই ছোকরাই না হয়ে যায় না। দরখাস্তেও তাই জোর দিয়ে তিনি লিখেছেন—আচার্য রায়ের আমি ছাত্র ও সেবক, এর চেয়ে বড় পরিচয় বা সার্টিফিকেট আমার আর নেই! সম্ভবত, কথাগুলো পড়েই আপনার বৌমা ভেবেছেন, যোগ্যতায় ইনি সবার চেয়ে বড়।

স্থূল গুম্ফ-যোড়াটি হাসিতে ফুলাইয়া হরিনারায়ণ বলিলেন: আমার বৌমা শুধু মুখের কথায় ভেজবার পাত্রীই নন—তাঁর একটা আশ্চর্য রকমের অন্তর্দৃষ্টিও আছে ডাক্তার! তার এ মনোনয়ন যে ভুল হবে না, এ কথা আমিও জোর করে বলতে পারি। হ্যাঁ ভাল কথা, এই ডাক্তারটিকে আপনি চিনতেন, এবং বয়সের দিক দিয়ে তিনি ছেলে মানুষ বলেই বুঝি ছোকরা ডাক্তারদের চ্যাংড়া বলে যাচ্ছে-তাই করলেন? আর, বিশু ডাক্তার যৌবনের সীমাপ্রান্তে গিয়ে পৌছলেও তাকে ছোকরাদের দলে এনে চ্যাংড়া সাব্যস্ত করে দিলেন! দেখছি, সত্যিই আপনি কাজের

লোক, কাজ বাগাতে হলে এ রকম ধোঁকাবাজিও নাকি বাহাদুরীর লক্ষণ!

ডাক্তারের মুখের সমস্ত রেখাগুলি বুঝি কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। কথাগুলি ঘুরাইবার উদ্দেশ্যে তাড়াতাড়ি তিনি শুষ্ক কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন: বিশু ডাক্তারের যে অত বেশী বয়স হয়েছিল সেটা আমার জানা ছিল না, তিনি যখন নিবারণবাবুর সঙ্গে মিশতেন, তরুণ বলেই আমার ধারণা ছিল।

কণ্ঠস্বর কিঞ্চিৎ বিকৃত করিয়া হরিনারায়ণ বলিলেন: বাশুলীর জমিদারের ছেলের সঙ্গে মিশে বন্ধুত্ব পাতাতে বয়সের প্রয়োজন হয় না। আপনিও ত নিবারণের সঙ্গে খুব মিশছেন, কিন্তু তাই বলে কি আপনাকে লোকে ছেলে-ছোকরা বা চ্যাংড়া সাব্যস্ত করবে বলতে চান?

মাধুরী দেবী এতক্ষণ নীরবে বসিয়া উভয়ের সংলাপ একাগ্র চিত্তেই শুনিতেছিলেন, এই সময় তিনি সহসা বলিয়া উঠিলেন: এ সব কথা নিয়ে এখন মাথা-গরম করেও কোন লাভ নেই। তোমার বৌমা যাঁকে যোগ্য মনে করে আসবার জন্য লিখেছেন, তাঁকেই যদি রাখা তোমার মত হয়, তাহ'লে ডাক্তার কাকাকে মিছিমিছি আর আটকে রেখে দরকার কি— কথাটা এখনি ওঁকে স্পষ্ট করে বললেই ত হয়।

এতক্ষণে নিজেকেও বিপন্ন বোধ করিয়া হরিনারায়ণ ব্যগ্রভাবে বলিলেন: দেখ কাণ্ড! কোন্ কথা থেকে কি কথা টেনে আনলে! ডাক্তারকে রাখা-না-রাখার কোন প্রশ্নই ত ওঠেনি। কেন, তুমি কি শোননি—যখন বাইরের ঐ ডাক্তারটিকে ডাকা হয়েছে, আর ইনিও প্রার্থী আছেন, এই অবস্থায় বৌমা ডাক্তার নির্বাচনের ভারটি কমিটির উপরেই ছেড়ে দিয়েছেন। এখন এঁদের দু'জনের মধ্যে কমিটি যাঁকে উপযুক্ত মনে করবেন, তাঁকেই নেওয়া হবে।

ভ্রূভঙ্গি করিয়া মাধুরী দেবী বলিলেন: কমিটি বলতে ত তুমি। তোমার যা মত, তাতেই কমিটি সায় দিয়ে এসেছে বরাবর। এখন

তোমার জায়গায় বসেছেন তোমার বৌমা, তুমি তাকে তোমার সমস্ত ক্ষমতা দিয়েছ। বৌমার কি মত হবে সে ত জানা কথা।

দৃঢ় স্বরে হরিনারায়ণ বাবু বলিলেন : না, তোমার এ ধারণা ভুল; এখন থেকে কমিটির মতেই কাজ হবে। এমন কি, কমিটি যদি এঁদের দু'জনের কাউকেও পছন্দ না করেন, আবার নতুন করে কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া হবে উপযুক্ত লোকের জন্য। বৌমা নিজেই আমাকে এ কথা বলেছেন। এখন ডাক্তারবাবু ইচ্ছা করলে কমিটির মেম্বারদের ধরে নিজের অনুকূলে সুপারিশ করতেও পারেন।

শশী ডাক্তার কথাটা শুনিয়া অসহিষ্ণুর মত বিরক্ত ভাবে প্রতিবাদের ভঙ্গিতে বলিলেন : এ কথা বলে আপনি কিন্তু আমাকে লজ্জা দিচ্ছেন গাঙ্গুলীমশাই! কমিটির যা ইচ্ছে হয় করবেন, কিন্তু তার জন্যে আমি কেন তাঁদের সুপারিশ ধরতে যাব, আর সেটা কি উচিত মনে করেন?

ব্যঙ্গের সুরে হরিনারায়ণ বলিলেন : কিন্তু এখানে এসেই প্রথম দিন বৌমার কাছে গিয়ে তাঁকে সুপারিশ ধরতে ত আপনার চক্ষুলজ্জায় বাধেনি! এখন আমার বলাটাই কি লজ্জার উপলক্ষ হয়ে দাঁড়াল?

ঈষৎ চমকিত হইয়া ডাক্তার বলিলেন : আজ্ঞে, আমি ত সুপারিশ ধরতে ও-মহলে যাইনি; এখানে এসেছি যখন, আর আপনার বৌমার সম্বন্ধে এত বড় সুখ্যাতির কথাও শুনেছি—তখন তাঁকে দেখবার একটা আগ্রহ ত হতেই পারে। আপনার বড় পুত্রটিকেও দেখে আলাপ করবার ইচ্ছাটাও স্বাভাবিক। এই সূত্রেই যাওয়া।

কিন্তু এই কৈফিয়ৎ দিয়াও ডাক্তার নিষ্কৃতি পাইলেন না; হরিনারায়ণ পুনরায় প্রশ্ন করিলেন : তাহ'লে বলি, ডাক্তারের সে আগ্রহ কি এক দিনেই মিটে গেল? ওঁদের সম্বর্ধনার জন্যে লাইব্রেরীওলারা যে-সভা

করেছিল, শুনিছি, আপনাকেও তারা আমন্ত্রণ জানিয়েছিল, কিন্তু আপনি সেখানে গিয়েছেন বলে ত কোন খবর পাইনি! লোকে বলছিল, বৌমার কাছে বিশেষ কোন ভরসা না পেয়ে আপনার আগ্রহও নাকি দমে যায়। আপনি কিন্তু এখানে মস্ত ভুল করেছেন ডাক্তার! ও সভায় যোগ দিলে আপনার জনপ্রিয়তাই বাড়ত। একটু আগে আপনি যে অমরনাথ ডাক্তারের কথা তুলেছিলেন, তাঁরই উদ্যোগে ঐ লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। বুঝিছি, আপনার তরুণ বন্ধু নিবারণবাবুর মন রাখতেই আপনি সেদিন ও-পথই মাড়াননি। যাক, আজকের আলোচনা এইখানেই শেষ হোক্, আমি আর বকতে পারছি নে—মাথাটা আবার গরম হয়ে উঠেছে।

এক নিশ্বাসে কথাগুলি বলিয়াই হরিনারায়ণ অবসন্নের মত আরাম-কেদারার উপর উর্ধ্বাঙ্গটি সমর্পণ করিলেন। ডাক্তারও একটি শুষ্ক নমস্কার করিয়া আস্তে আস্তে বিদায় লইলেন।

দশ

বাহিরের যে ছোট ঘরখানিতে বসিয়া শিবানীর পিতা ত্রিভুবন সেন কবিরাজী ব্যবসায় চালাইতেন, রোগী দেখিয়া ব্যবস্থা দিতেন—সেই ঘরখানিই বর্তমানে রাজীবের রাত্রিবাস এবং শিবানীর পাঠাভ্যাসের কক্ষে পরিণত হইয়াছে। ঘরের এক দিকে ছোট একখানি তক্তপোষের মাথার দিকে সামান্য শয্যাটি দিবাভাগে গুটাইয়া রাখা হয়, অবশিষ্ট অংশে একখানি সতরঞ্চি বিছানো থাকে, তাহাতে বসিয়াই রাজীব নিজের পড়া-শুনা ও পাঠাগার সংক্রান্ত লেখা-পড়ার কাজকর্মাদি করিয়া যায়। অদূরে কক্ষের আর এক প্রান্তে একখানি ছোট টেবিলের সামনে চেয়ারে বসিয়া শিবানীর অধ্যয়ন চলে—অধ্যাপনার সময় পাশের চেয়ারখানিতে রাজীবকে বসিতে হয়। কলিকাতা ছাড়িয়া আসিবার সময় রাজীব

গৃহস্থালীর প্রয়োজনীয় জিনিসগুলির মায়া সচ্ছন্দে কাটাইতে পারিলেও সযত্ন-সঞ্চিত গ্রন্থগুলির সঙ্গ ছিন্ন করিতে সমর্থ হয় নাই—সেগুলিও তাহার সঙ্গে বাশুলীর বাসস্থানে আসিয়াছে। যে ভাঙ্গা আলমারীর মধ্যে কবিরাজ মহাশয়ের ব্যবসায়ে ব্যবহার্য দ্রব্যগুলি অব্যবহার্য অবস্থায় পড়িয়াছিল, রাজীবের পরামর্শে বরদাময়ী সেগুলি প্রতিবেশী কবিরাজ বৈদ্যনাথ গুপ্তকে নিঃস্বার্থ ভাবে দিবার সময় বলেন—'কাজের লোক চলে গেলে তাঁর কাজের জিনিসপত্র ঘরের কোন কাজে না লাগলেও সে সব আঁকড়ে ধরে রাখা মেয়েমানুষের স্বভাব। অথচ, সেগুলো ঠিক জায়গায় পড়লে লোকের উপকারে লাগতে পারে—পরে ত নষ্ট হয়েই যাবে। এ বুদ্ধি কি এতদিন মাথায় এসেছিল? রাজীব এসেই ত চোখ খুলে দিলে; বললে—যে-সব জিনিসের ব্যবহার আমরা জানি নে, ঘরে ফেলে রেখে কি লাভ—তার চেয়ে এগুলো যাতে কাজে লাগে, তাই কর মাসীমা! ও-বাড়ীর কবিরাজ মামাকে দাও—তিনি যদি এ থেকে লোকের উপকার করতে পারেন, সেই তোমার মস্ত লাভ। স্বর্গ থেকে মামাও শুনে সুখী হবেন।'

স্বাজাত্য-নিষ্ঠা বৈদ্য জাতির প্রকৃতিগত একটি বিশিষ্ট গুণ। বিধবার এই নিঃস্বার্থ দান বৈদ্যনাথ তৎকালে সানন্দেই গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রাপ্ত ঔষধ ও উপাদানগুলি কাজে লাগাইয়া লব্ধ অর্থের ন্যায্য অংশ হইতে বিধবাকে বঞ্চিত করেন নাই। অবস্থার অসচ্ছলতা সত্ত্বেও বরদাময়ী নিঃস্বার্থ ভাবে প্রদত্ত বস্তুর উপস্বত্ব লইতে প্রথমে আপত্তিই জানাইয়াছিলেন, কিন্তু বৈদ্যনাথের যুক্তিপূর্ণ উক্তি সে আপত্তি খণ্ডন করিয়া দেয় এবং এই ব্যাপারে ইঁহাদের মধ্যে পূর্বের সম্প্রীতি আরও নিবিড় হইয়া উঠে।

সেই পুরাতন আলমারির তাকগুলি এখন রাজীবের সঞ্চিত মূল্যবান গ্রন্থাবলীতে ভরিয়া গিয়াছে। এই দুর্লভ সংগ্রহের জন্য সে এখন নিজেকে

ভাগ্যবান মনে করে। পুরুষানুক্রমে সঞ্চিত ঘর-বসতের নিত্যপ্রয়োজনীয় বহু বহু দ্রব্যরাজি ইহার তুলনায় তাহার দৃষ্টিতে অকিঞ্চিৎকর। রাজীবের এই ছন্নছাড়া ভাব এক-একবার বরদাময়ীর সংসারনিষ্ঠ চিত্তকে গভীর বেদনায় ক্লিষ্ট করিয়া তোলে, কিন্তু পরক্ষণেই একটা নিশ্বাস ফেলিয়া নিজেকে সামলাইয়া লন।

রাজীবের প্রকৃতি যেমন বিচিত্র, অধ্যাপনার ধারাও তেমনি অদ্ভুত; অর্থাৎ গতানুগতিক পথে সে তাহার শিক্ষাকে চালাইতে অভ্যস্ত নহে। কয়েক মাসের মধ্যেই শিবানী বুঝিয়াছে, সে কি ছিল আগে, আর এই খেয়ালী মানুষটির পাল্লায় পড়িয়া আজ কি হইয়াছে। এখন সে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে—শিক্ষা জগতের এমন অনেক অজ্ঞাত দিক্ তাহার জীবনকালে হয়ত কোন দিনই উদ্‌ঘাটিত হইত না, যদি এই দিব্যদর্শী শিক্ষকের শিক্ষার অপূর্ব আলোক তাহার চোখে না পড়িত!

এ-দিন রাজীব শিবানীকে একটি রচনা লিখিতে নিয়োজিত করিয়াছে। রচনার বিষয়বস্তু হইতেছে: গ্রন্থাগারের উদ্যোগে যে সম্বর্ধনা-সভা হইয়াছিল, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ সহ সে সম্বন্ধে তোমার নিজের মন্তব্য নিজের ভাষায় লিখ।

শিবানী আপন মনে রচনা লিখিতে লিখিতে এক-একবার অদূরবর্তী তক্তপোষে উপবিষ্ট ও নিজের কাজে তন্ময় রাজীবের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিতেছিল; আবার পরক্ষণে সে দৃষ্টি ফিরাইয়া খাতার উপর ফেলিতেছিল। কারণ, সে জানে যে, লেখা-পড়ার সময় সামান্য ভাবেও একটু অন্যমনস্ক হইলে আর রক্ষা নাই—জানিতে পারিলে তৎক্ষণাৎ রাজীব এমন গম্ভীর হইয়া উঠিবে, পাঠশালার গুরু মহাশয়ের আরক্ত নেত্রে বেত্র আস্ফালন পূর্বক সরব হুঙ্কারও তাহা অপেক্ষা সহনীয়। বাড়ীতে এবং পাড়াতেও এমন একটা গুঞ্জন উঠিয়াছে যে, এক দিন এ-বাড়ীর এই অধ্যবসায়ী গৃহশিক্ষক ও শিক্ষাসহিষ্ণু ছাত্রীর হৃদয় দু'টি এক হইয়া যাইবে—

কথাগুলি যে রাজীবের শ্রুতিস্পর্শ না করিয়াছে এমন নহে, কিন্তু তৎসত্ত্বেও অন্যের পক্ষে ত দূরের কথা, শিবানীও কি সে সম্বন্ধে রাজীবকে কোন কথা বলিতে বা সামান্য মাত্রও হাল্কা হইতে দেখিয়াছে কোন দিন? শিবানীর চেয়েও ব.স্কা ও পরিহাসপ্রিয়া কত মেয়েই ত রাজীবের সংস্পর্শে আসিয়াছে রসভাস জমাইয়া তুলিবার উদ্দেশ্য লইয়া। কিন্তু তাহার পরিণামও ত শিবানী অবাক-বিস্ময়ে লক্ষ্য করিয়াছে। কথার মধ্যেই কথা ঘুরাইয়া রাজীব কেমন আশ্চর্য ভাবে তাহাদের মনের গতি গুরুত্বপূর্ণ কোন বিষয়বস্তুর দিকে ফিরাইয়া দিয়া থাকে। এ জন্য পাড়ার প্রত্যেক মেয়েটি—যত বড় বাচাল বা হুল্লুড়ে হোক না কেন, রাজীবকে দেখিলেই আড়ষ্ট হইয়া পড়ে। শিবানী মেয়েটিও কি কম দুষ্ট ছিল;, মুখ দিয়া চোখ দিয়া তাহার কথা ফুটিত—কোন কিছু কাণ্ড ঘটিলে কোমরে কাপড় বাঁধিয়া সবার আগে ছুটিয়া যাইত, কাহাকেও গ্রাহ্য করিত না—কিন্তু এখন কেমন শিষ্ট শান্ত ও সভ্য হইয়াছে সে; এই কয়টা মাসেই যেন সে কত বড় সড় ও ভারিক্কি হইয়া গিয়াছে। এখন বরদাময়ীকে শোনাইয়া প্রতিবেশিনীরা বলিয়া থাকেন—রাজীব আসায় তোমার মেয়ে শিবির স্বভাব কিন্তু একবারে পালটে গেছে; কে বলবে, এ সেই আগেকার বাবা-নাচুনে ধিঙ্গী মেয়ে!

রাজীব নিবিষ্ট মনে শিক্ষার বিস্তার সম্পর্কে পরিকল্পনার একটা খসড়া রচনা করিতেছিল। সেদিনের সভার পর চণ্ডী স্বতন্ত্র ভাবে তাহাকেও কাজের একটা খসড়া প্রস্তুত করিবার জন্য অনুরোধ জানাইয়াছিল। সেই থেকে কয় দিন ধরিয়া রাজীব এই কার্যেই লিপ্ত আছে। চণ্ডীর ইচ্ছা, অনেক স্থানেই সভায় গৃহীত প্রস্তাব সভার পরেই যেমন চাপা পড়িয়া যায়, এখানে তাহার ব্যতিক্রম ঘটাইতে হইবে। এক পক্ষের মধ্যেই প্রস্তাব মত কাজ চালু করা চাই। গ্রন্থাগারের কার্যনির্বাহক সদস্যদের উপরেই আপাতত এই ভার সমর্পিত হইয়াছে।

সহসা শিবানী চেয়ারখানি ছাড়িয়া হাতের খাতাখানি লইয়া রাজীবের তক্তপোসের পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার কৌতুকময় দৃষ্টি রাজীবের মুখে নিবদ্ধ—রাজীবের চোখ দু'টি সামনের খাতার পাতায় লেখা কতিপয় অঙ্কের মধ্যে জড়াইয়া পড়িয়াছে তখন।

শিবানী ডাকিল: রাজুদা, আমার রচনা হয়ে গেছে।

চোখ দু'টি তুলিয়া শিবানীর মুখে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া রাজীব বলিল: আচ্ছা, এখানে রেখে একটু বস। আমার এই অঙ্কটা শেষ করেই দেখছি।

শিবানী জিজ্ঞাসা করিল: তুমি অঙ্ক কষছ বুঝি রাজুদা? আবার কেঁচে গণ্ডুষ না কি?

খাতার পাতাতেই লক্ষ্য রাখিয়া রাজীব উত্তর করিল: কেন, তোমাকে ত কত বারই বলেছি শিবু, লেখা-পড়ার শেষ নেই! তবে এখন যা লিখছি, আর তোমাকে যা লিখতে দিয়েছি, দু'টোর সঙ্গে রীতিমত যোগাযোগ আছে।

রাজীবকে নীরব ও আরো গম্ভীর ভাবে লেখার কাজে মনোযোগ দিতে দেখিয়া শিবানীও নীরবে চেয়ারে গিয়া বসিল।

মিনিট কয়েক পরেই রাজীব খাতাখানি লইয়া রচনাটি মনে মনে পড়িতে লাগিল। শিবানীর বুকের ভিতরটা টিপ-টিপ করিয়া উঠিল। সে বুঝিতেছিল, তাহাকে একটা নূতনতম পরীক্ষার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। ইহাতে উত্তীর্ণ হইতে না পারিলে তাহার লজ্জা রাখিবার আর স্থান থাকিবে না।

মিনিট দশেকের মধ্যেই পড়া শেষ করিয়া রাজীব বিহসিত মুখে সপ্রশংস দৃষ্টিতে শিবানীর উদ্বিগ্ন মুখখানার দিকে চাহিতেই সে অমনি পুলকিত হইয়া উঠিল এবং সঙ্গে সঙ্গে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল: ঠিক হয়েছে? না—

রাজীব বলিল: এতখানি আমি প্রত্যাশা করিনি। সেদিনকার

সভার সব কথাই তুমি যে মন দিয়ে শুনেছ, আর বিদ্যা-ভারতীর প্রস্তাবটি যে তুমি ভাল করেই বুঝতে পেরেছ, তোমার লেখা পড়েই জেনেছি।

হাসিমুখে শিবানী বলিল : তাহলে আমি পাস করেছি ?

রাজীব বলিল : একেবারে প্রথম বিভাগে। এর পুরস্কার কি জান ?

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে রাজীবের দিকে চাহিয়া শিবানী বলিল : কি ?

রাজীব বলিল : এখন থেকে তোমাকেও মাষ্টারী করতে হবে।

বিস্ময়ের সুরে শিবানী বলিল : মাষ্টারী করতে হবে ?

সহজ ভাবেই রাজীব জানাইল : হ্যাঁ। একটু আগেই তোমাকে বলছিলুম না, তোমার লেখার সঙ্গে আমার খাতার এই লেখার রীতিমত যোগাযোগ আছে। এর মানে হচ্ছে—এই খাতাতেই আমি লিখছি, কিভাবে পাড়ায় পাড়ায় লেখা-পড়া ব্যাপক ভাবে চালাতে হবে। কোনো বাড়ীতে কেউ যাতে নিরক্ষর না থাকে—বাড়ী-বাড়ী ঘুরে তার ব্যবস্থা আমাদের করতে হবে। তুমি ঠিক কথাই লিখেছ, যার যতটুকু বিদ্যা, তাই দিয়ে সে তার পাড়াপড়শী নিরক্ষরদের অক্ষর চেনাতে পারে, প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ, পদ্যপাঠ, কথামালা আর ইংরিজী ফার্ষ্ট বুক পড়াবার মত বিদ্যা অনেকের পেটেই আছে। তাই আমরাও এ পাড়ায় তোমাকে দিয়েই মাষ্টারী সুরু করতে চাই। লেখায়-কথায় এক হতে হবে—যা লিখেছ, তাই করতে হবে। একটা বৈঠক বসিয়ে পাড়ার ছেলে-মেয়েদের তালিকা করা চাই—তা'তে জানা যাবে যে, কার কতখানি বিদ্যা ; আর বাড়ীর কাজকর্ম করেও কার পক্ষে কতটুকু সময় দেওয়া সম্ভব পাড়াপড়শী নিরক্ষর বয়স্কদের জন্যে।

শিবানী বলিল : তাহ'লে রাজুদা, পাড়ায়-পাড়ায় লেখা-পড়া শেখাবার একটা খুব হিড়িক পড়ে যাবে বলো !

রাজীব বলিল : সেটা কি উচিত নয় শিবু ? শিক্ষার ব্যাপারে যে যুগান্তকারী কাণ্ড আমাদের গ্রামে ঘটেছে, তা'তে শিক্ষার পথে আমরা

যদি সবার আগে পাড়ি জমাতে না পারি, তাহ'লে এর পর আমাদের আর লোক-সমাজে মুখ দেখানোই কঠিন হবে। সেই জন্যে গ্রামের বাসিন্দাদের অশিক্ষা প্রথমেই দূর করা চাই। এখন আমাদের নীতি হবে—'আপনি আচরি ধর্ম অন্যে শিখাইব'।

একটু আগে তরলা এ-বাড়ীতে আসিয়াছিল খিড়কীর দরজা দিয়া। শিবানীর পড়ার ঘরে যাইবার অভিপ্রায়ে ঘরখানির ভিতরের দিকের দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়াইতেই ভিতরের শিক্ষামূলক সংলাপ তাহার শ্রুতিস্পর্শ করে। কোন সাড়া না দিয়াই সে দরজার আড়াল হইতে উভয়ের কথোপকথন শুনিতে থাকে। রাজীবের কথা শেষ হইতেই সে ধীরে ধীরে ঘরের মধ্যে আসিয়া দৃঢ় স্বরে বলিল: আমাকে দেখে যেন চমকে উঠো না রাজুদা, আমিই বরং চমকে দেবার মত একটা খবর নিয়ে এখানে এসেছি।

শিবানী তাড়াতাড়ি উঠিয়া তরলাকে অভ্যর্থনা করিল, পাশের চেয়ার-খানির দিকে হাত বাড়াইয়া সহাস্যে বলিল: এস, তরলাদি! ব'স।

রাজীব গম্ভীর মুখে আগ্রহের স্বরে জিজ্ঞাসা করিল: কি ব্যাপার?

টেবিলের পাশের চেয়ারখানিতে বসিতে বসিতেই মুখ টিপিয়া হাসিয়া তরলা উত্তর দিল: ব্যাপার খুব গুরুতর রাজুদা! আগে এই চিঠিখানা পড়, তাহ'লেই বুঝতে পারবে।

খামে-মোড়া একখানা চিঠি তরলার মুষ্টি-মধ্যেই ছিল, তাড়াতাড়ি উঠিয়া সেখানা রাজীবের হাতে দিয়াই ফিরিয়া গিয়া চেয়ারে বসিল।

এক নিশ্বাসে চিঠিখানি পড়িয়া রাজীব ক্ষুব্ধ ভাবে বলিয়া উঠিল: কি সর্বনাশ! দেবাংশু বাবু এ কি করলেন?

কথাটা শুনিয়া শিবানীও চমকিত হইয়া রাজীবের পানে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাহিল। দেবাংশু যে তরলার স্বামী এবং কলিকাতার এক বিশিষ্ট

বৈদ্য-পরিবারের ছেলে, এ কথা রাজীবের অবিদিত ছিল না। সে বোম্বাই সহরে কোন বিখ্যাত চিত্র-প্রতিষ্ঠানে আলোক-শিল্পীরূপে খ্যাতিলাভ করিয়াছিল—এ সংবাদও এই পল্লীর অনেকেই জানে। সেই দেবাংশু সম্পর্কে রাজীবের এই উক্তি শুনিয়া তরলার পক্ষে স্তব্ধ ভাবে চাহিয়া থাকা খুবই স্বাভাবিক।

চিঠিখানি লিখিয়াছেন তরলার শ্বশুর কবিরাজ সুধাংশু দাশগুপ্ত। খুব সংক্ষেপে তিনি বধূকে জানাইয়াছেন যে, তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র দেবাংশুর এক প্রকার অপমৃত্যু ঘটিয়াছে ; অর্থাৎ সে বোম্বাইয়ের এক চিত্রাভিনেত্রীকে বিবাহ করিয়া আধুনিক উন্নততর আলোকশিল্প শিক্ষার্থ আমেরিকার হলিউডে গিয়াছে। ইহাকে অপমৃত্যু ছাড়া আর কি বলা যাইতে পারে ? এখন দেবাংশুর স্থলে তরলাকে তিনি একাধারে বধূ ও পুত্ররূপে গ্রহণ করিতে এবং সেই ভাবে প্রতিষ্ঠা দিতে প্রস্তুত আছেন। ইহাতে সম্মতি থাকিলে তরলা যেন অবিলম্বে কলিকাতায় চলিয়া আসেন।

রাজীব চিঠিখানি মনে মনে পড়িয়া পরে শিবানীকেও শুনাইয়া দিল। তাহার পর উভয়েই যুগপৎ তরলার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল, সেখানে কোন প্রকার চাঞ্চল্যের রেখা পড়ে নাই—একই ভাবে ঠায় সে বসিয়া আছে, চক্ষু দু'টিও বুঝি নিষ্পলক।

রাজীব সবিস্ময়ে বলিল : এমন খবর পেয়েও তুমি ঘরে ঢুকে যে ভাবে কথা বললে তরলাদি,—সেইটিই বড় কম বিস্ময়ের ব্যাপার নয় !

মৃদু হাসিয়া তরলা বলিল : কিন্তু আমার সংকল্প শুনলে একে আর তাজ্জব ব্যাপার বলে মনে হবে না, বরং খুশীই হবে রাজুদা ! চিঠিখানা পড়ে আমার শ্বশুরের জন্যে বরং একটু কষ্ট হয়েছে, কিন্তু তাঁর ছেলের জন্যে কোন দুঃখই আমার নেই। শ্বশুর তাঁর সম্বন্ধে যা লিখেছেন, সেইটিই ঠিক—সত্যই তাঁর অপমৃত্যু হয়েছে। এখন আমার মনে হচ্ছে রাজুদা, আমার পথও খুলে গেছে ; আর ভগবান তার সন্ধানও দিয়েছেন।

অশিক্ষা দূর করবার জন্য যে অভিযান তোমরা সুরু করচ, আমি তা'তেই লেগে পড়তে চাই—এতেই বাকী জীবনটা আমার কাটিয়ে দেব।

রাজীব কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া তাহার পর মৃদু স্বরে বলিল: কিন্তু তোমার শ্বশুর যখন ওভাবে ডেকেছেন, সেখানে ফিরে না গিয়ে এখানে থেকে আমাদের আন্দোলনে যোগ দেওয়া কি ঠিক হবে? তোমাকে পেলে আমাদের যে যথেষ্ট উপকার হবে—কাজ খুব এগিয়ে যাবে তাতে ভুল নেই, কিন্তু তোমার ভবিষ্যতের কথাও ভাবতে হবে দিদি!

দৃঢ় স্বরে তরলা উত্তর করিল: সেটা ভালো করে ভেবেই আমি পথ বেছে নিয়েছি রাজুদা, আমার কথাও যা, কাজও তাই—এর আর নড় চড় হবে না। আমার নাম তোমাদের তালিকায় লিখে নিতে পার।

শিবানী জিজ্ঞাসা করিল: কবিরাজ মামাকে বলেছ তরলাদি, তাঁর মত আছে?

তরলা বলিল: বাবা খবরটা পেয়ে একেবারে ভেঙে পড়েছেন।

মুখ টিপিয়া একটু হাসিয়া শিবানী বলিল: আর তুমি বুঝি ভেঙে পড়নি এ খবর পেয়ে?

কণ্ঠস্বরে জোর দিয়া তরলা বলিল: না—একটুও না; ভাঙবার মত মেয়ে আমি নই—আমার মাথায় ও মনে বরং আরো রোখ চেপে গেছে।

গম্ভীর মুখে রাজীব জিজ্ঞাসা করিল: কবিরাজ মামা কি বলেছেন তাই বল দিদি! অর্থাৎ তাঁর কি ইচ্ছা?

তরলা উদাস ভাবে বলিল: বাবা বললেন, আমার মাথায় কিছু আসছে না মা, তুমি বরং গাঙ্গুলী-বাড়ীতে গিয়ে বৌরাণীকে জিজ্ঞাসা কর; তিনি কি বলতে বলেন—সেটা শোনা আগে দরকার। বাবার ধারণা, বৌরাণীর চেয়ে ভাল যুক্তি আর কেউ দিতে পারবে না।

রাজীবও উৎসাহের সুরে বলিল: তোমার বাবা ঠিকই বলেছেন, আমারও এ-বেলাই ওখানে যাবার কথা আছে। বেশ ত, তুমিও

চলো না দিদি। যা কিছু করবার, তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করেই করা উচিত। আর তিনি যা বলবেন, সেইটিই তোমার পক্ষে ভালো হবে, তাতে কোন ভুল নেই।

মুখখানি শক্ত করিয়া তরলা বলিল: আমার সম্বন্ধে ভালো-মন্দ আমার চেয়ে আরো বেশী কে ভাববে বা বুঝবে বলতে পার রাজুদা? আমার কর্তব্য আমি ঠিক করে ফেলেছি। তবে, বাবা যখন বলেছেন, আর তুমিও বলছ—চলো, বিদ্যা-ভারতীর কাছে যাই—তিনি কি বলেন শুনি। কিন্তু আমিও বড় কম শক্ত মেয়ে নই রাজুদা, যে গোঁ ধরি, তা থেকে কেউ আমাকে ফেরাতে পারেনি এ পর্যন্ত, পারবেও না। মরবো, তবু মর্যাদা হারাবো না—এই হচ্ছে আমার কথা!

অন্য সময় অপর কোন ক্ষেত্রে হইলে, কোন মেয়ের মুখের এরূপ দৃঢ়তাব্যঞ্জক কথা, রাজীবকেও আকৃষ্ট করিত নিঃসন্দেহে। কিন্তু বর্তমানের পরিস্থিতিতে তরলার কথাগুলি তাহার মনে কোনও রূপ উত্তেজনার সৃষ্টি করিতে পারিল না, বরং মনে মনে সে অসহিষ্ণু হইয়া উঠিল।

এগারো

প্রাতরাশের পর বৌ-রাণীর মহল্লায় কর্তা হরিনারায়ণের প্রশ্ন সম্পর্কেই স্বামি-স্ত্রীর মধ্যে আলোচনা হইতেছিল।

গোবিন্দ বলিল: বাবার প্রকৃতির সঙ্গে আমার পরিচয় নেই বললেই চলে, তুমি তাঁকে যেমন করে চিনেছ—এক নতুন মা ছাড়া তেমন কেউ চিনতে পারেনি। কিন্তু তুমি কি মনে কর, তোমার ঐ দু'টো কথাতেই সব বলা হয়ে গেছে?

চণ্ডী উত্তর করিল: হ্যাঁ, আমার তাই মনে হয়।

গোবিন্দ পুনরায় প্রশ্ন করিল: কিন্তু শিক্ষার ব্যাপারে যে ব্যয়-বরাদ্দ করা হবে, তাঁর মতটা আগে নেওয়া কি ঠিক নয়?

প্রশান্ত মুখখানি কিঞ্চিৎ রুক্ষ করিয়া এবং অপলক দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের পানে চাহিয়া চণ্ডী কহিল : আর, তালুকের খানিকটা আয়ও যখন বাড়ানো হয়, বাবার মত নেওয়া হয়েছিল কি ?

কথাগুলি বলিয়াই চণ্ডী তাড়াতাড়ি উঠিয়া দালানটির দেওয়ালে আলম্বিত একখানি মানচিত্র খুলিয়া আনিয়া টেবিলের উপর প্রসারিত করিয়া দিল। তাহার পর পেনসিল দিয়া একটি স্থান চিহ্নিত করিয়া বলিলঃ এই ক'টা বন্দে প্রায় আড়াই শো বিঘে জমি বন-জঙ্গল হয়ে পড়েছিল, হালে এগুলো বন্দোবস্ত করে মোটা টাকা সেলামী পাওয়া গেছে, আর বছর শালিয়ানা বিঘে-প্রতি দশ টাকা হারে খাজনা পাওয়াও যাবে। এ ভাবে আয় বাড়ানোর জন্যে যদি কর্তার মত নেবার প্রয়োজন না হয়, ব্যয়-বরাদ্দের জন্যেই বা তার প্রয়োজন কেন হবে—বিশেষ করে একটা বছরের জন্যে সবি কিছু ভারই যখন আমার উপর তিনি দিয়েছেন ? এর পরও এ-সব ব্যাপারে তাঁকে জড়াতে যাওয়া মানে তাঁকেও ছোট করা, আর নিজেও ছোট হওয়া।

গোবিন্দ চুপ করিয়া শুনিতেছিল, চণ্ডীর কথা এখানে শেষ হইতেই সে একটু শুষ্ক হাসিয়া কহিল : খেয়ালের ঝোঁকে বাবা অমন অনেক কিছুই বলে থাকেন শুনেছি ; কিন্তু সে বলার সঙ্গে মনের মিল প্রায়ই থাকে না। সেই কথায় আছে না,'সর্বস্ব তোমার, কিন্তু চাবি-কাটিটি আমার'—এও ঠিক তাই।

চণ্ডীর চোখের দৃষ্টি পুনরায় রুক্ষ হইয়া উঠিল, কিন্তু তাহা মুহূর্তকালের জন্য ; পরক্ষণে নিজেকে সংবরণ করিয়া সহজ গলায় সে বলিল : সে দোষ ওঁর নয়, যাঁরা বরাবর ওঁর ঐ দোষের প্রতিবাদ না করে অবাধে প্রশ্রয় দিয়ে এসেছে—দোষ তাদেরই। আমি কিন্তু ওঁর কথার সঙ্গেই চাবি-কাটিটি চেয়ে নিয়েছি। তাই ওঁর জিজ্ঞাসার উত্তরেই আমাকে বলে আসতে হয়েছে—আপনার প্রতিশ্রুতি আর প্রকৃতির পানে চেয়েই আমি আমার কর্তব্য করে চলেছি।

একটু থামিয়া সম্মুখে প্রসারিত বাশুলী-এষ্টেটের মানচিত্রখানির দিকে গভীর দৃষ্টিতে চাহিয়া চণ্ডী বলিলঃ বাবার কাছে যে দিন ঐ প্রতিশ্রুতি পেয়েছি, সেই দিন থেকে বাশুলী-ষ্টেটের এই ম্যাপখানি আমার যেন জপমালা হয়েছে। এর প্রত্যেক দাগটি আমার হাতের আঙুলের নোখের উপর ছকে নিয়েছি। আমার দাদামশাই বলতেন, যে-কাজের পিছনে জোরালো যুক্তি আছে, নির্ভয়ে তার জন্যে এগিয়ে যাবে কোন বাধা-নিষেধ গ্রাহ্য না করেই। কাজ হাসিল হলে সকলের চোখ খুলে যাবে, কেউ আর কৈফিয়ৎ চাইতে সাহস করবে না।

গোবিন্দ মৃদু কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলঃ কিন্তু এখানে তোমার যুক্তিটা কি জানতে পারি?

স্বামীর মুখের পানে চাহিয়া সস্মিত মুখে চণ্ডী কহিলঃ তুমি কি সত্যিই তা বুঝতে পারনি, না—আমার কাছ থেকে স্পষ্ট করে জানতে চাইছ?

কথাগুলির সঙ্গে চণ্ডীর মুখের হাসি আরও সুস্পষ্ট হইল। সেই সঙ্গে গোবিন্দও হাসিল এবং সহাস্যে উত্তর করিলঃ তুমি ত জান, তোমার মত ইঙ্গিতেই কথা বুঝবার মত প্রতিভা আমার এখনো আসেনি, ছাত্র-সুলভ মনোবৃত্তি এখনো রয়েছে কি না, তাই খুব স্পষ্ট করে না বলে দিলে সব কথা তলিয়ে বুঝতে পারি না।

স্বামীর স্বচ্ছ মুখের দিকে ক্ষণকাল নীরবে চাহিয়া থাকিয়া অত্যন্ত স্নিগ্ধস্বরে চণ্ডী কহিলঃ আমি জানি, বাবার সম্বন্ধে তুমি এখনো নিশ্চিন্ত নও, পাছে তাঁর খেয়ালী মন হঠাৎ অধৈর্য হয়ে বিপর্যয় কিছু বাধিয়ে বসে, এই ভয়ে তুমি আমাকে কোন ঝঞ্ঝাটের মধ্যে যেতে দিতে চাও না। কিন্তু আমার স্বভাব হচ্ছে ঝড়-ঝঞ্ঝার ভিতর দিয়ে ছুটে যাওয়া, তাতেই আমার আনন্দ। হ্যাঁ, এখন তোমার কথার জবাব দিই। সত্যিই আমি একটা সুযুক্তি ঠিক করেই তবে এত বড় ঝক্কি মাথায় নিয়েছি। আমি কি ঠিক

করেছি জানো? শিক্ষা বিস্তার আর গ্রামে গ্রামে গ্রন্থাগার খোলবার ব্যাপারে যে টাকা আমি খরচ করব, সেই পরিমাণে তালুকের আয়ও বাড়াব। আয়ের টাকা ব্যয় করে যদি তালুকের সাংস্কৃতিক উন্নতি করতে পারা যায়, সে ত মন্দ কথা নয়! তাছাড়া, বাবার প্রকৃতি আমি জেনেছি, আমি ওঁকে চিনেছি; তার কারণ, আমাদের দু'জনের প্রকৃতির মধ্যে এমন কতকগুলো জেদ আছে, তার কতক কতক মিলে যায়। তবে বাবার জেদগুলো চলে খেয়ালের তালে-তালে, আর আমার জেদের পিছনে থাকে জোরালো যুক্তি। তুমি আমার জন্যে কিছুই ভেব না; আর যদিই এমন হয়—সত্যিই ওঁর বিষদৃষ্টিতে পড়ি, তার জন্যে বাগুলীর প্রাসাদ থেকে সরে গিয়েও আমরা কোন রকমে জীবিকার সংস্থান নিশ্চয়ই করতে পারব। তবে কেন অনর্থক ভেবে সুস্থ শরীরকে বিব্রত করব!

এই সময় বাহিরে বার-দুই স্বেচ্ছাকৃত কাশির শব্দ উঠিতেই চণ্ডী তাড়াতাড়ি কহিল: কাকাবাবু আসছেন।

পরক্ষণে উঠিয়া দরজার দিকে চাহিয়া চণ্ডী কহিল: কাকাবাবু, আসুন।

আহ্বান পাইবা মাত্র রাধানাথ বাপুলী দালানে প্রবেশ করিলেন। গোবিন্দ স্মিত মুখে বলিল: বসুন, কাকাবাবু!

আসন গ্রহণ করিয়া গম্ভীর মুখে বাপুলী মহাশয় কহিলেন: বড়ই মুস্কিলে পড়া গেছে এই শশী ডাক্তারকে নিয়ে।

গোবিন্দ জিজ্ঞাসা করিল: আবার তিনি কি করলেন কাকাবাবু?

মুখখানা কঠিন করিয়া বাপুলী কহিলেন: আর কি, পুকুর গুলিয়ে বেড়াচ্ছেন। আমি এইটুকু ভেবে আশ্চর্য হচ্ছি বাবাজী, এম-বি উপাধিওয়ালা এক জন ঝুনো ডাক্তার—যাঁর বানপ্রস্থ অবলম্বনের সময় হয়েছে, শেষ বয়সে এখানকার এই চাকরীটা বাগাবার জন্যে নির্লজ্জের মতন কি করে এভাবে উমেদারী করে বেড়াচ্ছেন!

গোবিন্দ একটু গম্ভীর হইয়া বলিল: সত্যিই এ-এক মহা ঝঞ্ঝাট হয়ে

দাঁড়িয়েছে কাকাবাবু! আমার মনে হয় কি জানেন, এঁকেই চাকরীটা দিয়ে হাঙ্গামার নিষ্পত্তি করাই ভাল ছিল।

চণ্ডী নীরবেই শুনিতেছিল ইহাদের কথোপকথন; এই সময় সে দৃঢ় স্বরে বলিয়া উঠিল: তার মানে—যোগ্যতার বিচার না করে সুপারিশকেই মেনে নেওয়া। কিন্তু এ ভাবে অন্যায়কে প্রশ্রয় দেওয়া আপনি কি উচিত বলেন কাকাবাবু?

বাপুলীও শক্ত হইয়া বলিলেন: অন্যায়কে প্রশ্রয় দিতে কি করে বলব মা! বিশেষ, একজন ভদ্রলোককে যখন আসবার জন্যে লেখাও হয়েছে। আমার শুধু এই আশঙ্কা হচ্ছে মা, এই সামান্য ব্যাপার নিয়ে যদি নতুন মা'র সঙ্গে আবার একটা…

চণ্ডী তাড়াতাড়ি কথাটায় বাধা দিয়া বলিল: কেন কাকাবাবু, সেই জন্যেই ত আমি কমিটীর উপরেই এ ভার দিয়েছি। দু'জন প্রতিযোগীর মধ্যে তাঁরা যাঁকে বেশী উপযুক্ত মনে করবেন, তাঁকেই বাহাল করবেন।

বাপুলী বলিলেন: তুমি ত বরাবরই নীতির পথেই চলেছ মা, তোমার উপরেই যখন সমস্ত ভার কর্তা চাপিয়ে দিয়েছেন, বাহাল বরতরফ সবই ত তোমার এক্তিয়ারে। তবুও তুমি কমিটির হাতেই ভার দিয়েছ! কিন্তু ওদিকের ব্যাপার কি জান মা, যখন রাণীর বাপের এষ্টেটের লোক উনি, আর নিজেই সুপারিশ করেছেন, তখন—

চণ্ডী বলিল: সে আমি বুঝিছি কাকাবাবু! ঐ ভেবে ইনিও এইমাত্র বললেন যে, এই ডাক্তারকেই চাকরীটা দিয়ে হাঙ্গামার নিষ্পত্তি করাই ভাল ছিল। কিন্তু আমার মত হচ্ছে কাকাবাবু, আলাদা; আগুনে হাত-পা পুড়ে যায় বলে আগুনের ত্রিসীমানায় যাব না—সে লোক আমি নই। যে ভার আমি নিয়েছি হাত পেতে—আমার হাত দিয়ে তাকে খাটো করতে পারব না।

বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখে চণ্ডীর মুখের দিকে চাহিয়া বাপুলী কহিলেন:

তোমার মুখেই এ কথা সাজে মা, আর তুমি যা বলেছ এতে অন্যায় কিছু নেই। তাহ'লে মা, আসছে মাসের ছ তারিখে বেলা দশটার সময় এ কাজটা সেরে ফেলবার ব্যবস্থা করতে চাই।

চণ্ডী বলিল: তাই করুন। তাহ'লে আজই কলকাতায় প্রতাপবাবুর ঠিকানায় খবরটা পাঠান; এখানেও যাঁদের জানানো দরকার, তাঁদের নামের একটা তালিকা করুন। শশীবাবুকেও জানাবেন। আর প্রতাপবাবুকে আসবার জন্যে একটা তারও করে দিন; কেন না, মাঝে বেশী দিন নেই, চিঠির গোলমাল হতেও পারে।

বাপুলী হাসিয়া বলিলেন: দেখছি, সব দিকেই তোমার সূক্ষ্ম তীক্ষ্ণদৃষ্টি মা! আর তোমার কাছে কাজ করেও আনন্দ আছে। আজই আমি সব ব্যবস্থা করে ফেলছি।

এই সময় বাহিরে কতকগুলি পদশব্দ হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে দ্বারপ্রান্ত হইতে রাজীবের পরিচিত কণ্ঠস্বর শোনা গেল: আমরা এসেছি—ভিতরে যাব কি?

চণ্ডী স্বামীর দিকে চাহিয়া চোখের ইঙ্গিত করিতেই গোবিন্দ বলিয়া উঠিল: আসুন রাজীববাবু, ভিতরে আসুন।

পরক্ষণে রাজীব, তরলা ও শিবানী দালানের মধ্যে প্রবেশ করিল। চণ্ডীও সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া তাহাদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইল।

রাজীব কোনরূপ ভূমিকা না করিয়া বলিল: আমার উপরে যে ভার পড়েছিল, তার একটা খসড়া করেছি। আগে আমাদের এই গ্রামখানাকেই ভালো করে ছকিছি।

চণ্ডী জিজ্ঞাসা করিল: কিন্তু কি ভাবে ছকেছেন রাজীববাবু?

হাতে পাকানো কাগজখানির ভাঁজ খুলিয়া রাজীব বলিতে লাগিল: বাগুলী গ্রামে সবশুদ্ধ এগারোটা পাড়া; এর এক-একটা পাড়া ধরে আমি হিসেব ধরিছি—যেমন করে লোক-গণনার সময় বাড়ী-বাড়ী নম্বর

দিয়ে দাগ কেটে বাড়ীতে বাসিন্দাদের হিসেব নেওয়া হয়। প্রত্যেক বাড়ীতে কত লোক; তার মধ্যে ক'জন শিক্ষিত, অর্থাৎ ভাল ভাবে লেখা-পড়া জানে, সে শিক্ষার কি রকম মান; কে কে সামান্য লেখা-পড়া জানে—তারও পরিমাণ। তার পর যারা একেবারে নিরক্ষর তাদেরও একটা তালিকা; এইটের উপরই আমাদের বেশী করে জোর দিতে হবে। এমনি করে এক-একটি পাড়ার প্রত্যেক বাড়ী ধরে শিক্ষিত, অর্দ্ধ-শিক্ষিত ও অশিক্ষিতদের হিসেব তোলবার ব্যবস্থা করেছি। আপনি এই কাগজগুলো দেখলেই সব বুঝতে পারবেন।

লেখা কাগজগুলি লইয়া চণ্ডী পড়িতে পড়িতে স্বামীর দৃষ্টিও সেগুলিতে আকৃষ্ট করিল। তাহার পর সেগুলি বাপুলীর হাতে দিয়া বলিল: কাকা-বাবু, আপনিও একবার দেখুন। আমারও মনে হচ্ছে, ভালো পরিকল্পনাই হয়েছে।

বাপুলী নিবিষ্ট মনে কাগজগুলি দেখিতে লাগিলেন। এই অবসরে রাজীব বলিল: এরই মধ্যে আমাদের পাড়া থেকে জনকয়েক এমন ছেলে-মেয়ে পেয়েছি, যারা ভালো ভাবেই গোড়ার কাজ এগিয়ে দিতে পারবে। তাদের সময় আছে, শিক্ষা দেবার মত বিদ্যা আছে, প্রচুর আগ্রহ আছে, আর বাড়ীতে খাওয়া পরার সংস্থানও আছে।

চণ্ডী বলিল: সে ত খুব ভাল কথা, নিজেদের পাড়াকে জাগাবার ভার নিজেদের হাতে নেওয়ার চেয়ে ভাল ব্যবস্থা আর কি হতে পারে? এঁদের উপরে এক জন কৃতবিদ্য পরিদর্শক রাখলেই যথেষ্ট হবে। তবে এটাও দেখবেন, যাঁদের সাংসারিক অবস্থা অসচ্ছল, তাঁদের সম্বন্ধেও আমরা এমন ব্যবস্থা করব—যাতে তাঁদের কষ্ট পেতে বা অসুবিধায় পড়তে না হয়। কাকাবাবু, আপনার কি মনে হয়?

বাপুলী বলিলেন: পরিকল্পনা খুব ভালোই হয়েছে মা! তবে একটা কথা হচ্ছে, পাড়াগাঁয়ে সাধারণের অবস্থা ত জানো, এমন অনেক বাড়ীও

আছে, যেখানে পড়া-শোনার ব্যবস্থা করবার মত জায়গার অভাব। এ গ্রামের অবস্থা হয়ত অনেক উন্নত নানা কারণে, কিন্তু আর সব গ্রামে এমন বাড়ী অনেক আছে, কোন রকমে তারা মাথা গুঁজেই থাকে। তাই আমার মনে হয়, সাধারণের শিক্ষার সুবিধার জন্যে গ্রামের মাঝখানে এমন ভাবে এক-একটা পাঠশালা বসানো চাই—গ্রামের বেশীর ভাগ গৃহস্থদের সুবিধার দিকে চেয়ে যেখানে শিক্ষার সময় নির্ধারিত করা হবে, আর আলাদা আলাদা সময়ে পুরুষদের ও মেয়েদের নিয়ে শিক্ষার কাজ চলবে। ধরো—সংসারের খাওয়া-দাওয়ার পাঠ সব চুকে গেলে দিনের বেলায় মেয়েরা সেই পাঠশালায় এসে পড়বে—তাদের পড়াবার ভার নেবে আমাদের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের মেয়ে শিক্ষয়িত্রীরা ; আবার সন্ধ্যার পর পুরুষদের শিক্ষা দেবার জন্য নৈশ পাঠশালা বসানো হবে। সেখানে শিক্ষকতা করবে পুরুষ শিক্ষকরা।

বাপুলীর প্রস্তাবটি সকলেই সাগ্রহে শুনিতেছিল। চণ্ডী বলিল : কাকাবাবু, আপনি খুব ভাল প্রস্তাবই করেছেন। সাধারণের পক্ষে শিক্ষার এইটিই সুবিধাজনক ব্যবস্থা। রাজীববাবু, আপনার খসড়ায় কাকাবাবুর প্রস্তাবটি টুকে নেবেন।

রাজীব এই সময় বলিল : আমরা আর একটা জটিল ব্যাপারের ব্যবস্থা নেবার জন্যে এখানে এসেছি। আমাদের এই শিক্ষা-ব্যবস্থার সঙ্গেও তার সম্বন্ধ আছে। বাপুলী মশাইও রয়েছেন, উনিও কথাটি শুনে সুপরামর্শ দিতে পারবেন।

গোবিন্দ জিজ্ঞাসা করিল : কি ব্যাপার রাজীববাবু—ভূমিকাটি শুনেই যে মনে কেমন যেন সন্দেহ জাগছে !

রাজীব বলিল : ব্যাপারটি খুবই জটিল, আর সেটি এই তরলাদি'কে নিয়ে। আপনারা হয় ত জানেন না, তরলার স্বামী বোম্বাই সহরে কোন সিনেমা ষ্টুডিওতে ক্যামেরা-ম্যানের কাজ করতেন। এ ব্যাপারে আরো

পাকা-পোক্ত করবার জন্য কর্তৃপক্ষ তাঁকে হলিউডে পাঠান। সম্প্রতি তরলার শ্বশুর তরলাকে এক চিঠি লিখে জানিয়েছেন যে, তাঁর ছেলে বোম্বের এক ফিলিম-য়্যাকট্রেসকে বিবাহ করে তাকে নিয়ে আমেরিকায় গেছেন।

গোবিন্দ সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল: সে কি!

চণ্ডী এবং বাপুলীও বিস্ময়াপন্ন হইয়া নীরবে যুগপৎ তরলার দিকে চাহিয়া রহিলেন। রাজীব এই সময় তরলার শ্বশুরের পত্রখানি পাঠ করিয়া সকলকে শুনাইয়া দিল।

কিছুক্ষণ সকলেই স্তব্ধ ভাবে বসিয়া রহিলেন, কাহারও মুখে কথা নাই। এই অনিন্দ্যসুন্দরী শিক্ষিতা মেয়েটির দুর্ভাগ্যের কথাগুলি প্রত্যেকের মনেই একটা প্রচণ্ড আঘাত দিয়া গেল।

খানিক পরে চণ্ডীই প্রথমে সহানুভূতির স্বরে জিজ্ঞাসা করিল: আচ্ছা, দেবাংশুবাবু নিজে আপনাকে কিছু লিখেছেন কি?

তরলা সপ্রতিভ ভাবে মুখখানা তুলিয়া উত্তর করিল: সে প্রায় মাস-তুই আগেকার কথা, কলকাতায় থাকতে বোম্বাই থেকে তাঁর এক চিঠি পেয়েছিলাম। তাতে তিনি লিখেছিলেন—এদেশ তাঁর নাকি ভাল লাগছে না, তাই তিনি শীগ্‌গির হলিউডে যাবেন। আমি ইচ্ছা করলে তাঁর সঙ্গে যেতে পারি। সেখানে আমারও নাকি শেখবার অনেক কিছু আছে।

চণ্ডী পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল: আপনি সে চিঠির জবাব তাঁকে দিয়েছিলেন?

গম্ভীর মুখে তরলা ধীরে ধীরে উত্তর করিল: হ্যাঁ, আমি লিখেছিলাম, নিজের দেশ যাঁর চোখে ভাল লাগে না, নিজের স্ত্রীও তাহলে তাঁর চোখে ভালো লাগতে পারে না। তারপর, আপনার দেশের শিক্ষাই ভালো করে যেখানে পাইনি, বিদেশে কিসের শিক্ষা নিতে যাব?

এ চিঠির জবাব তিনি দিয়েছিলেন?

এর পর আমাকে তাঁর শেষ পত্রে জানিয়েছিলেন—তাহলে দেশের শিক্ষাতেই জীবনটা কাটিয়ে দাও; এর জন্যে আমাকে দোষী ক'র না। তার পরই আমি এখানে চলে আসি। আর গত কাল এই চিঠি আমি পেয়েছি আমার শ্বশুরের কাছ থেকে।

নীরবে ক্ষণকাল চণ্ডী মনে-মনে কি ভাবিয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল: আপনি কিছু স্থির করেছেন আপনার শ্বশুরের চিঠি সম্বন্ধে?

দৃঢ় স্বরে তরলা উত্তর করিল: হ্যাঁ, আমি স্থির করেছি, স্বামীর স্মৃতি মুছে ফেলে এখানেই থাকব, আর আপনি যে অশিক্ষার বিরুদ্ধে অভিযান চালাবার আয়োজন করছেন, তাতেই আমি যোগ দেব।

রাজীব এই সময় বলিল: কিন্তু তরলাদির বাবা ওঁকে এ সম্বন্ধে আপনার কি মত, সেটা আগে জানতে বলেছেন। ওঁর জীবনটা এ ভাবে ব্যর্থ হয়, এ আমরা কেউ চাই নে। এখন আপনিই এ ব্যাপারে ওঁকে আসল পথের সন্ধান দিতে পারেন—আপনার কথার উপরেই সব নির্ভর করছে।

সেখানে উপস্থিত সকলের কৌতূহলী দৃষ্টি একসঙ্গে চণ্ডীর মুখের উপর নিবদ্ধ হইল—এই চরম সমস্যার কি সমাধান সে করে, স্বামী পরিত্যক্তা বধূকে কোন পথের সন্ধান এখন দেয়!

স্থির শান্ত দৃষ্টি তরলার মুখে নিবদ্ধ করিয়া চণ্ডী সংযত কণ্ঠে কহিল: দেখুন, আপনার জীবনে এমন একটা কঠিন সমস্যা এসেছে, আমাদের জীবন-যাত্রায় সহসা যা দেখা দেয় না; কাজেই, স্বামীর উপর অভিমান করে আপনার শ্বশুরের আহ্বানে সাড়া না দিয়ে এখনি কিছু সাব্যস্ত করা আপনার উচিত নয়।

তরলা ভাবিয়াছিল, তাহার সংকল্প সম্বন্ধে চণ্ডীই সর্বাগ্রে আগ্রহ সহকারে সমর্থন করিবে। কিন্তু সে স্থলে তাহার মুখে এই ধরণের কথা শুনিয়া সে একটু ক্ষুণ্ণ হইল এবং রুক্ষস্বরে প্রশ্ন করিল: কেন?

অত্যন্ত সহজ কণ্ঠে চণ্ডী উত্তর দিল: আমাদের সমাজ ত কেবল স্বামী-স্ত্রী নিয়ে নয়—স্বামী-সংক্রান্ত আত্মীয়-পরিজনদেরও আমরা অস্বীকার করতে পারি না, তাঁদের কথাও ভাবতে হয়। কিন্তু আপনি ওদিকে তাকাতে একেবারেই ভুলে গেছেন; স্বামীর উপর অভিমান ক'রে তাঁর স্মৃতি পর্যন্ত মন থেকে মুছে ফেলবার সিদ্ধান্তই মেনে নিয়েছেন; অথচ, আপনার পূজনীয় শ্বশুরমশাই যে আপনাকে আন্তরিকতার সঙ্গে ডেকেছেন—তাঁর সংসারে ঐ পথভ্রষ্ট পুত্রের স্থানে আপনাকে বসিয়ে প্রতিষ্ঠা দিতে চেয়েছেন, সেটা আপনি গ্রাহ্যই করছেন না—এর আবশ্যক আছে বলেও ভাবছেন না। এখন আপনার উচিত হচ্ছে—এ সম্বন্ধে আগে বিবেচনা করা।

কিছু মাত্র না ভাবিয়া তেমনি ক্ষুব্ধকণ্ঠে তরলা বলিয়া উঠিল: না—স্বামী যখন আমাকে ত্যাগ করেছেন, তখন ও পক্ষের কারো সঙ্গে কোন সম্পর্কই আমি রাখতে চাই না; আমার যা বিবেচনা, আগেই করিছি।

হাসিবার মত মুখভঙ্গি করিয়া চণ্ডী মৃদু স্বরে কহিল: এ আপনার রাগের কথা। এখানে ত্যাগের কথা উঠতেই পারে না। হিন্দুর বিবাহ অবিচ্ছেদ্য; এখানে স্বামি-স্ত্রী আজীবন দাম্পত্যবন্ধনে আবদ্ধ থাকতে বাধ্য। স্বামীর পক্ষ থেকে ভুলচুক হলে স্বামীর উপর স্ত্রীর অভিমান করাটাই ত বড় কথা নয়, তাঁকে ফিরে পাবার সাধনাই সে ক্ষেত্রে স্ত্রীর পক্ষে পরম সার্থকতা।

কথা মৃদু, কিন্তু তীরের ফলার মত তীক্ষ্ণ। তরলার মনে হইল, আজ এই শ্রদ্ধাশীলা মহিলার কথাগুলি যেন তাহার ত্বকে বিঁধিয়া জ্বালার সৃষ্টি করিতেছে। সেও জ্বালাময়ী দৃষ্টিতে চণ্ডীর মুখের পানে চাহিয়া নালিশ করিবার ভঙ্গিতে কহিল: এ কথা আপনি বলছেন বৌরাণী? স্বামীদত্ত অপমান-লাঞ্ছনা সহ্য করেও স্ত্রীকে তপস্যায় বসতে হবে স্বামী দেবতা অনুগ্রহ করে পুনরায় যাতে গ্রহণ করেন এই আশায়? এক দিন হয়ত এটা

সম্ভব ছিল, এখনো স্থলবিশেষে সম্ভব থাকতে পারে, কিন্তু যে স্ত্রীর মনে শিক্ষার আলো পড়েছে—আত্ম-প্রতিষ্ঠ হবার সাহস যার আছে, সে কি ভুলেও কল্পনা করতে পারে, স্বামীর উপর প্রতিশোধ না নিয়ে তাঁকে ফিরে পাবার জন্যে উপযাচিকা হয়ে তোষামোদ করতে হবে?

তেমনি স্নিগ্ধ স্বরে ও অত্যন্ত সহজ ভাবে চণ্ডী উত্তর করিল: আপনি যদি মনে করে থাকেন, নিজে কোন রকমে আত্মপ্রতিষ্ঠ হয়ে স্বামীদত্ত এই অপমানের প্রতিশোধ নেবেন, তাতে কিন্তু আপনার নারী-মর্যাদাই ক্ষুণ্ণ হবে।

অন্তরে জ্বলিয়া তরলা নীরস কণ্ঠে এবার প্রতিবাদের ভঙ্গিতে কহিল: না; আপনি বলতে চাইছেন—স্বামী সম্পর্ক ত্যাগ করে আত্মপ্রতিষ্ঠ হওয়া নারীর পক্ষে সম্মানের নয়। কিন্তু নিজের আত্মসম্মান জ্ঞানের দিকে চেয়ে এ অসম্মানকে আমি গৌরব বলেই মনে করি। আমি এই আত্মপ্রতিষ্ঠার দিকে একমুখী হয়ে—একটি মাত্র দিকে আত্মস্থ হয়ে স্বামীর চিন্তাকে পর্যন্ত ত্যাগ করতে পারি তা জানেন?

বিস্ফারিত চোখে তরলার মুখের দিকে চাহিয়া সহাস্যে চণ্ডী বলিল: কিন্তু নারী-জীবনের সেই একটি মাত্র দিক যে স্বামী। আপনি যে কোন কাজেই লিপ্ত হোন না কেন, আপনার মনটিকে ফেলে রাখতে হবে স্বামীর দিকে তা তিনি যেখানেই থাকুন না কেন—এই কথাই আমি বলতে চেয়েছি।

তীক্ষ্ণ স্বরে তরলা বলিল: সে আমি পারব না—কিছুতেই না; এত বড় ফাঁকি মেনে নিয়ে নিজের মনের সঙ্গে এভাবে প্রতারণা করা আমার দ্বারা হবে না। আমার শ্বশুরের চিঠি পেয়েই সঙ্গে সঙ্গে আমি সংকল্প স্থির করে ফেলেছি, এর আর পরিবর্তন হতে পারে না—আপনিও আমাকে সে জন্যে অনুরোধ না করলেই সুখী হব।

চণ্ডীর মুখখানি এই সময় একটু কঠিন হইয়া উঠিল, কণ্ঠস্বর পূর্ববৎ স্বচ্ছ হইলেও ইহার প্রকাশ-ভঙ্গি অনুরূপ—কানে যাহার সুর লাগিয়া থাকে। সেই মর্মস্পর্শী স্বরে চণ্ডী কহিল: কিন্তু আপনার সংকল্পেই যে

ফাঁক থেকে যাচ্ছে—সেটা বোধ হয় আপনি লক্ষ্য করেননি। আপনার শ্বশুরের পত্র যখন আমাকে শুনিয়েছেন, আর আপনার বাবাও এ-সম্বন্ধে আমার কি মত জানতে চেয়েছেন, তখন আমার যুক্তিকেও আপনার উপেক্ষা করা ঠিক নয়।

ধৈর্য হারাইয়া তরলাও এই সময় উত্তেজিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল: তাহ'লে দয়া করে আপনি আমার এই প্রশ্নের উত্তর দিন—আমার মত ঠিক এই রকম অবস্থায় পড়লে আপনি কি করতেন?

প্রশ্নটি অনেককেই উৎকণ্ঠিত করিয়া তুলিল, কেহ কেহ লজ্জানুভবও করিলেন। কিন্তু যাহার উদ্দেশে এই প্রশ্ন, তাহার মুখে পরিবর্তনের কোন চিহ্নই দেখা গেল না। ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া তাহার পর ধীরে ধীরে সে বলিল: আমার জীবনে যে সমস্যা এসেছিল, সে ত জানেন আপনি—তবুও যখন প্রশ্ন তুলেছেন, এর উত্তর আমাকে দিতেই হবে। আর সত্য কথা বলতে কি, আপনাকে এ-সম্বন্ধে যে সব কথা এতক্ষণ বলেছি, সেগুলি ভালো করে বুঝলে তার মধ্যেই আপনি উত্তর পেতেন। দেখুন, সংসারে দাম্পত্য-জীবনে একটা খুব দামী কথা হচ্ছে—একনিষ্ঠ প্রেমের আদর্শ কখনো ব্যর্থ হয় না, সে চিরসত্য। আমি যদি আপনার অবস্থায় পড়তাম, তা'হলেও স্বামীকে স্বীকার ক'রে তাঁর প্রতি নিষ্ঠা বজায় রেখে আমি কাজ করে যেতাম। আমি শ্বশুরকে বলতাম, তিনি অপমৃত্যু বরণ করেননি বাবা—পথ হারিয়ে উপপাতক হয়েছেন; আমাদের কর্তব্য হবে, আলো দেখিয়ে তাঁকে ভুল পথ থেকে ফিরিয়ে আনা। আমি একসঙ্গে তাঁর পুত্র ও বধূ হয়ে শ্বশুরের পাশে দাঁড়িয়ে এমন ভাবে কাজ করতাম, কেউ যাতে বলবার সুযোগ না পায় যে, আমি আত্মবঞ্চনা করছি। আমার সেই নিষ্ঠাই স্বামীর ভুল সংশোধনের উপায় হ'ত। দিক্‌ভ্রান্ত নাবিক অকূলে আলোর সংকেত পেয়ে যেমন দিক্ নির্ণয় করতে পারে, আমার নিষ্ঠার আলোই তাঁকে পথ দেখিয়ে ফিরিয়ে আনত নিশ্চয়ই।

তন্ময় হইয়া সকলেই চণ্ডীর কথা শুনিতেছিল। তরলা এই সময় একটু আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল: আপনি তা'হলে আপনার বাবার আশ্রয় ত্যাগ করে শ্বশুরের কাছেই আশ্রয় নিতেন?

চণ্ডী ঘাড় নাড়িয়া সহাস্যে উত্তর করিল: নিশ্চয়ই। বিবাহিতা নারীর পক্ষে এর চেয়ে গৌরবের আশ্রয় আর কোথায় আছে বলতে পারেন? আগেই ত আপনাকে বলেছি, স্বামি-স্ত্রী নিয়েই কেবল মাত্র আমাদের সমাজ নয়, সম্পর্কও নয়। স্বামী ছাড়াও শ্বশুর-শাশুড়ী ভাসুর-দেবর এই সব ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের পরিজনবর্গ আছেন বলেই আমাদের সমাজ এত বড়। ও-দেশে এ সব বালাই নেই, তাই স্ত্রী একমাত্র স্বামীকেই নির্ভর করতে বাধ্য হয়, তাই স্বামীর অভাবে তাকে উপ-বিবাহের নামে অন্যের আশ্রয় নিতে হয়। কিন্তু আমাদের দেশের সমাজ-স্রষ্টারা স্ত্রীকে কুলবধূর মর্যাদা দিয়েছেন—স্বামীর অভাবেও বধূর মর্যাদা এখানে কোন দিক দিয়েই নষ্ট হবার কথা নয়।

এ পর্যন্ত সকলেই সাগ্রহে সমবয়স্কা এই দুইটি বাক্‌পটীয়সী নারীর সংলাপ শুনিতেছিল, অন্য কেহ কোন কথা তুলে নাই। এই সময় রাজীব সহসা একটি প্রশ্ন করিল: আপনার যুক্তিগুলি আমি স্তব্ধ হয়েই এতক্ষণ শুনছিলাম, কিন্তু স্বামীর অভাবেও বধূর মর্যাদা সম্বন্ধে আপনি যা বললেন, সে সম্বন্ধে আমার একটি প্রশ্ন আছে, যদি অনুমতি করেন ত নিবেদন করি।

প্রসন্ন ভাবে স্মিতমুখে চণ্ডী বলিল: আপনার সংকোচের ত কারণ নেই রাজীববাবু! আমার প্রত্যেক কথাটি যে অভ্রান্ত, আর নির্বিচারে মেনে নিতে হবে—এমন আশা আমিও করি নে। যেখানে সন্দেহ হবে জিজ্ঞাসা করবেন বৈ কি, আমিও তাতে সন্তুষ্টই হব। আপনি বলুন।

রাজীব সবিনয়ে বলিতে লাগিল: নারীর আত্ম-প্রতিষ্ঠায় নিষ্ঠার যে কথা বললেন, তাতে বোধ হয় সন্দেহ করবার কিছু নেই। তার কারণ, আপনি নিজেই আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে সেটা দেখিয়ে দিয়েছেন।

কিন্তু স্বামীর অভাবে বধূর আত্মপ্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। যে উদ্দেশ্যে আমাদের সমাজ-স্রষ্টারা বধূ সম্পর্কে এই সামাজিক ব্যবস্থা দিয়ে গেছেন, এখন তা শিথিল হয়ে গেছে ; স্বামীর অভাবে তাকেই হতে হয়েছে সর্বহারা অভাগিনী। এই জন্যেই অনেকে শ্বশুরের আশ্রয়—স্বামীর ভিটা ত্যাগ করে আবাল্যের পরিচিত পিতৃগৃহে ফিরে আসে ; এর বহু দৃষ্টান্তই পাওয়া যায়।

রাজীবের কথাগুলি শুনিতে শুনিতেই চণ্ডীর মুখে হাসির রেখা ফুটিতেছিল ; কথা শেষ হইলে সে বলিল : আপনার কথা আমি অস্বীকার করছি না রাজীববাবু। স্বামীর অভাবকে বধূদের এই দুরবস্থার জন্য যতখানি দায়ী স্বামীর সংসারের পরিজনেরা, ততখানি দায়ী—শিক্ষা সম্পর্কে উভয় পক্ষের দীনতা। যে শিক্ষা মানুষকে নারীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে তোলে, সে শিক্ষার আলো পুরুষদের অন্তরে কোন দিন পড়েনি ; আবার যে শিক্ষা নারীকে করে আত্মপ্রতিষ্ঠ, নারীরা তা থেকে একেবারেই বঞ্চিত। যেখানে এর ব্যতিক্রম আছে, সেখানেই অবস্থারও ব্যতিক্রম হয়েছে। এমন ব্যাপারও অনেক দেখা গেছে—স্বামীর স্মৃতির প্রতি নিষ্ঠার অভাবের জন্যই অনেক সময় স্বামীগৃহে স্থিতির সুযোগ পেয়েও পিতৃগৃহের আকর্ষণে বধূ তাকে উপেক্ষা করেছে ; এমনি, স্বামীর পরিজনরাও বধূর অসহায় অবস্থার সুযোগ নিয়ে তাকে বঞ্চিত করেছে স্বামীর গৃহ থেকে। এ ক্ষেত্রে চাই শিক্ষা, সেই সঙ্গে মানসিক নিষ্ঠা। আমরা যে শিক্ষার প্রচার করতে চেয়েছি, তাতে প্রত্যেক মেয়েকে আত্মপ্রতিষ্ঠ আর পুরুষকে সে সম্পর্কে সহায়ক হবার নির্দেশ থাকবে। এই যে তরলা দেবী স্বামী ও শ্বশুরের সম্পর্ক ছিন্ন করে আমাদের শিক্ষার ব্যাপারে আসতে চাইছেন, কিন্তু আমার মনে হয় যে, তিনি যদি শ্বশুরের আহ্বানে সাড়া দিয়ে নিষ্ঠার সঙ্গে স্বামীকে ফিরিয়ে আনবার জন্য সাধনা করেন, সেইটেই হবে আমাদের একটা যেমন আদর্শ, তাঁর মানসিক শক্তিও তেমনি সেই সাধনায় উৎকর্ষ লাভ করবে।

তরলা বুঝি এতক্ষণ স্থির থাকিয়া কি উত্তর দিবে মনে মনে ইহাই ভাবিতেছিল। চণ্ডীর যুক্তিপূর্ণ কথাটি অকাট্য জানিয়া সে তাহার সমর্থন করিয়াও সহসা বলিয়া উঠিল: আপনার কথা আমি মানি। চেষ্টা করলে হয়ত কলকাতায় গিয়ে সে বাড়ীর এক পাল স্ত্রী-পুরুষের লক্ষ্যস্থল হয়ে পরিহাস-টিটকিরি সহ্য করে নিষ্ঠার সঙ্গে স্বামীকে প্রসন্ন করবার সাধনায় আমিও সিদ্ধিলাভ করতে পারি। কিন্তু সত্য কথা বলতে কি, তাতে আমার একটুও আগ্রহ নেই। আর, কেনই বা থাকবে? একজন অন্যায় করল, সবার কাছে দোষী হলো; আমার মুখ পুড়িয়ে দিয়ে গেলো; আর, তার সেই দোষ সংশোধনের গরজ এলো আমার ঘাড়ে, আমার শিক্ষা-দীক্ষা নারীত্ব নিষ্ঠা সব কিছু দিয়ে তাঁকে উদ্ধার করতে হবে—যেহেতু তিনি স্বামী-দেবতা—পুরুষ, আর আমি হচ্ছি ধান ফেলতে ভাঙা কুলো—স্ত্রী, তাঁর শ্রীচরণের দাসী, নারী—আর এতেই আমার বাহাদুরী! কিন্তু এ খ্যাতির আমি তোয়াক্কা রাখি নে—নিজেকে খাটো করে এমন স্বামীকে পাবার জন্যে আমার মনে এতটুকু লোভও নেই। আর, স্বামীর আশা যখন ছাড়তে পেরেছি, তাঁর পিতার কাছেই বা আমি কেন ধরা দিতে যাব—কিসের সম্পর্কে যাব?

ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া চণ্ডী গম্ভীর মুখে জিজ্ঞাসা করিল: তাহ'লে এই আপনার শেষ কথা? আমার কথা আপনি মানছেন বললেন, কিন্তু তা মেনে চলতে রাজী নন। শ্বশুরের সংগে আপোষ করবেন না—এই ত?

শান্ত কণ্ঠে তরলা উত্তর করিল: হ্যাঁ। স্বামীকে ক্ষমা করা—এর পরে কোন দিনই যখন আমার পক্ষে সম্ভব হবে না বলেই জেনেছি, তখন কোন যুক্তির কাছেই আমি ধরা দিতে পারব না, বৌরাণী! এর জন্যে আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন।

কথাগুলি বলিতে বলিতেই তরলা আসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়াছিল, কথা শেষ হইতেই যুক্তকরে একটি নমস্কার করিয়া সে চলিয়া গেল।

কিছুক্ষণ কাহারও মুখ দিয়া কোন কথা বাহির হইল না। দীর্ঘ দালানটি ভরিয়া গভীর নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতে লাগিল। চণ্ডীর প্রশ্নই সে নীরবতা ভঙ্গ করিলঃ কাকাবাবু! আপনি ত একটি কথাও বললেন না?

রাধানাথ বাপুলী একটি নিশ্বাস ফেলিয়া উত্তর করিলেনঃ অনধিকার চর্চায় ত কোন ফল নেই মা! ও মেয়েটির বাবা তোমার কাছেই যুক্তি চেয়েছেন, তুমি যে যুক্তি দিয়েছ, তার উপর আর কি বলবার থাকতে পারে যে বলবার জন্য মুখ খুলব বল? তবে দুঃখ এই, ও মেয়েটিও পণ করে বসেছেন, কিছুতেই আপোষ করবেন না।

গোবিন্দনারায়ণ এ পর্যন্ত নির্বাক থাকিলেও নিবিষ্ট মনেই বিতর্ক শুনিতেছিল। এই সময় সে গম্ভীর মুখে বলিলঃ কিন্তু এই আপোষ-বিরোধী মনোভাব নিয়ে উনি কি করে স্ত্রী শিক্ষা দেবেন—সেইটিই এখন সমস্যা হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

প্রত্যুত্তরে চণ্ডী বলিলঃ এর সমাধান হচ্ছে—ওঁর একগুঁয়েমির পরিবর্তন না হওয়া পর্যন্ত ওঁকে উপযুক্ত জেনেও আমরা দুঃখের সঙ্গেই শিক্ষা-ব্যাপারে ওঁর সংশ্রব ত্যাগ করতে বাধ্য হব। সংশোধনে যাঁর নিষ্ঠা নেই, আমাদের সহস্র-ত্রুটি-ভরা সংসারে তিনি কি করে শিক্ষা দিতে পারেন, আর সে শিক্ষার সার্থকতাই বা কতটুকু! রাজীববাবু কি বলেন?

রাজীব এ সময় উঠি উঠি করিতেছিল; অনেকটা বেলা হইয়া গিয়াছে, আর বসিয়া থাকা চলে না—সংগে শিবানীও রহিয়াছে এবং তরলা যে অপ্রীতিকর অবস্থার উগ্র বায়ু ছড়াইয়া গিয়াছে, তাহার গতিবেগে দীর্ঘ অলিন্দটিও যেন উদ্দীপিত। এই অবস্থায় চণ্ডীর প্রশ্নে রাজীব নিজেকে বিপন্ন বোধ করিয়া সবিনয়ে বলিলঃ দেখুন, আদর্শ নিয়ে যেখানে মতবিরোধ, সেখানে স্বমত প্রকাশ করতে যাওয়াও বিড়ম্বনা। পারিপার্শ্বিক

অবস্থা বিচার করে তরলাদিদি স্বামী সম্পর্কে অতটা কঠিন না হলেও পারতেন। কিন্তু অবিশ্বাসী স্বামীর দুর্নীতির জন্য তিনি যদি তাঁকে ক্ষমা করতেও না পারেন, তাঁর ছায়াস্পর্শ করাও অন্যায় ভেবে তিনি চির-বিচ্ছেদের গণ্ডী টেনে দেন—তার জন্যও তাঁকে দোষ দেওয়া চলে না। তবে আমাদের পক্ষে এই ব্যাপারটি যে খুবই ক্ষতিকর হয়েছে, তাতে ভুল নেই।

চণ্ডী মাথা নাড়িয়া কহিল: ক্ষতির কথা আমিও অস্বীকার করছি নে রাজীববাবু! তরলা দেবী যে স্ত্রী-শিক্ষার ব্যাপারে অগ্রণী ছিলেন, তাঁকে পেলে আমাদের কাজের অনেক সুবিধাই যে হ'ত, তাতে সন্দেহ করবার কিছু নেই। কিন্তু ওঁর শ্বশুরের এই চিঠিখানাই যেন কালস্বরূপ হয়ে এল। এটা কলকাতা সহর হ'লে না হয় উপেক্ষা করা সম্ভব হ'ত। কিন্তু শুনলেন ত, উনি একবারে ধনুর্ভংগ পণ করে বসেছেন যে, ওঁর স্বামী বা শ্বশুরের সংগে কোন সম্পর্ক রাখবেন না, রাখাটাই ওঁর বিচারে অন্যায়! অথচ, ওঁর শ্বশুর যে রকম আন্তরিকতার সংগে ওঁকে আহ্বান করেছেন, তাতে সাড়া দেওয়া খুবই উচিত ছিল। ইচ্ছা করলে উনি এই জটিল সমস্যার একটা সমাধান করে নিজেই আদর্শ হতে পারতেন। এই আদর্শবাদের উপর ওঁর যখন তিলার্দ্ধও শ্রদ্ধা নেই, আমরা কি করে স্ত্রীশিক্ষার ব্যাপারে ওঁকে নিতে পারি?

রাজীব বলিল: তরলাদিদির উপর আপনি যে অবিচার করেছেন, এ কথা কেউই বলবে না; আর আদর্শ নিয়ে মতভেদ নূতনও নয়। পৃথিবীর সব দেশে সব সমাজেই এর সন্ধান মিলবে।

গোবিন্দ স্থির হইয়া উভয়ের সংলাপ শুনিতেছিল, এই সময় সহাস্যে কহিল: দেখুন, বিচার করবার মত বুদ্ধি-বিবেচনা পাবার পর থেকে আমি লক্ষ্য করে আসছি—বরাবরই ইনি সংশোধন ও সংগঠনের পক্ষপাতী; যদিও ঘটনাচক্রে বিরুদ্ধ মতবাদ সমর্থন করতে হয়েছে—

কিন্তু নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করলে এ অর্থ স্পষ্ট হবে যে, সংসার ও সমাজের পক্ষে যেটা শুভ ও হিতকর, উনি তারই পোষকতা করেছেন। এই তরলা দেবীর ব্যাপারটি থেকেই সেটা বুঝতে পারা যায়; ওঁর স্বামী অন্যায় করেছেন, স্ত্রীর কাছে অবিশ্বাসী হয়েছেন; এ অবস্থায় তরলা দেবী যদি স্বামীকে ক্ষমা না করতে চান, তাঁর সংগে সকল সম্বন্ধ ছিন্ন করাই তাঁর অভিপ্রেত হয়, এ যুগের বিচারসহ মনের দিক দিয়ে সেটা অশোভন বা সমর্থনের অযোগ্য না হতেও পারে। কিন্তু হিন্দুসমাজে স্বামি-স্ত্রীর যে শাশ্বত সম্বন্ধ, উনি তা নস্যাৎ করে দুটি জীবনের মধ্যে ব্যবধান ঘটাতে চান না। স্বামীর সম্বন্ধে ওঁর যে উদার মনোভাব, স্ত্রীর সম্বন্ধেও সেই ভাব উনি বজায় রাখতে ইচ্ছুক। ওঁর ধারণা, জীবনে এমন একটা ক্ষণ এসে যায়, মানুষ সে সময় প্রকৃতি বিরুদ্ধ কাজ করতে কুণ্ঠিত হয় না, কিন্তু তার জন্যে এক সময় অনুতাপ আসবেই তার জীবনে, সেই সময়ে সুযোগ থাকলে ভুলের রীতিমত মাশুল দিয়েও সে আবার স্বস্থানে ফিরে যেতে পারে। এই সুযোগের অভাবে, অর্থাৎ এক পক্ষের নিদারুণ ঘৃণা ও উপেক্ষা পুনর্মিলনের পথে চির ব্যবধানের প্রাচীর তুলে দেয়। এই আমার কথাই ধরুন না—ওঁর মত বিদুষীর সংগে পাকে-চক্রে যখন আমার বিবাহ হয়ে গেল, ওঁর মনোবৃত্তি যদি তরলা দেবীর মত হোত, আমাকে ত্যাগ করে একটা অশান্তি ঘটাতে হয়ত দ্বিধা করতেন না। উনি কিন্তু এক পক্ষের ভুল, অন্যায় ও অসহায় অবস্থা উপলব্ধি করে তার বিরুদ্ধে কোন নালিশ না তুলে ওঁর স্বভাবসিদ্ধ সংশোধন ও সংগঠনশীল মনোবৃত্তির সঙ্গে তার প্রতিকারে বদ্ধপরিকর হলেন গভীর নিষ্ঠার সংগে। তরলা দেবীর স্বামীর সম্বন্ধেও এমনি নীতি প্রয়োগ করে উনি তাঁকে ফেরাতে চেয়েছিলেন, আর আমার বিশ্বাস ওঁর পক্ষে সে অসম্ভব হত না। কিন্তু তরলা দেবী ওঁর নীতি বা যুক্তি গ্রহণ করতে প্রস্তুত নন। উনিও খুব বিদুষী কি না, তাই ওঁর স্বামীর অন্যায়টিকে সহজাত মূর্খতার চেয়েও জঘন্য জেনে একবারে তাঁকে

বর্জন করে বসলেন। কিন্তু সাধুরাও বলে গেছেন—পাপকে ঘৃণা করবে, আর পাপীকে ঘৃণার বদলে পাপের সম্পর্ক থেকে সরিয়ে আনবে। আমার মনে হয়, উত্তেজনার মুখে উনি এখন যাই বলুন, পরে কিন্তু নিজের ভুল বুঝতে পারবেন। আপনিও দেখুন রাজীববাবু, ওঁর বাবাকে ধরে তাঁর দ্বারা বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ওঁর মতেই পরিবর্তন করতে পারেন।

গোবিন্দের বিজ্ঞোচিত কথাগুলি শুনিতে শুনিতেই রাজীব মনে মনে তারিফ করিতেছিল। সংশোধন ও সংগঠনের ফলে মানুষের কি পরিবর্তন ঘটিতে পারে, তার সুস্পষ্ট নিদর্শন ত এই মানুষটি। সত্যই ত, তরলার মত বিদূষী ও বুদ্ধিমতী মেয়ে এত বড় সত্য প্রত্যক্ষ করিয়াও নিজের অহমিকা ও যুক্তির উপর ভর দিয়া এ কি মনোবাদ ঘটাইয়া বসিল! গোবিন্দের কথা শেষ হইলে রাজীব একটুখানি হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল: আপনারা ঐ মেয়েটিকে যতখানি বিদূষী বলে জানেন, তার চেয়েও উনি অনেক বেশী হঠকারী। ওঁর এই একগুঁয়েমি ভাবের বিরুদ্ধে অনেক নালিশও আমি শুনেছি। যাই হোক, আপনি যে যুক্তি দিলেন, আমি আন্তরিকতার সংগেই সে সম্বন্ধে চেষ্টা করব। তাহলে এখন আমরা উঠি, বেলাও অনেকটা হয়েছে।

বাপুলী বলিলেন: আমিও আজকের মত উঠি মা, একবার কর্তার সংগে দেখা করতে হবে—তাঁর ওখানে ডাকও পড়েছে।

গোবিন্দ ও চণ্ডী দ্বার পর্যন্ত তাঁহাদের সংগে গিয়া বিদায় দিয়া ফিরিয়া আসিল।

বারো

বৌরাণীর মহল হইতে তরলা যখন বাহিরে আসে, তাহার তখন বুকের মধ্যে যেন আগুন জ্বলিতেছিল। চক্ষুর উদ্গত অশ্রু নির্গত হইবার পথেই বুকের বাহ্নির তাপে শুকাইয়া গেলেও ভিতরটা বুঝি পুড়িয়া যাইতেছিল। স্বামীর উপর প্রচণ্ড একটা প্রতিশোধ লইবার উদ্দেশ্যেই তরলা বৌরাণীর নিকট আসিয়াছিল; ভাবিয়াছিল, সে নিজেই উদ্যোগী হইয়া কিছু দিন পূর্বে যে মহীয়সী মহিলাটিকে বিশেষ ভাবে সম্বর্ধনা করিয়া গিয়াছে, তাহার এই পরম সংকটকালে এমন কিছু সহানুভূতি তিনিও নিশ্চয়ই জানাইবেন, তাহার অন্তর্নিহিত বিপ্লব-বহ্নিও যাহার বাতাসে বিস্ফুরিত হইয়া উঠিবে। কিন্তু বৌরাণীর যুক্তি তাহাকে এমনি কঠিন আঘাত দিল যে, হৃদয়হীন স্বামীর অবিচার ও অবিধেয় ব্যবহারের তুলনায় তাহার পক্ষে তাহা হইয়াছে শত গুণ অধিক মর্মান্তিক। বৌরাণীর মত মনস্বিনী নারী যে স্বামী-পরিত্যক্তা নারীর অন্তর্বেদনা এই ভাবে উপলব্ধি করিয়া কতকগুলি সনাতনী উপদেশামৃত শুনাইয়া তাহাকে উপেক্ষা করিবে, সে তাহা কল্পনাও করে নাই। এ অবস্থায় এ-বাড়ীর এই বধূটির প্রতি তাহার যে শ্রদ্ধা ও নির্ভরতা ছিল, অন্তর হইতে তাহা নিঙড়াইয়া নিঃশেষ করিয়া সে এখন নিজের গন্তব্য পথ নিজের বিচার-বুদ্ধির আলোকেই চিনিয়া লইবে স্থির করিয়া ফেলিয়াছে। বৌরাণীর মহল হইতে বাহিরের চত্বরে নামিয়া আসিতে যেটুকু সময় মিলিয়াছে, তাহার মধ্যেই যে সিদ্ধান্তটি সে মনে মনে গড়িয়া তুলিতেছিল, অতর্কিত ভাবে হঠাৎ একটি প্রশ্ন আসিয়া শুধু যে সেখানে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিল তা নয়, সংগে সংগে অসমাপ্ত সিদ্ধান্তের পথে বুঝি সহায় হইয়া দাঁড়াইল।

মুক্ত চত্বরটির পথের দুই পারে ও অন্যান্য অংশে নানা আকারের নানাবিধ ফুলের ও বাহারী পাতার গাছ স্থানটির গাম্ভীর্য ও সৌন্দর্য

বর্ধিত করিয়াছে। এক স্থানে—যেখানে কয়েকটি ক্রোটন গাছ শাখা-প্রশাখা সংযুক্ত করিয়া কুঞ্জের মত শোভান্বিত হইয়াছিল, তাহার আড়ালে দাঁড়াইয়াছিল নিবারণ। তরলাকে যে রাজীব ও শিবানীর সহিত বৌরাণীর মহলে প্রবেশ করিতে দেখিয়াছিল, কিন্তু নিজে ছিল অদৃশ্য। নির্গম-পথেও সে সাগ্রহে ইহাদের প্রতীক্ষা করিতেছিল। তরলার সংগেই তাহার প্রয়োজন, তাহাকে একান্তে ডাকিয়া—অশোভন হইলেও—কোন কথা বলিবার আগ্রহকে সে নিবারণ করিতে পারে নাই, এবং ইহা তাহার স্বভাববিরুদ্ধও বটে। কিন্তু অনেকটা সময় অপেক্ষা করিবার পর তরলাকে একা ফিরিতে দেখিয়া নিবারণের দুই চক্ষু উজ্জল হইয়া উঠে, উপরন্তু তরলার মুখভংগি বৃক্ষান্তরাল হইতে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করিয়া সে বুঝিতে পারে, এই অপূর্ব রূপসী ও চতুরা মেয়েটির মনের মধ্যে একটা বিষম ঝড় উঠিয়াছে। সে যখন প্রবেশ করে এ-বাড়ীতে, তাহার সুন্দর মুখে বিপুল সৌন্দর্যের মধ্য দিয়া একটা হাসি যেন ফুটি-ফুটি করিতেছিল, এখন তাহার কোন চিহ্নই নাই—পূর্ণিমার আকাশে যেন অমাবস্যার আঁধার নামিয়াছে। কিন্তু হঠাৎ এমন বিপর্যয় ঘটিল কিসে? বৌরাণীর সহিত তাহার মানসিক সংঘর্ষ কি ঘটিয়া গিয়াছে সহসা? ইহা কি সম্ভব? অবর্ণনীয় একটা উল্লাসে নিবারণের সমগ্র অন্তর যেন ভরিয়া গেল। সে আপনাকে প্রস্তুত করিয়া লইল নিজের উদ্দেশ্যটি সিদ্ধ করিবার অভিপ্রায়ে। ক্রোটন-কুঞ্জটি অতিক্রম করিবার মুখেই নিবারণের সস্মিত মুখের প্রশ্ন তরলাকে চমৎকৃত করিল: কেমন আছেন? চিনতে পারেন আমাকে?

কুঞ্জটির আড়ালে থাকিয়া প্রশ্নটি করিয়াই নিবারণ একেবারে তরলার সামনে আসিয়া দাঁড়াইল—পলকে পরস্পর মুখোমুখি হইতেই চোখোচোখি হইয়া গেল। তরলার বিষণ্ণ মনে কিঞ্চিৎ পূর্বে কল্পিত এক প্রতিবিধিৎসার বহ্নি বিস্ফুরিত হওয়ায় তাহার ঈষৎ আভা মুখেও বুঝি ধীরে ধীরে প্রতিফলিত হইতেছিল, নিবারণকে দেখিয়া এবং তাহার মুখের প্রশ্ন শুনিয়া

সে মুখ সহসা আরক্ত হইয়া উঠিল। অমনি সংগে সংগে মনে পড়িয়া গেল কিশোর কালের সেই স্মরণীয় দিনটির কথা—এই ছেলেটিই সে দিন তাহার সামনে দাঁড়াইয়া তর্জনের সুরে বলিয়াছিল—'জানো, তোমাকে এখনি টিট করতে পারি?' যদিও তাহার পর বড় খোকা গোবিন্দের ভীরু ভংগি ও ভাংগা ভাংগা কথাগুলি তাহাকে অভিভূত করে, কিন্তু গাঙ্গুলী বাড়ীর এই দুর্বিনীত ছেলেটির তৎকালীন প্রখর মূর্তি ও কঠোর উক্তিও সে ভুলিতে পারে নাই। তাই নিবারণের প্রশ্নের উত্তরে তরলা দিব্য সপ্রতিভ ভাবেই বলিয়া ফেলিল: আপনাকে চেনা ত শক্ত নয়—নিত্যই ত দেখি, নতুন ডাক্তারের সংগে ভোর সকালে ঘোড়ায় চড়ে টহল দিচ্ছেন। কিন্তু আমাকে দেখেই চিনে ফেলে এ-ভাবে আলাপ করতে আসাটাই হচ্ছে আশ্চর্য ব্যাপার!

তরলার মুখ হইতে মুখ না তুলিয়াই নিবারণ আর্দ্র কণ্ঠে কহিল: বাঃ! কি যে বলেন! আপনিই বা কোন্ অসূর্যম্পশ্যা হয়ে বাড়ীর মধ্যে সে থাকেন—যে আপনার দর্শন পাওয়া দুর্লভ! শ্বশুরবাড়ী থেকে এসেই তো [illegible]রা গ্রামকে জাগিয়ে তুলেছেন। শাঁখ বাজিয়ে যেদিন মিছিল করে এ-বাড়ীতে আসেন, যদিও চোখে দেখবার সৌভাগ্য হয়নি, কিন্তু শুনেছি ত? তার পর লাইব্রেরীর সভায় সেদিন যে কাণ্ড করেন, সেদিনও ঘোমটায় মুখ ঢেকে রাখেন নি—কাজেই, চিনতে বাধা কোথায় বলুন? তবে দুঃখ এই, ও-মহলকেই আপনার করে নিয়েছেন, আর আমাদের সংগে দিয়েছেন আড়ি।

নিবারণের মুখের পানে চাহিয়া তরলা একটু হাসিল, তাহার পর আয়ত চোখের সুশ্রী ভুরু দু'টি ঈষৎ নাচাইয়া কহিল: তাই বুঝি আজ এখানে আমাকে একলা পেয়ে ভাব করতে এগিয়ে এসেছেন? কিন্তু এই বাড়ীতে—আপনাদেরই মহলে অনেক দিন আগে আর একবার আমাদের দুজনকে মুখোমুখি হতে হয়েছিল, সে কথা বোধ হয় মনে নেই?

একটু ভাবিয়া নিবারণ উত্তর করিল : মনে আছে বৈ কি ; সেদিন আপনি আমার সংগে ঝগড়া বাধাতে চেয়েছিলেন। আমার পিস্‌তুতো বোন মিনু এসে দু'জনকে থামিয়েছিল। আপনার কিন্তু এমনি রাগ, তার পর আর আমার সংগে কথাও বলেন নি—ফিরেও তাকান নি।

তেমনি হাসিমুখে তরলা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল : সেদিন ঝগড়ার মুখে কি বলেছিলেন মনে আছে নিবারণবাবু ?

তরলার মুখে সহসা নিজের নামটি শুনিয়া নিবারণ একটু চমকিয়া উঠিলেও মনে তার আনন্দের একটু আবেশ লাগিল। পরক্ষণে তরলার সপ্রতিভ মুখের উপর নিজের বিহসিত দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া কহিল : অত দিনের কথা কি মনে থাকে, তবে আপনার তখনকার মুখখানা এখনো মনে আছে। বাবা! একটুতেই কি রেগে উঠেছিলেন! সেই জন্যেই ত ইচ্ছা থাকলেও আপনার সংগে কথা বলতে ইদানীং আর ভরসা করিনি।

তরলার মুখের হাসি বিজলির আলোর মত তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিল, সংগে সংগে প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপের সুরে সে জিজ্ঞাসা করিল : তাহলে আজ এ ভরসা কি করে পেলেন—আপনার কোটে পেয়ে, আর একলা দেখে ?

অপ্রতিভের মত মুখভঙ্গি করিয়া নিবারণ বলিল : ও-কথা বলে আমাকে লজ্জা দেবেন না ; আপনার বাবার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে। আপনাকে আসতে দেখেই হঠাৎ সেটা মনে পড়ে গেল। সেই জন্যেই আপনাকে ডেকে আলাপ করতে ভরসা করেছি।

তীক্ষ্ণদৃষ্টি নিবারণের মুখে নিবদ্ধ করিয়া তরলা জিজ্ঞাসা করিল : কথাটা কি ?

নিবারণ উত্তর দিল : আপনি শুনেছেন বোধ হয়, বিশু ডাক্তারের জায়গায় এক জন অভিজ্ঞ ডাক্তার নেওয়া হবে। আপনি এইমাত্র যে ডাক্তারের কথা বললেন, অর্থাৎ যাঁর সঙ্গে আমাকে বেড়াতে দেখেছেন—আমাদের ইচ্ছা, তাঁকেই নেওয়া হয়। কিন্তু বৌরাণী জিদ করে, কলকাতা

থেকে এক ছোকরা ডাক্তারকে আনাচ্ছেন, তাঁকেই কাজটা তিনি দিতে চান। এখন বেগতিক দেখে কমিটীর উপর মনোনয়নের ভার ছেড়ে দেওয়া হয়েছে—তাঁরাই এই দু'জনের মধ্যে এক জনকে বাহাল করবেন। আপনার বাবাও কমিটীর এক জন মেম্বর। এখন বুঝতে পেরেছেন বোধ হয়, কাজটা কি ?

সহাস্যে মাথা নাড়িতে নাড়িতে তরলা বলিল: এত কথার পরও যদি আপনার মতলবটা বুঝতে না পারি নিবারণবাবু, তা'হলে তো আর এ ভাবে বাইরে বেরিয়ে আসাই ভুল—ঘোমটায় মুখ ঢেকে বাড়ীতে কলা-বউ সেজে বসে থাকাই উচিত হতো। কিন্তু আপনার ইচ্ছাকে তালিম দিতে হলে বৌরাণীর ইচ্ছার উপর বাদ সাধা হবে—এ জেনেও আপনি আমাকে দলে টানতে এলেন কি ভরসায় বলুন তো ?

প্রত্যুত্তরে নিবারণ একটু মুচকিয়া হাসিয়া কহিল: তা'হলে ভরসা করেই বলি শুনুন ; ও-মহলে যে-মন নিয়ে সেঁধিয়েছিলেন আপনি, সে-মন আপনার ভেঙ্গে গেছে বুঝতে পেরেই আমি আপনার সাহায্য পাবার ভরসা করেছি।

তরলার দুই চক্ষু সহসা কুঞ্চিত হইয়া উঠিল, কিন্তু ক্ষণকাল পরেই মুখখানা কৃত্রিম হাসিতে ভরাইয়া এবং তীক্ষ্ণ কটাক্ষে নিবারণের দুই চক্ষু ধাঁধাইয়া দিয়া কহিল: তাই বলুন, আপনি বাটপাড়ি করে ও-মহলের খবর সব চুরি করেছেন—বৌরাণীর সঙ্গে আমার মতের গরমিল হয়েছে জেনে, খোস-মেজাজে আমাকেও আপনার দলে টানবার জন্যেই এখানে ফাঁদ পেতে ধর্ণা দিচ্ছিলেন ? আপনি তো তা'হলে সাধারণ ছেলে নন !

নিবারণ বিস্ময়াপন্ন হইয়া মনে মনে তরলার কথাগুলির অনুশীলন করিয়াও ঐ কথার সমর্থনসূচক কোন উত্তর খুঁজিয়া পাইল না। এই মেয়েটির মুখভঙ্গি দেখিয়াই সে অনুমান করিয়াছিল যে, বৌরাণীর সহিত

কোন কারণে তাহার কথান্তর হইয়া থাকিবে, নতুবা এরূপ অস্থির ভাবে কখনই তাহাকে একাকিনী বাহির হইয়া আসিতে দেখা যাইত না। কিন্তু কি সূত্রে কথান্তর বা মনোমালিন্য, তাহার কিছুই তো সে জ্ঞাত নহে! অথচ এ ক্ষেত্রে তরলার অনুমানকেও ক্ষুণ্ণ করা যে অসঙ্গত, সে সম্বন্ধেও তাহার সন্দেহ ছিল না! ক্ষণকালের মধ্যেই সে আত্মনির্ভরশীল হইয়া কথার কৌশলে তরলাকে মাৎ করিবার এক ফন্দী স্থির করিয়া ফেলিল। নিজের কণ্ঠস্বরকে অত্যন্ত কোমল ও দুই চক্ষুর দৃষ্টিকে বিহ্বল করিয়া সে বলিল: ছেলেবেলা থেকেই আপনি মনে মনে জেনে রেখেছেন, আমি শুধু ঝগড়া করতেই জানি। কিন্তু আমি যে ভাব করতেও ভালবাসি, কেউ দুঃখ পেয়ে যদি আমার সাহায্য চায়, আমি যে তাকে বন্ধু জেনে তার জন্যে ধন-মান-জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করতে পারি, এ তো আপনি জানতেন না! এই মানী ডাক্তারটির জন্যে আমি যেমন জিদ ধরেছি; তেমনি, আজ বৌরাণীর কাছ থেকে যে ব্যথাই আপনি পান না কেন, সে ব্যথা নিজের ভেবে আপনার ব্যথা ঘোচাতে আমি কি না করতে পারি!

স্থিরদৃষ্টি নিবারণের মুখের উপরে নিবদ্ধ করিয়া অত্যন্ত সহজ কণ্ঠে তরলা কহিল: বৌরাণীর সঙ্গে আপনার যে জিদের লড়াই চলেছে ঐ ডাক্তারকে নিয়ে, সে কথা এ গ্রামের সবাই জানে। কিন্তু আমার বাবা কমিটীর মেম্বার জেনেও বৌরাণী আমাকে পর করতে এতটুকু ইতস্তত করেননি। এর পর ধরুন, আপনাদের জিদ যদি না থাকে, বৌরাণী যে ডাক্তারকে রাখতে চান, তাঁকেই রাখা কমিটীর মত হয়, তখনো কি আমার উপর এ দরদ আপনার থাকবে?

নিবারণ এ পর্যন্ত অন্ধকারে থাকিয়া অনুমানে ঢিল ছুড়িতেছিল। তরলার স্বামী সংক্রান্ত তত্ত্ব সে জ্ঞাত ছিল না, এবং বৌরাণীর সঙ্গে তাহার মনোমালিন্যের কারণও তাহার জানা নাই। তথাপি, একটা গুরুতর

ব্যাপার কিছু ঘটিয়াছে এবং সে ব্যাপারটি যে তাহার অবিদিত নয় এরূপ ভাণ করিয়াই সে প্রতিউত্তরে কহিল: আপনি ডাক্তারের কথা কি বলছেন, যদি এ-বাড়ীর সঙ্গে সম্পর্ক পর্যন্ত কাটিয়ে যেতে হয়, তবুও আপনার জিদ রাখবার জন্য আমার দিক থেকে কোন ত্রুটি হবে না জানবেন। আমি তো দেখছি, এ-বাড়ীর কর্তা থেকে গ্রামশুদ্ধ সবাই বৌরাণীর দিকে ঢলে পড়েছেন, তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে মুখের কথা খসাতেও কারুর সাহস নেই। আপনিই তাঁর থোঁতামুখ ভোঁতা করে দিয়ে এসেছেন। এই জন্যেই আপনার প্রতি আমার এত দরদ!

তরলা তাড়াতাড়ি প্রতিবাদের ভঙ্গিতে বলিয়া উঠিল: না, না, তাঁর থোঁতা মুখ আমি ভোঁতা করে দিয়েছি, এমন কথা আমি তো বলিনি। হ্যাঁ, তবে তাঁর যুক্তি আমি মেনে নিতে পারিনি, এ কথা মিছে নয়।

কণ্ঠস্বরে জোর দিয়া নিবারণ বলিল: তা'হলেই কথাটা একই—বৌরাণীর যুক্তি সবাই নির্বিচারে মেনে নিতে বাধ্য, তাঁর নিজেরও এই ধারণা। বুঝতে পারছেন না, তাঁর যুক্তিকে অগ্রাহ্য করে আপনি তাঁকে কত বড় আঘাত দিয়েছেন! আর তাঁর যে রকম প্রকৃতি, আপনার এ অপমান তিনি সহজে ভুলতে পারবেন না। এদিকে আপনাকেও আমি কিছুতেই খাটো হতে দেব না তাঁর কাছে। এই নিয়ে যদি মন-কষাকষি হয় বা রেষারেষি চলে, মন্দ কি?

একটু হাসিয়া তরলা কহিল: রেষারেষি তো আপনাদের শুরু হয়ে গেছেই ডাক্তার রাখা নিয়ে; আগে তো ওটা হয়ে যাক, তার পর আমাকে নিয়েও যে একটা প্রলয় পর্ব চলবে তাতে ভুল নেই। আগে তো আপনার জেদটা রাখবার চেষ্টা করা যাক; জিতি ভালোই, আর হারলেও যে আপনি দরদ দেখাতে ভুলবেন না, নিজেই তো বলেছেন। বেশ, এই কথাই রইল। এখন আমাকে একটু সাহায্য করবেন?

নিজেকে ধন্য ও কৃতার্থ ভাবিয়া নিবারণ সবিনয়ে কহিল: ওটা জিজ্ঞাসা না করে আজ্ঞা করা উচিত নয় কি—যখন আমরা পরস্পরকে সাহায্য করতে বাধ্য হয়েছি?

সহাস্যে তরলা কহিল: অনুরোধ থেকে একেবারে আদেশ! এ যেন সেই ডবল প্রমোশন। ভাল, তাই হোক। তা'হলে বলি—কর্তাবাবুর কাছে আমাকে একবার নিয়ে চলুন তো! আপনাদের বাড়ী তো নয়, যেন একটা কেল্লা। বৌরাণীর মহল থেকে বেরিয়েই তাঁর মহলে যাবার জন্যে মনে যেই আগ্রহ জেগেছে, ঠিক সেই সময়ে যেন অন্তর্যামীর মতই আপনি দেখা দিলেন। এখন পথের সাথী তো হোন।

কথাটা শেষ করিয়াই তরলা আপন মনে খিল-খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। সেই অপরূপ হাসির সুমিষ্ট সুর নিবারণকে এমনি বিহ্বল করিয়া ফেলিল যে, কিছুক্ষণ সে বিমুগ্ধ দৃষ্টি এই প্রগল্‌ভা মেয়েটির মুখের উপর ফেলিয়া একই ভাবে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। পরক্ষণে অনুযোগের কণ্ঠে তরলাই বলিয়া উঠিল: কি হলো আপনার? কি ভাবছেন?

বিমূঢ়-ভাবটা কাটাইয়া সঙ্গে সঙ্গে একটা প্রসঙ্গ তুলিয়া নিবারণ কহিল: ভাবছিলাম, ওখানে গিয়ে নালিশ করে কি কোন লাভ হবে মনে করেন?

তরলা সহাস্যে কহিল: লাভ-লোকসানের তোয়াক্কা আমি আর রাখি নে নিবারণবাবু, ঘটনার স্রোতেই নিজেকে যখন ভাসিয়ে দিতে পেরেছি তখন আর ভয় কি বলুন? বিশেষ করে, আপনি যখন এ অভিযানে পথের সাথী হতে রাজী হয়েছেন। আর দেরী করবেন না, চলুন।

'আসুন' বলিয়া নিবারণ হরিনারায়ণ বাবুর মহলের পথে অগ্রসর হইল। তাহার আরক্ত দু'টি কানের মধ্যে তখনো তরলার কণ্ঠস্বর মধুর আমেজ দিতেছিল—পথের সাথী তো হোন!

তের

হরিনারায়ণ বাবু আরাম-কেদারায় অঙ্গ ঢালিয়া বিশ্রাম করিতে-ছিলেন তখন। তাঁহার মনটিও সুস্থ ছিল না—কিছু পূর্বে মাধুরী দেবীর সঙ্গে প্রচণ্ড ভাবে তর্ক-বিতর্ক হইয়া গিয়াছে এবং আজ তিনি স্বামীকে বাক্‌জালে আষ্টে-পৃষ্ঠে বাঁধিতে অকৃতকার্য হইয়া অভিমানে এই মাত্র পার্শ্বের গৃহে চলিয়া গিয়াছেন। বিতর্কের সৃষ্টি হয় ডাক্তারের মনোনয়ন লইয়া। ব্যাপারটি যে-ভাবে চারিদিকে প্রচারিত হইয়াছে, তাহাতে ডাক্তার বাগচি অমনোনীত হইলে তাঁহার আর লজ্জা রাখিবার স্থান থাকিবে না, সুতরাং মানে মানে বাগচিকে সরাইয়া দেওয়াই মাধুরী দেবী সঙ্গত মনে করিতেছেন!

পত্নীর কথা শুনিয়া হরিনারায়ণ বাবু উত্তেজিত কণ্ঠে এই বলিয়া প্রতিবাদ করেন যে, ব্যাপারটির অপপ্রচারের জন্যে দায়ী কাহারা, মাধুরী দেবী কি তাহা জ্ঞাত নহেন? বৌরাণী তো মনোনয়নের ভার কমিটীর উপর সমর্পণ করিয়া নিজে সরিয়া গিয়াছেন। কমিটীর মেম্বর-দিগকে প্রভাবান্বিত করিবার জন্য পক্ষবিশেষের প্রচেষ্টাও তো পূর্ণোদ্যমে চলিয়াছে; তথাপি এ ভাবে আক্ষেপ করিবার সার্থকতা কি? আর ডাক্তার বাগচিকে এই চূড়ান্ত নিষ্পত্তির প্রাক্কালে সরাইয়া দিলেও কি এ পক্ষের লজ্জা রাখিবার স্থান কোথাও মিলিবে!

মুখের মত জবাব পাইয়া মুখখানা ভার করিয়া মাধুরী দেবী নীরবে উঠিয়া যান। হরিনারায়ণ বাবু শ্রান্ত ভাবে আরাম-কেদারার পিঠে মাথাটি রাখিয়া মুদ্রিত নেত্রে এই অপ্রীতিকর পরিস্থিতির পরিণাম ভাবিতে থাকেন। কয়েক মিনিট পরেই দ্বারপ্রান্তে অলঙ্কার শিঞ্জিনীর সঙ্গে মৃদু পদধ্বনি তাঁহাকে পুনরায় ত্রস্ত করিয়া তুলিল, প্রশ্নোত্তরের আবার কি নূতন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়, এই ভাবিয়া তিনি দ্বারের দিকে না চাহিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন: কে? বৌমা এলে?

কিন্তু আরাম-কেদারার হাতলের উপর বিন্যস্ত গৃহস্বামীর পা দু'খানি স্পর্শ করিয়া তরলা উত্তর দিল: বৌমা না হলেও, আমি আপনার আর এক কন্যাই, জেঠামশাই।

কণ্ঠস্বরে চমকিত হইয়া হরিনারায়ণ বাবু চক্ষু মেলিয়া চাহিতেই তরলা হাসিমুখে পুনরায় কহিল: বুঝিছি, আমাকে চিনতে পারেন নি; অনেক দিন পরে দেখা কি না? আমি—তরলা। এখন চিনেছেন?

ধীরে ধীরে সোজা হইয়া বসিয়া হরিনারায়ণ বাবু সহর্ষে বলিলেন: তরলা! বন্তিনাথের মেয়ে? এত বড় হয়েছ মা! তা তো হবেই। তোমার কথা অনেক শুনিছি। বৌমাকে তুমিই উদ্যোগী হয়ে বরণ করে উপাধি দিতে এসেছিলে, তাও জানি। সেদিন মিনুকে বলেছিলুম, তোমাকে এ-ঘরে নিয়ে আসবার জন্যে। সেই থেকে প্রায়ই ভাবি, তুমি আসবেই। বসো মা, বসো।

সামনের কেদারাখানির উপর বসিয়া তরলা বলিল: সেদিনই এখানে আসবার ইচ্ছা খুবই হয়েছিল জেঠামশাই, কিন্তু দল বেঁধে সব এসেছিলুম কি না, আমি একলা এলে পাছে ওরা সব কি মনে ভাবে, তাই সেদিন আর আসা হয়নি।

স্নেহের স্বরে হরিনারায়ণ কহিলেন: তাতে কি হয়েছিল মা? না হয় সবাইকে নিয়েই আসতে—তাতে আমি আরো বেশী খুসি হতাম। তা, আজ হঠাৎ যে বুড়ো জেঠামশায়ের অদৃষ্ট প্রসন্ন হলো মা?

মৃদু হাসিয়া তরলা উত্তর দিল: অমন কথা বললেন না জেঠামশাই, সত্যিই আমার বড় অন্যায় হয়ে গেছে এত দিন না এসে। আজও যে এসেছি, এ আসার পিছনেও একটা বড় রকমের দুঃখ রয়েছে; কাজেই আজকের আসাও ঠিক মঞ্জুর নয়—নিজের দায়ে দুঃখের ভার নামাবার উদ্দেশ্যেই যখন এ আসা।

হরিনারায়ণ বাবু এ কথায় বিস্ময়াপন্ন হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন: সে কি মা, যদিই বা এলে, এসেই এ কি কথা শোনালে বল তো? এই বয়সে তোমার মত সোনার প্রতিমার আবার দুঃখ কিসের?

অঞ্চলের খুঁটে বাঁধা চিঠিখানি খুলিতে খুলিতে তরলা কহিল: আমার শ্বশুরের এই চিঠিখানি আগে পড়ুন আপনি, তা'হলেই বুঝতে পারবেন আমার দুঃখটা কি, আর আমার বয়সের মেয়ের পক্ষে সেটা কত গভীর!

তরলা চিঠিখানি দিবার জন্য হাত বাড়াইতেছিল, কিন্তু হরিনারায়ণ বাবু ঘাড় নাড়িয়া নিবারণ করিয়া কহিলেন: পড়া-শোনা এখন ছেড়ে দিয়েছি মা, তুমিই পড়ে শোনাও।

ক্ষুদ্র চিঠি। শব্দগুলি চোখা-চোখা। এক নিশ্বাসেই তরলা শ্বশুরের চিঠি পড়িল। চিঠির বৃত্তান্ত শুনিয়া অপর সকলের মত হরিনারায়ণ বাবুও শিহরিয়া উঠিয়া তরলার ন্যায় রূপ-গুণান্বিতা কন্যার দুর্ভাগ্য সম্বন্ধে আক্ষেপ করিলেন—পথভ্রষ্ট স্বামীর দুর্ব্বুদ্ধিকে ধিক্কার দিয়া অনেক কথা বলিলেন।

তরলা কিন্তু সে সকল কথায় কিছুমাত্র অভিভূত বা বিচলিত না হইয়া শান্ত কণ্ঠে কহিল: এখন ও-নিয়ে আক্ষেপ করে তো কোন লাভ নেই জেঠামশাই, আমার এখন কি করা উচিত সেই পরামর্শই আমি নিতে এসেছি আপনার কাছে। অবিশ্যি, আগেই আমি বৌরাণীর কাছে গিয়েছিলুম, আমার বাবাও সেই পরামর্শই আমাকে দিয়েছিলেন বলেই।

হরিনারায়ণ বাবু মুখ তুলিয়া কহিলেন: তিনি পাকা লোক, ঠিক জায়গাতেই তোমাকে পাঠিয়েছিলেন মা! এ অবস্থায় তোমার কর্তব্যের নির্দেশ বৌমার চেয়ে ভাল করে কেউ দিতে পারবেন বলে আমার ত মনে হয় না, মা! কিন্তু আমি ভেবে পাচ্ছি নে, বৌমার কাছে আগেই

গিয়েছিলে বলছ, অথচ তার পরও পুনরায় আমার কাছে এসে কর্তব্য জিজ্ঞাসা কর্‌ছ। এর মানে বুঝতে যে গোল বাধছে মা!

মুখখানা সহসা কঠিন করিয়া তরলা কহিল: মানে আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি জেঠামশাই। তাঁর যুক্তি আমার মনে লাগেনি বলেই আপনার কাছে যুক্তি নিতে আমাকে ছুটে আসতে হয়েছে।

তরলার মুখের পানে কিছুক্ষণ স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া বিস্ময়ের স্বরে হরিনারায়ণ বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন: তুমি বলছ কি মা, আমার বৌমার যুক্তিও তোমার মনে ধরেনি? আমার তো ধারণা মা, এ সব ব্যাপারে তাঁর যুক্তি অকাট্য। কি তিনি বলেছেন শুনতে পাই?

তরলা একটু হাসিল; সে হাসির রূপ ছুরির ফলার মত তীক্ষ্ণ; বক্রহাসির সঙ্গে মুখখানাও কিঞ্চিৎ বক্র করিয়া সে কহিল: তাঁর মতে আমার কর্তব্য হোচ্ছে জেঠামশাই, শ্বশুর-বাড়ী ফিরে গিয়ে স্বামীকে ফিরে পাবার জন্যে তপস্যা করা।

হরিনারায়ণ বাবুর মুখ দিয়া তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ পরিচিত শব্দটি সজোরে নির্গত হইল: ইয়া! এই ত আমার বৌমার কথা, যার তুলনা নেই। কিন্তু ভারি আশ্চর্য তো, এ কথা তোমার মনে ধরেনি? তাঁর কথা তুমি মানতে চাওনা নাকি?

মুখখানা শক্ত করিয়া কণ্ঠস্বরে জোর দিয়া তরলা কহিল: তা'হলে আপনার কাছে আপীল করতে আসব কেন জেঠামশাই!

অকৃত্রিম বিস্ময়ে মুখ তুলিয়া হরিনারায়ণ বাবু কহিলেন: কিন্তু বৌমা তোমার সম্বন্ধে যে রায় দিয়েছেন, সেটা আমিও কি ভাবে মেনে নিয়েছি আমার কথাতেই তো শুনতে পেলে! এর পরও আপীল করে লাভ হবে বলে কি ভরসা কর?

গম্ভীর মুখে তরলা উত্তর করিল: করি বৈ কি জেঠামশাই, নিচের আদালতের রায় খণ্ডন হবে না জেনেও যে দুরাশায় উপরের আদালতে

আশাবাদীর আপীল, আমারও তাই। আপনার সিদ্ধান্ত জানতে পারলে মনেও তো একটা সান্ত্বনা পাব, অন্তত একটা ধারণাও তো বদলাবে।

হরিনারায়ণ বাবু কহিলেন: অর্থাৎ যে অবস্থায় তুমি পড়েছ, এ সম্বন্ধে আমার মতটা আমার মুখ দিয়েই তুমি শুনতে চাও, এই তো তোমার কথা?

তরলা একটু হাসিয়া এবার কহিল: হ্যাঁ, আপনি ঠিক ধরেছেন জেঠা-মশাই! আপনার সম্বন্ধে আমারও একটা দৃঢ় ধারণা আছে যে, আপনি অন্তত চর্বিত চর্বণ করবেন না; আমার অবস্থা শুধু নয়—আমার মত অনেক মেয়েকেই আজ-কাল এই রকম অসুবিধায় পড়তে হচ্ছে, এ অবস্থায় স্বামীকে ফিরে পাবার তপস্যায় না বসে, আত্মশক্তিতে আমাদের জীবনকে স্বার্থক ও পূর্ণ করতে এখন আমাদের কর্তব্য কি, ঠিক বাস্তবের দিকে চেয়ে আপনি তার একটা সুযুক্তিপূর্ণ নির্দেশ দেবেন, এই প্রত্যাশাই আমি আপনার কাছে করি, আর সেই উদ্দেশ্যেই আমার এই আপীল।

হরিনারায়ণ বাবু ক্ষণকাল স্তব্ধ ভাবে বদ্ধ-দৃষ্টিতে এই বাক্‌-পটীয়সী মেয়েটির মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার মনে পড়িল, কয়েক মাস পূর্ব্বে এই বাড়ীতেই নববধূ চণ্ডীর এমনি দৃঢ়তাব্যঞ্জক প্রদীপ্ত মুখখানি। মনে পড়িল, পত্নী মাধুরীর আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য ক্ষুরধার নির্ভীক উক্তি। এই মেয়েটিকে তিনি কিশোর কালে দেখিয়াছিলেন, তাহার পর কয়েক বর্ষ অতীত হইয়া গিয়াছে, নব-যৌবনের সমগ্র শোভা ও মাধুরী-মণ্ডিত হইয়া যৌবনের পরম সুখ ও সহায়স্বরূপ স্বামীর সাহচর্য হারাইয়াও আজ সে নিজেকে রিক্তা বলিয়া স্বীকার করিতে চাহে না, তাহার সর্বশ্রীমণ্ডিত যৌবনকে আত্মশক্তির জোরে পূর্ণ ও সার্থক করিবার জন্য দাবী জানাই-তেছে! এ কি অদ্ভুত মেয়ে—সমাজ-জীবনে এ কি নূতন সমস্যা! সে জানিতে চাহিতেছে, এর সমাধান কিসে ও কোথায়?

কিছুক্ষণ পরে শান্ত কণ্ঠে হরিনারায়ণ বাবু কহিলেন: তুমি যে কঠিন

সমস্যার কথা তুলেছ তরলা ! কিন্তু আমাদের সমাজে স্বামীকে ত্যাগ করে এ সমস্যার সমাধান কি করে সম্ভব হতে পারে বল তো মা ? তুমি তো লেখা-পড়াও অনেক করেছ, অন্য সমাজে এটা কোন রকমে সম্ভব হলেও, এখানে যে একেবারে অচল মা !

গম্ভীর মুখে তরলা জিজ্ঞাসা করিল : অচল কেন ?

তরলার মুখের পানে চাহিয়া অত্যন্ত সহজ কণ্ঠে হরিনারায়ণ বাবু কহিলেন : তার কারণ, আমাদের সমাজে স্বামি-স্ত্রীর মধ্যে রয়েছে একটা অভিন্ন ভাব, একপ্রাণতা। এখানে বিচ্ছেদ নেই।

তরলার মুখের গাম্ভীর্য এ কথায় তরল হাসিতে ভরিয়া গেল, প্রশ্ন করিল : কিন্তু আমার স্বামী তো এই অভিন্ন ভাব ছিন্ন করে, বিবাহের মন্ত্রকে নিরর্থক ভেবে, আর একটি মেয়েকে বিবাহ করে সুখভোগ করতে দূরে সরে গেলেন ; আমার অদৃষ্টেই বুঝি শুধু বিচ্ছেদ ভোগ ! আমাকে তাই মেনে নিতে হবে ?

হরিনারায়ণ বাবু কহিলেন : তোমাকে অবিশ্যি ধৈর্য ধরতে হবে। তোমার স্বামী ধৈর্য হারিয়ে যে কাজ করেছেন, তা অসিদ্ধ, সে বিবাহ বৈধ নয়। পরে এর জন্য তাঁকে অনুতাপ করতে হবে। এই জন্যই বৌমা তোমাকে তাঁকে ফিরে পাবার জন্যে তপস্যা করবার কথা বলেছেন, মা !

তেমনি হাসিয়া তরলা কহিল : এ ব্যবস্থা মন্দ নয় ! বিবাহ নামক বাঁধনে একসঙ্গে দু'জনেই বাঁধা পড়লাম ; এক জন সেটা ছিঁড়ে ফেলে বেরিয়ে গেলেন সুখভোগের আশায়, আর এক জনকে করতে হবে তার জন্য দুঃখভোগ, কৃচ্ছ্রসাধ্য তপস্যা—যেহেতু সে নারী !

হরিনারায়ণ বাবু ধীরে ধীরে মাথা নাড়িয়া কহিলেন : হ্যাঁ মা, তাই। এখানে নারীর দায়িত্ব এবং কর্তব্য অনেক বেশী। স্বামী দোষের কাজ করলেও, স্ত্রীর কর্তব্য হোচ্ছে—স্বামীকে দোষী সাব্যস্ত না করে তাকে দোষ-মুক্ত করে তোলা—দোষীর ব্রীফ নিয়ে কৌন্সলীরা যে ভাবে তাকে

সমর্থন করেন—দোষমুক্ত করে ফিরিয়ে আনতে অনেক কাঠ-খড় পুড়িয়ে থাকেন। এই সহিষ্ণুতা হোচ্ছে নারীর চরিত্রগত গুণ, এই গুণের জন্যে ঋষিরা নারীকে পৃথিবীর সঙ্গে তুলনা করে আখ্যা দিয়েছেন—সর্বংসহা। আরও আশ্চর্য এই মা, গুণবতী নারীদের অদৃষ্টেই এ রকম দুর্ভোগ ঘটে—তার সাক্ষী তো তোমাকেই দেখছি তরলা।

হরিনারায়ণের শেষের কথাটা তরলার মনে একটা কৌতূহলের সৃষ্টি করিল, মুখখানি অমনি হাসিতে ভরাইয়া সে কহিল: আপনার কথা শুনে একটা কথা মনে পড়ে গেল জেঠামশাই! শাস্ত্র যখন মানেন, এটাও মানবেন যে, অদৃষ্টের লিখন খণ্ডায় না। তা'হলে আমি বলি, আমার অদৃষ্টে বিধাতা-পুরুষ যা লিখেছেন, তার বেশী তো হবে না—তা'হলে সেটা খণ্ডন করবার জন্যে নিজেকে খাটো করি কেন?

হরিনারায়ণ বাবু উত্তর করিলেন: বিধাতার লিখন সম্বন্ধে তোমার ধারণাটাও তো ভুল হতে পারে মা!

তরলা কহিল: কত ভুলই তো আমরা সংসারে করে থাকি জেঠামশাই, কিন্তু পরে জানতে পেরে এই বলেই মনকে প্রবোধ দিই, ভগবান যা করেন সে ভালোর জন্যেই। আমিও না হয় বুঝব, আমার ভালোর জন্যেই ভগবান ওটা করেছেন।

বিস্মিত কণ্ঠে হরিনারায়ণবাবু কহিলেন: বল কি, এত বড় ক্ষতিকেও তুমি ভালো বলে ধরে নিতে চাও?

একটু হাসিয়া তরলা কহিল: তা ছাড়া আর উপায় কি জেঠামশাই? স্বামীকে জন্মের মত হারিয়েও আমার মত বয়সের অনেক মেয়ে মন স্থির করে জমিদারী চালিয়েছেন, বিষয় কর্ম দেখা-শোনা করেছেন, সংসার মাথায় করে নিয়েছেন, এ আমার জানা আছে।

হরিনারায়ণ বাবু কহিলেন: সে কথা সত্য, কিন্তু সেই সব মেয়ের মনীষা দেখে আমরা যেমন মুগ্ধ হই, তেমনি স্বামীর দিক দিয়ে তাঁদের

বিরাট দৈন্য দেখে—জন্ম-জন্মান্তরের কত বড় পাপের এ শাস্তি, তার হিসাব করতে বসি নিশ্বাস ফেলে। তাঁদের নারীত্বের নিষ্ঠা সংসারকে অনেক কিছু দিলেও পদে পদে পূর্ণতার অভাব দেখে মনে মনে শিউরে উঠি। আমরা ভাবি, তাঁরা পতিহীনা, অভাগিনী। শাস্ত্রও এখানে ওঁদের সম্বন্ধে বলেছে মা—শত পুত্রের জননী হোলেও পতিহীনা নারীর জীবনে সুখ নেই—ন পতিঃ সুখমেধন্ যাস্যাদপি শতাত্মজা।

মুখখানা সহসা বিকৃত করিয়া তরলা বলিয়া উঠিলঃ আমাকে মাপ করবেন জেঠামশাই, শাস্ত্রের কথা আমার মনে বসে না, অবাস্তবকে আমি মানতে পারি না, গ্রাহ্য করি না। ও-সব শাস্ত্র-বাণীতে আমার কিছুই আসে যায় না।

এ কথা শুনিয়া হরিনারায়ণ বাবু ক্ষণকাল নির্ণিমেষ চোখে তরলার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, তাহার পর মুখে একটু ছদ্ম হাসি ফুটাইয়া কহিলেনঃ কিন্তু আমি বলছি তরলা, তোমার এ সব মনের কথা ঠিক নয়—এ সব হোচ্ছে ধার করা কথা। অনেক পড়া শোনা করেছ কি না, তাই মাথার মধ্যে কোথাও তাল-গোল পাকিয়ে জমাট বেঁধেছিল, এখন মনের তাপ পেয়ে জমাট গলে গেছে, আর সেগুলো কিল-বিল করে বেরিয়ে আসছে। বইয়ে পড়েছ ত, বরফের মধ্যে এক রকম প্রাণী শুকিয়ে ঝুনো হয়ে থাকে, কিন্তু যে-ই বরফ গলতে থাকে, অমনি সেগুলো জীবন্ত হয়ে লম্ফ-ঝম্ফ শুরু করে দেয়।

তরলা একথা শুনিয়া কিঞ্চিৎ গম্ভীর হইয়া কহিলঃ আমার মনের কথা আমার চেয়ে কারুর বেশী জানবার কথা নয় জেঠামশাই! দেখুন স্বামী-সুখ, সংসার-সুখ—এ সবের মর্ম এই ক'বছরে আমি ভালো করেই জেনেছি; আর সেই জানাজানির ফলে এই বুঝেছি—আমাদের সমাজে স্ত্রীর কর্তব্য শুধু দাসীত্ব করা। সংসারে স্বামীই বলুন, শ্বশুর-শাশুড়ীই বলুন, আর ছেলে-পুলেই বলুন, কোনখানেই পাণ থেকে চূণটুকু খসলে

আর নিস্তার নেই। অথচ, এতেই সব মেয়ে মশগুল হয়ে দিন কাটাচ্ছে। মুখে আগুন নারী-জন্মের—আমার ঘৃণা ধরে গেছে।

মুখের ছদ্মহাসিটুকু আরো একটু তীক্ষ্ণ করিয়া হরিনারায়ণ বাবু তরলার মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন কিছুক্ষণ, তাহার পর কহিলেনঃ কিন্তু আমার অনুমানকে তুমি চাপা দিতে পারবে না তরলা, আমি ধরেছি কোনখানে তোমার গলদ। আমি জানি, অভিমান হোচ্ছে পুরুষ আর নারী প্রত্যেকের স্বভাবের একটা অঙ্গ, তবে এ জিনিষটাকে মেয়েরাই বেশী করে আত্মস্থ করে নিয়েছে। অভিমানেরও একটা মাধুর্য যেমন আছে, তেমনি বিপত্তিও তা থেকে বড় কম আসে না; তখন অভিমান আক্রোশে পরিণত হোলে আর নিস্তার থাকেনা; তখন অভিমান মুছে ফেলে আক্রোশে ও ক্রোধের আতিশয্যে নারী যে ভাবে ভয়ঙ্করী হয়ে ওঠে, তখন তাতে আর বাঘিনীতে কোন তফাৎ থাকে না। তাই বলছি মা তরলা, তুমি যদি শুধুই আক্রোশকে মনে স্থান দাও, আমাদের সব কথাই ভেসে যাবে, আর তোমার পরিণামও ভীষণ হয়ে উঠবে।

হরিনারায়ণের কথাগুলি শুনিতে শুনিতে তরলার দুই চক্ষু দিয়া বুঝি আগুন বাহির হইতেছিল। কথা শেষ হইতেই সে কেদারা হইতে উঠিয়া কিঞ্চিৎ বিকৃত কণ্ঠে কহিলঃ আপীলের রায়ও আমার জানা হয়ে গেছে জেঠামশাই! আপনার কথার মধ্য দিয়ে একটা বড় বাস্তব কথা বেরিয়ে এসেছে; সেটি হচ্ছে,—সমাজের এই মেয়েই মনে করলে বাঘিনী হতে পারে। এই কথাটি আমার ভারি ভালো লেগেছে জেঠামশাই, আর এই কথাটি শুনিয়েছেন বলে আমি আপনাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে প্রণাম জানাচ্ছি। আশীর্বাদ করুন, হৃদয়হীন স্বামীকে ফিরে পাবার জন্যে তপস্যা না চালিয়ে, আমি যেন বাঘিনীর মত হুঙ্কার তুলে সমাজের মধ্যে আতঙ্ক জাগাতে পারি—যাতে আমার মত অবস্থার মেয়েরাও সাহস করে এগিয়ে আসবার প্রেরণা পায়।

স্তব্ধ বিস্মিত চমৎকৃত গৃহস্বামীর পদযুগলে হেঁট হইয়া প্রণতি জানাইয়া এবং তাঁহাকে কোন কথা বলিবার অবসর না দিয়াই তরলা বিদ্যুৎ-ঝলকের মত গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল।

চৌদ্দ

কবিরাজ বৈদ্যনাথ গুপ্ত প্রতিষ্ঠাপন্ন ব্যক্তি। কবিরাজী ব্যবসায়ে যেমন তাঁর হাত-যশের সুনাম আছে, তেমনি সহৃদয়তার খ্যাতিও শোনা যায়। এই প্রবীণ বিচক্ষণ চিকিৎসককে বাশুলীর দাতব্য চিকিৎসালয়ের পরিচালক-সংঘে গ্রহণ করিয়া হরিনারায়ণ বাবু গুণগ্রাহিতার পরিচয় দেন। শুধু এই কবিরাজকেই নহে, চিকিৎসা সম্পর্কে যাঁহাদের কিছু না কিছু অভিজ্ঞতা আছে, তাঁহাদের মধ্য হইতেও কয়েক জনকে মনোনীত করা হয়। যেমন হোমিওপ্যাথী চিকিৎসক ভুবন দত্ত, টোটকা চিকিৎসায় বিশেষজ্ঞ কৈলাস চক্রবর্ত্তী এবং হাতুড়ে ডাক্তার যদু ঘোষাল প্রভৃতি। ইঁহাদের মধ্যে কবিরাজ বৈদ্যনাথ গুপ্তই সর্বাধিক কৃতী ও অভিজ্ঞ ব্যক্তি এবং কমিটীর মধ্যে ইঁহার প্রভাবও বেশী। সেই জন্যই ডাক্তার শশী বাগচীর পক্ষ হইতে নিবারণ এই কবিরাজটিকেই হস্তগত করিতে সচেষ্ট হইয়া উঠে এবং তরলাকেও সুপারিশ ধরে।

সেদিনের নির্দেশমত অপরাহ্ণের কিছু পূর্বেই নিবারণ একাকী বৈদ্যনাথ গুপ্তের বাড়ীর উদ্দেশ্যে বাহির হইল। সকালের দিকে তরলার সহিত তাহার একটা বোঝা-পড়া হইয়া গিয়াছে এবং সেই সূত্রে তাহারা পরস্পরকে চিনিবারও সুযোগ পাইয়াছে। প্রথম দিকে নিবারণ অন্ধকারেই ঢিল ছুঁড়িয়াছিল। কিন্তু গৃহস্বামীর কক্ষে প্রবেশ করিয়া তরলা যখন তাঁহার সহিত স্বামীর প্রসঙ্গে বিতর্কে প্রবৃত্ত হয়, নিবারণ তখন

বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া রুদ্ধশ্বাসে প্রতিটি শব্দ পরম পরিতোষের সহিত গলাধঃকরণ করিতে থাকে ; আপন মনেই সে তখন এই বলিয়া আত্মতৃপ্তি লাভ করে যে, তাহার অন্ধকারে লোষ্ট্রপাত ব্যর্থ হয় নাই। আর একটি প্রাণীও পার্শ্ববর্তী কক্ষ হইতে তরলার নির্ভীক কথাগুলি শুনিয়া মনে মনে যাচাই করিতেছিলেন, এ বাড়ীর বধূরাণীর সঙ্গে বাকপটুতায় এই বাচাল মেয়েটির কৃতিত্ব কতখানি। কিছু পূর্বেই স্বামীর সহিত মাধুরী দেবীর কথান্তর হইয়াছিল, নতুবা তিনি এতক্ষণ পর্যন্ত কক্ষান্তরে অদৃশ্য ভাবে থাকিতেন না, নিজেই আত্মপ্রকাশ করিয়া এই গুরুত্বপূর্ণ বিতর্কে অংশ গ্রহণ করিতেন।

গৃহস্বামীকে চমৎকৃত করিয়া তরলা যখন বাহিরের বারাণ্ডায় আসিয়া দাঁড়ায়, ইহার সম্বন্ধে অজ্ঞাত তথ্যগুলির সবই তখন নিবারণের নিকট সুস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে এবং অনাগতের প্রত্যাশায় সেও তখন উৎফুল্ল হইয়া ভাবিতে পারিয়াছে। তাই তরলাকে দেখিয়াই তাড়াতাড়ি নিকটে আসিয়া একান্ত অন্তরঙ্গের মতই সে বলিয়া উঠে—'চলুন, বাড়ী পৌঁছে দিয়ে আসি।' কথাটা শুনিয়া তরলা মুখ তুলিয়া চাহিয়া একটু হাসে, তাহার পর কোমল স্বরে বলে—'এক দিনের আলাপেই কি এতটা মাখামাখি ভালো—লোকের চোখ টাটাবে যে! পথের সাথী হলেও এক সাথে আজই পথ চলা ঠিক নয়। বিকেলে তো যাচ্ছেন—গৃহেই সাথী হবেন ; নমস্কার!' তরলার সেই সকৌতুক মিষ্ট কথাগুলি তখন হইতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া মনে মনে জপ-মন্ত্রের মত পাঠ করিয়াছে নিবারণ; সেই কথাগুলি নিঙড়াইয়া তাহাদের এমন একটা নির্গলিতার্থও বাহির করিয়া ফেলিয়াছে সে, তরলার আমন্ত্রণ রক্ষায় যাহা হইয়াছে নিরঙ্কুশ পাথেয় স্বরূপ।

বাহিরের ঘরে তাহারই প্রতীক্ষা করিতেছিল তরলা। হিসাব করিয়া নিবারণের আসিবার সময়টির যে নির্ঘণ্ট সে ঠিক করিয়া দিয়াছিল

বিশ্রম্ভালাপের পক্ষে তাহা সুপ্রশস্ত। সাধারণত রোগী দেখিয়া বাড়ী ফিরিতে কবিরাজ মহাশয়ের মধ্যাহ্ন অতীত হইয়া যায়; কাজেই মধ্যাহ্ন-ভোজনের পাট চুকিতে আর এক প্রহর কাটে এবং ভোজনান্তে তরলা ছাড়া বাড়ীর প্রত্যেকেই দিবা-নিদ্রায় অভ্যস্ত। সুতরাং চারি ঘটিকা পর্যন্ত বৃহৎ বাড়ীখানি নিস্তব্ধ হইয়া থাকে। এই সময়টা তরলার পক্ষে মাহেন্দ্র যোগ—বই পড়া, গান-বাঁধা ও পাড়া-পরিক্রমার কাজগুলি পর্যায়ক্রমে চলে। পিতৃ ও শ্বশুরকুলের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে তরলাও নিজেকে এমনি প্রতিষ্ঠাপন্ন করিয়া লইয়াছে যে, প্রতিবাসীরা বাড়ীতে তাহাকে পাইলে যেন বর্তাইয়া যান, তরলার শুভাগমনেই বাড়ী যেন গুলজার হইয়া উঠে—খবর পাইবা মাত্র পাশের বাড়ীর মেয়েরাও সে বাড়ীতে আসিয়া ঘিরিয়া বসে এই বাক্-পটীয়সী মেয়েটিকে, তাহার মুখে নূতন নূতন কথা ও কাহিনী শুনিয়া তাহাদের জ্ঞান-ভাণ্ডারের সঞ্চয় বাড়াইতে প্রলুব্ধ হইয়া উঠে প্রত্যেকেই। প্রতিবাসী-মহলে এমনি প্রতিষ্ঠা এই মেয়েটির।

তখনও তিনটা বাজে নাই—কবিরাজ-বাড়ীর প্রায় সকলেই দিবা-নিদ্রায় নিমগ্ন; বালক বালিকারা বিদ্যালয়ে গিয়াছে—দাস-দাসীদেরও সাড়া-শব্দ নাই। বড় বাড়ী হইতে ফিরিবার সময় তরলা নিবারণকে বলিয়া দিয়াছে—তিনটার সময় আসিলেই ঘণ্টা খানেক ধরিয়া তাহাদের কথা-বার্তার সুযোগ ঘটিবে। অপ্রত্যাশিত ভাবে অল্প কিছুক্ষণের জন্য এই মেয়েটির সঙ্গ ও সংলাপ নিবারণকে এমনি অভিভূত করে যে, পুনর্মিলনের বিলম্ব বিরহের মতই যেন তাহার পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠে; তাই তিনটার খানিকটা আগেই সে আসিয়া পড়িয়াছে। গৃহদ্বার রুদ্ধই ছিল; দ্বারের কড়া দু'টি ধীরে ধীরে নাড়িতেই কড়ার কর্কশ শব্দের সঙ্গে সঙ্গে বাহিরের ঘর হইতে কোমল কণ্ঠধ্বনি শোনা গেল: দরজা ভেজানো আছে—ঠেলে আসুন।

দ্বারের রুদ্ধ দু'টি কবাট ঠেলিতেই দ্বার খুলিয়া গেল। সামনেই ছাদযুক্ত

একটু দেউড়ী,তার দুই পার্শ্বে দুইখানি ঘর। বাম দিকের ঘরখানি কবিরাজ-খানা—দক্ষিণের ঘরে সকাল-সন্ধ্যায় ছেলে-মেয়েদের লেখা-পড়ার পর তরলার অধিকারে আসে। বর্তমান যুগে মেয়েদের জীবনধারা সম্বন্ধে তরলাও একটা মতবাদ খাড়া করিয়াছে—আজিকার ব্যাপারে নিজের অবস্থাটাকে উপলক্ষ করিয়া প্রতীকার সম্পর্কে একটা বলিষ্ঠ পরিকল্পনাও সে স্থির করিয়া ফেলিয়াছে; কাগজে-কলমে তাহাই লিপিবদ্ধ করিতেছিল।

ভিতরে প্রবেশ করিতেই তরলার স্বরে আকৃষ্ট হইয়া নিবারণ ডান দিকের কক্ষটির পানে চাহিল। মুক্ত দ্বারপথে দাঁড়াইয়া তরলা সহাস্যে গৃহাগত অতিথিকে 'আসুন' বলিয়া অভ্যর্থনা করিল। গৃহ-প্রবেশের জন্য চাতালটির উপর নিবারণ উঠিতেই তরলা তাড়াতাড়ি দ্বারদেশ হইতে নামিয়া আসিয়া ফটকের দরজা দু'টি বন্ধ করিয়া দিয়া কহিল: চলুন।

মাঝারী রকমের ঘরখানি—প্রথমেই পাশাপাশি দুইখানি তক্তপোষ পাতা, উপরে একখানি সতরঞ্চি বিছানো; কিনারার দিকে দেওয়াল ঘেঁসিয়া কয়েকটি ডেস্ক এবং পড়ুয়াদের লেখা-পড়ার সাজ-সরঞ্জামগুলি চারি দিকে ছড়ানো। ইহার পরেই মাঝে একটু ব্যবধান রাখিয়া একটি টেবিল, আশে-পাশে খান তিনেক চেয়ার, দেওয়ালের দিকে একটা আলমারী—তার তাকগুলি নানাবিধ গ্রন্থে পূর্ণ এবং সুন্দর ভাবে সাজানো। টেবিলের উপর কয়েকখানি বই, লিখিবার প্যাড ও অন্যান্য সরঞ্জাম।

একখানি কেদারা আগাইয়া দিয়া তরলা বলিল: বসুন নিবারণবাবু। দেখতেই পাচ্ছেন, আপনাদের প্রাসাদের তুলনায় আমাদের এ আস্তানা পর্ণশালা, তবুও আপনাকে বসবার জন্য অনুরোধ করছি।

কথাটার যোগ্য উত্তর নিবারণের মুখে আসিল না, সে শুধু মৃদু হাসিয়া টানিয়া-টানিয়া বলিল: এ সব কথা বলে আমাকে লজ্জা দেবেন না— আপনার সঙ্গে আমি কথায়ও পারব না; তবে এইটুকু আমি বলে রাখছি

ধরণের মেয়ে পাওয়া গেছে, তার জুড়ি নেই—কোন দিন মিলবে না। তবে আমাদের সমাজের বাইরে থেকে তা হয়ত মিলতে পারে। কিন্তু তার পরিণাম কি জানেন—সমাজের গণ্ডী ভেঙ্গে বেরুতে হবে। আমি তাতে পেছ-পাও নই, সে সাহস আমার আছে। কাজেই বিয়ে করে মনের মত সাথী সংগ্রহ করবার উপদেশ এর পর অন্তত আপনার কাছ থেকে যেন আর শুনতে না হয়।

স্তব্ধ ভাবেই তরলা নিবারণের কথাগুলি শুনিতেছিল এবং বোধ হয় এই কথার মধ্য দিয়াই সে নিবারণের কাম্য সাথীটির কিছু আভাসও পাইল। পরক্ষণে সে মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিলঃ আপনার মতলব আমি বুঝিছি নিবারণবাবু, আপনি এমন একটি সাথী চান, আপনার পাশে দাঁড়িয়ে বড় বাড়ীর বৌরাণীর সঙ্গে প্রতিযোগিতা করবার মত সাহস, শক্তি ও সামর্থের যার অভাব নেই, আর জাতি-ধর্ম্মের কোন বাচ-বিচার বাধ্য-বাধকতাও সেখানে নিষ্প্রয়োজন, এই তো ?

কৌতূহলী হইয়া নিবারণ কহিলঃ আমি কিন্তু আপনার নিজের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থাটি জানবার জন্যই উদ্‌গ্রীব ছিলাম ; যেটুকু আজ জানতে পেরেছি, তার পরের অধ্যায়টি না জানা পর্যন্ত যেন সোয়াস্তি পাচ্ছি না। কিন্তু আসবা মাত্রই আপনি আমার কথাই এমন করে ফেঁদে বসলেন যে, বিস্ময়ের সঙ্গে একটা প্রচণ্ড কৌতূহলও আমার মনের কাণা ছাপিয়ে উঠেছে।

নিবারণের কথাগুলি শুনিয়া, বিশেষত কথা বলিবার বিচিত্র ভঙ্গি দেখিয়া, তরলা হাসিয়া ফেলিল এবং সেই হাসির রেখা সারা মুখখানিতে ফুটাইয়া সে কহিলঃ দেখুন, কান টানলে যেমন মাথা এগিয়ে আসে, আপনার কথার টানে তেমনি আমার প্রাণের কথাও বেরিয়ে আসবার মত হয়েছে, আপনি যে সেটা বুঝতে পারেননি তা মনে হয় না। আমার সম্বন্ধেও আপনার মনে যে একটা কৌতূহল রীতিমত ফুটে উঠেছে তাতে

ভুল নেই। তার উপর আমার স্বামীর সঙ্গে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হোলেও সাধারণ মেয়েদের মতন জোড়া-তাড়া দিয়ে সে সম্বন্ধটাকে আমি যে গেঁথে রাখতে চাই নে, সে খবরও আপনি জেনেছেন। কাজেই এর পর আপনার কাছে এ জানাটাও খুবই প্রয়োজন হয়ে পড়েছে যে, স্বামীর সঙ্গে আমার সম্প্রীতি কতখানি ছিল; অর্থাৎ সোজা কথা এই হোচ্ছে, স্বামীকে আমি ভালবাসতাম কিনা?

লজ্জায় আরক্ত ও অপ্রস্তুতের মত হইয়া নিবারণ কহিল: এই দেখুন, কি কথা থেকে আপনি কোন্ কথা এনে ফেললেন! আমার প্রশ্ন না শুনেই আপনি তার উত্তর নিয়ে পড়লেন যে!

তরলা নিঃশব্দে নিবারণের মুখের পানে চাহিয়া শান্ত কণ্ঠে কহিল: সব প্রশ্ন কি সব সময় মুখ দিয়ে নির্গত হয় নিবারণবাবু, মুখ দেখে আর অবস্থা বুঝে সেটা ধরে নিতে হয়। এই ধরাটাই হোচ্ছে মেয়েদের বাহাদুরী। অবিশ্যি, এটা ধরবার জন্যে আমাকেও আপনার মনের ভিতরটা তলিয়ে দেখতে হয়েছিল বৈ কি! স্বামীর দিক দিয়ে আমার দৈন্যটুকু জানতে পেরে যখনই আপনি সহানুভূতি দেখিয়েছেন, তখনই আমি ধরে নিয়েছি যে, যদি আমার জিদ রাখবার জন্য কোন শক্তিমান লোকের সাহায্য আবশ্যক হয়, বিধাতা সে লোককে গোড়াতেই যুগিয়ে দিয়েছেন। রাজীব-বাবুকে নিশ্চয়ই আপনি চেনেন, শুনতে পাই বৌরাণী নাকি তাঁকে চিনে ফেলে নিজেদের জাতে তুলে নিয়েছেন। অথচ ঐ রাজীব আমার স্বজাতি, বৌরাণীর আগেই তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয়, আর ঘনিষ্ঠতাও কম ছিল না। কিন্তু আমার এই সংকটে কোন সহানুভূতি তাঁর কাছে আমি পাইনি। ভরসাও তিনি দেন নি। এমন কি, তাঁকে সঙ্গে নিয়েই বৌরাণীর মহলে গিয়েছিলাম, কিন্তু বৌরাণীর কথা সহ্য করতে না পেরে যখন তাঁর এজলাস ছেড়ে উঠে আসি, রাজীববাবু সেখানে রয়ে গেলেন, আমার সঙ্গে ফিরে আসাটাও আর প্রয়োজন বোধ করলেন না; তার কারণ, বৌরাণীর মত

তিনিও আমার প্রতি বিরূপ হয়েছেন। ঠিক সেই অবস্থায় আমার ভাগ্য-দেবতা মিলিয়ে দিলেন আপনাকে—স্বল্প কথার মধ্যেই বুঝলাম যে, পথের সাথী আমি পেয়েছি ; তবুও যে সন্দেহটুকু ছিল, এখানে এইমাত্র নিজের সম্বন্ধে যে সব কথা শোনালেন তাতে সবই পরিষ্কার হয়ে গেছে। কাজেই আপনার মনে যে প্রশ্ন জেগেছে, অথচ মুখে বলতে কুণ্ঠিত হচ্ছেন—আমি সেটা জানতে পেরেছি বলেই সেই প্রসংগে এত কথা খুলে বলতে বাধ্য হলাম, নিবারণবাবু !

বিস্ময়ে অভিভূত হইবার মত মুখভংগি করিয়া নিবারণ কহিল : সত্যই আপনার অনুমান-শক্তি অসাধারণ। যে স্বামী আপনাকে ত্যাগ করে অন্য মেয়েকে বিবাহ করেছেন, সেই স্বামীর প্রতি নিষ্ঠা রাখবার জন্য একঘেয়ে ও এক তরফা উপদেশ আপনাকে অগ্রাহ্য করতে দেখে স্বভাবতঃই মনে এ প্রশ্ন জাগতে পারে যে, আপনি পূর্ব থেকেই আপনার স্বামীকে ভালোবাসতেন কি না ? কিন্তু এই ছোট্ট প্রশ্নটির সম্পর্কে আপনি নানা ফ্যাঁকড়া বার করে এত কথা এনে ফেললেন যে, আসল উত্তরটা কিন্তু তার মধ্যে চাপা পড়ে গেছে।

তরলার মুখের দীপ্তি আরো একটু প্রখর হইয়া উঠিল এবং ক্ষণকাল সে নীরব থাকিয়া সহসা একটুখানি হাসিবার চেষ্টা করিয়া কহিল : প্রশ্ন ছোট হওয়াই দস্তুর নিবারণবাবু, কিন্তু উত্তর তো তা নয়, তার অনেক ফেঁকড়া। আর এই ভালোবাসার প্রশ্নটার চেয়ে উত্তরটি হোচ্ছে বেশী জটিল। আমাদের সমাজে গৃহস্থ ঘরের কোন মেয়েকে ও প্রশ্ন যদি করেন, পারবে কি সে তখনি তার প্রকৃত জবাব দিতে ? আমাদের যে গণ্ডীবদ্ধ জীবন, তাতে সত্যিকার ভালোবাসা কি ঠিক মত দানা বেঁধে ওঠবার ফুরসদ পায় ? ধরুন, বিয়ের সম্বন্ধ করলেন বাবা, আমার যাঁকে ভালোবাসার কথা অর্থাৎ যিনি হবেন আমার স্বামী-দেবতা,—তাঁকে দেখে পছন্দ করলেন তিনিই ; আমি শুধু আড়ালে থেকে শুনেই খালাস। প্রথম দেখলাম

তাঁকে ছাদনাতলায়—শুভ-দৃষ্টির সময় ; সারা দিন উপবাস করে দেহ-মন অবসন্ন—সেই সময় হলো শুভ-দর্শন, তাও ক্ষণিকের জন্য ! আপনি নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন যে, দৃষ্টি সবার সমান নয় ; কাজেই, সেই নিমেষের দেখাতেই যে তাঁকে ভালো লাগবে এমন কোন কথা নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁকে ভালোবাসতেই হবে, অন্ততঃ ভালোবাসার সেই ভাবটুকু জোর করে মনের মধ্যে ঢোকানো চাই-ই ! অর্থাৎ বিয়ের ঐ দুর্বোধ্য মন্ত্রগুলোর কোনো মানে না বুঝলেও শুধু সংস্কারের বশে তাকে মানতেই হবে স্বামী-দেবতাকে, আর চোখে-মনে না ধরলেও চোখ দিয়ে মনকে ঠেরে ভালবাসবার ভাণ করতেই হবে। তাহলে বলতে হয়—সে হিসেবে আমি আমার স্বামীকে ভালোবেসেছিলাম বৈ কি। কিন্তু তা বলে একেবারে যে ভালোবাসায় বিহ্বল হয়ে পড়েছিলাম, বিয়ের মন্ত্রের বলে আমাদের দেহ-মন-প্রাণ-চিন্তা সব এক হয়ে গিয়েছিল—এ কল্পনা যেমন করতে পারিনি, তেমনি সেই ভালোবাসা যে চিরস্থায়ী—তাকে ভোলা শক্ত কিংবা সেই ভালোবাসাই আবার বিদ্বেষে পরিণত হতে পারে না—এমন ধারণাকেও মনে স্থান দিইনি, অন্ততঃ আমি। তাহলেই বুঝুন, স্বামীকে আমি ভালোবাসতাম কি না, আর বাসলেও তার কি মান বা ধারা ছিল।

নিবারণের মনে বাস্তবিকই যে প্রশ্নটি ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিয়াছিল অথচ বলিতেও চক্ষুলজ্জায় বাধিতেছিল, চক্ষুলজ্জার আবরণ অকাতরে ছিঁড়িয়া ফেলিয়া অন্তর্যামিনীর মত এই বিবাহিতা মেয়েটিকে সেই প্রচ্ছন্ন প্রশ্ন ও উত্তর একসঙ্গে এ ভাবে স্পষ্ট করিয়া বলিতে শুনিয়া সে যে শুধু বিস্ময়াপন্ন হইল তাহা নহে, স্বামীর সম্পর্কে পত্নীর সত্যকার মনোভাবের এমন সত্য রূঢ় ও অকপট প্রকাশ তাহাকে কিঞ্চিৎ অপ্রতিভও করিয়া ফেলিল। বিমূঢ়ের মত ক্ষণকাল স্তব্ধ ভাবে বসিয়া থাকিয়া অতঃপর নিবারণ কহিল : আপনি কিছুই রেখে-ঢেকে বলতে ইচ্ছা করেন না দেখছি !

কথাটা শুনিয়া তরলা হাসিবার চেষ্টা করিয়া কহিল : আপনার কথা আমি বুঝিছি। মানুষের মনে পুরোনো সংস্কারের শিকড় এমনি করে শক্ত হয়ে বসে যায় যে, সহজে তাকে তুলতে পারে না। তার মনে নতুনের আলো পড়লেও ঐ পুরোনো সংস্কার তাকে ঢেকে রাখে। এর ফল হয় কি জানেন? ঐ পুরোনো পচা সংস্কারকে মন দিয়ে মানতেও পারে না, আবার নতুনের আলোয় মন ভরে গেলেও তাকে উপভোগ করতেও ভরসা পায় না—পিছন থেকে ঐ আলোর উপরে পড়ে সংস্কারের আবছায়া।

সহাস্যে নিবারণ কহিল : বুঝিছি, আপনার মনে ও-সব সংস্কারের বালাই নেই—আপনি সব কাটাতে পেরেছেন।

এ কথা শুনিয়া তরলা সহসা ঘাড় বাঁকাইয়া কহিয়া উঠিল : আর কি বুঝেছেন একটু পরিষ্কার করে বলুন—আপনার বোধশক্তিটাও যাতে ভাল ভাবেই বোধগম্য হয়।

একটু লজ্জার ভাব প্রকাশ করিয়া আস্তে আস্তে নিবারণ কহিল : বুঝিছি এই, আপনি ঐ পুরোনো সংস্কারের মোহ কাটাতে পেরেছেন—নতুনের আলোর ঝলকানির ভিতর দিয়ে খাঁটি বস্তুটা চিনে নিতে শিখেছেন। যাকে ভালো না লাগলেও সংস্কারের বশে ভালোবাসতেও বাধ্য হয়েছিলেন, তাঁর এই আকস্মিক অবহেলাই আপনার মনে আনলো এক পরিবর্তন, চোখে জাগলো এক নতুন আলোর ঝলকানি, এ যেন ঠিক শাপে বর হোয়ে এলো, আর আপনিও গতানুগতিক সংস্কারের মোহ কাটিয়ে ফেললেন; আপনার দেহের যৌবন আর মনের সাধ যা ঝিমিয়ে পড়েছিল, সেটা আবার প্রাণবন্ত হয়ে উঠল; পুরোনো সংস্কারের মোহমুক্ত হয়ে মুক্তির নেশা আপনাকে সচেতন করে তুলল; কিন্তু এমনি আপনার অদৃষ্ট যে, মনের উল্লাস মনে চেপে আপনি ছুটলেন যাঁর কাছে প্রচুর আশা-ভরসা নিয়ে—তিনিই আপনাকে সেই পুরোনো সংস্কারের অন্ধকূপেই আবার

বন্দিনী করতে চাইলেন। তিনি হয়ত আপনাকে ভুল বুঝলেন, কিংবা চাইলেন না আপনার নারীত্বকে ফুটিয়ে তুলে নিজের প্রতিষ্ঠাকে খর্ব করতে। এটা তিনি ভাবলেন না যে, মুক্তির নেশা যাকে মাতিয়ে দিয়েছে, যুক্তির শিকল দিয়ে তাকে বেঁধে রাখা যায় না। আজকের দিনে আপনার সঙ্গে মিশে আমি আপনাকে যেটুকু বুঝিছি আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে, সেইটিই খুলে বললাম। যদি ভুল বুঝে থাকি, মাপ করবেন আমার দুর্বুদ্ধিকে, আর যদি অনুমান আমার ঠিক হয়ে থাকে, তাহলে এইটুকুই আপনার কাছে আমার প্রত্যাশা—পথের সাথী হবার জন্যে যে ইঙ্গিত ও-বাড়ীতে করেছেন সেটি যেন সার্থক হয়।

তরলা অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইয়া কিছুক্ষণ ধরিয়া নিবারণের মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া কহিল: আপনার অনুভব-শক্তি যে এত গভীর ও নিখুঁত, আমি কিন্তু তা ভাবতে পারিনি নিবারণবাবু! এখন তাহলে বলি, বৌরাণীর মহল থেকে বেরিয়ে এসে প্রথমেই যখন আপনাকে দেখি, তখনই মনে একটা সংকল্প জাগে আপনাকে স্বপক্ষে টেনে নেবার; হয়ত বৌরাণীর উপর মনটি তখন বিরূপ হয়ে উঠেছিল বলেই আপনাকে তাঁর প্রতিপক্ষ জেনে মনটা ওভাবে প্রলুব্ধ হয়ে ওঠে। জানেন ত, মানুষ যখন একবারে একান্ত অসহায় হয়ে পড়ে, তখন সামান্য একটা কুটোকেও অবলম্বন ভেবে ধরবার জন্যে হাত বাড়ায়। আপনার খ্যাতি-প্রতিপত্তি আগে যাই থাকুক, সাম্প্রতিক হাঙ্গামায় বৌরাণীর কাছে যে-ভাবে আপনাকে পরাজয় মেনে নিতে হয়েছে, তাতে আপনার উপর ভরসা করবার বিশেষ কিছু ছিল না—তবুও আপনাকে উপেক্ষা করতে আমার মন সায় দেয়নি। কিন্তু ক্রমে ক্রমে আপনার মনের পরিচয় পেয়ে বুঝতে পারছি যে, আমি ঠকিনি, আর যে অবলম্বন পেয়েছি তা অকর্মণ্য নয়! এখন সত্যিই মনে আশ্চর্য ঠেকছে, সব দিক দিয়ে এমন চৌখস হোয়েও আপনাকে হার মানতে হয়েছিল!

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া নিবারণ কহিল: তার জন্যে আমি নিজেকেই

দায়ী মনে করি। বিশু ডাক্তারকে মুরুব্বী না ধরে আমি যদি নিজেই বুদ্ধি চালাতাম, তা হোলে ও-ভাবে মাৎ হোয়ে যেতাম না নিশ্চয়ই। তবে এটাও ঠিক যে, জিতবার আশা যার মনে বদ্ধমূল থাকে, দায়ে পড়ে সে হার মানলেও সেইটেই তাকে চেতনা দেবার উপলক্ষ হোয়ে দাঁড়ায়। ইতিহাসে পড়েছেন তো, মহম্মদ ঘোরী প্রথম যুদ্ধে হেরে গিয়ে পৃথ্বীরাজের কাছে দাঁতে কুটো নিয়ে মাপ চাইতে লজ্জাবোধ করেননি। তার পর সেই ঘোরী পরের বছরে বুদ্ধি খেলিয়ে যুদ্ধ জয় করে তার শোধ কি ভাবে নিয়েছিলেন, সেও তো জানেন!

অভিনব পুলকের স্বচ্ছ আলোকে তরলার দুই চক্ষু ঝক-ঝক করিয়া উঠিল; সঙ্গে সঙ্গে মুখখানিও তাহার নির্মল হাসিতে ভরিয়া গেল। কিছুক্ষণ নীরবে নিবারণের মুখের পরে চাহিয়া থাকিয়া সে সহাস্যে কহিল: আপনিও যে পরাজিত হোয়ে হাল ছাড়েন নি, ডাক্তার নেওয়া ব্যাপারে আপনার জিদ আর উৎসাহ থেকেই কিছুটা জানা গিয়েছিল, এখন আপনার কথায় ভালো করেই জানতে পারলাম যে, জিতবার আশাও ত্যাগ করতে পারেন নি।

উৎফুল্ল মুখে নিবারণ কহিল: এই সঙ্গে এ কথাও এখন বলতে পারেন, আপনার সংযোগে সে আশা আরও দৃঢ় হয়েছে এবং এক দিন তা পূর্ণ হবেই।

কথাটা শুনিয়া খিল-খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল তরলা এবং সেই উচ্ছ্বসিত হাসির গমকের মধ্যেই বলিয়া ফেলিল: যেহেতু আমার পথের সাথী হয়েছেন এবং আমরাও দু'জনে এক জাতের মানুষ হয়েছি। এখন কিন্তু একটা কথা আসছে—যেটা ভাববার মত।

তরলার বিহসিত মুখের পরে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া নিবারণ কহিল: আমার কিন্তু এক কথা—আমরা দু'জনে এক হয়েছি; এর মধ্যে এমন কথা আর কি থাকতে পারে বলুন, যা ভাববার মত?

তরলা কহিল : তাহলে শুনুন—প্রকৃতির দিক দিয়ে আমরা এক হোলেও আকৃতির দিক দিয়ে আমাদের তফাৎ মানবেন ত ? মনের মিল হোলেই হয় বন্ধুত্ব ; কিন্তু সমাজ যেই দেখবে, আমাদের বন্ধুত্ব হোয়েছে, অমনি তাই নিয়ে চার দিক থেকে রটে উঠবে কুৎসা—নারী-পুরুষের বন্ধুত্ব সাদা মনে কেউ স্বীকার করবে না, পদে পদে আমরা পাব বাধা।

দৃঢ় স্বরে নিবারণ কহিল : কিন্তু আমরা সে বাধা মানব কেন ? আমাদের সংগ্রাম তো অন্যায়ের বিরুদ্ধে। বিয়ের মন্ত্রের জোরে স্বামী স্ত্রীকে বরাবর দাবিয়ে রেখেছে, স্ত্রীর এখানে কোন দাবী নেই। বিবাহিতা স্ত্রীকে ত্যাগ করে পুরুষ অন্য স্ত্রী গ্রহণ করলেও আগের স্ত্রীকে স্বামীর মুখ চেয়ে পড়ে থাকতে হয়। এই প্রথার বিরুদ্ধেই আপনার সংগ্রাম ; কাজেই এ সংগ্রাম সমাজের বিরুদ্ধে। সমাজ তো আমাদের কুৎসা করবেই। তার জন্য আমাদের কি ভয় ?

একটু গম্ভীর হইয়া তরলা কহিল : সমাজকে আমার ভয় নেই নিবারণ-বাবু, মিথ্যা রটনাকেও আমি গ্রাহ্য করি না ; অযথা অপবাদ কুহেলিকার মতই অসার, তার স্থায়িত্ব কোথায় ? এদিক দিয়ে আমার ভয় নেই।

নিবারণ উৎসুক হইয়া উঠিল, দুই চক্ষুর দৃষ্টি তরলার মুখে নিবদ্ধ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল : তাহলে জানতে পারি—ভয় আপনার কোন দিক দিয়ে ?

অবিচলিত কণ্ঠে তরলা কহিল : সাথীর দিক দিয়েই ভয় আমার নিবারণবাবু, যদি বন্ধুত্ব কোন দিন বিকৃত হয়ে যায়—পথের সাথী হঠাৎ পথের বাধা হয়ে ওঠেন, তখন সমাজের সঙ্গে লড়াই করব কেমন করে—আর ঐ অপবাদকে কি বলে ঠেকাব বলুন ত ? এই জন্যই বলছিলাম, প্রকৃতির মিল যতই হোক, আকৃতির দিক দিয়ে পার্থক্যও কম বাধা নয়।

মুখখানা শক্ত করিয়া কণ্ঠস্বরে রীতিমত জোর দিয়া নিবারণ

কহিল: এদিক দিয়েও আপনি নির্ভয় থাকবেন বরাবর, এ আশ্বাস আমি আপনাকে দিতে পারি। যে প্রকৃতি আর আকৃতির কথা বললেন আপনি, ওদের মধ্যে কোন পার্থক্যই থাকবে না আমাদের কাছে। আমি আপনাকে বন্ধু বলেই মেনে নিয়েছি, আর তাই মানবো; আমি জানবো যে, আমার জেদ ও প্রতিহিংসার মূর্তি ধরে আপনি আমার সঙ্গে মিশেছেন—ঘী আর আগুনের মত আমাদের সম্বন্ধ নয়, এ হোচ্ছে একটা জেদের সঙ্গে আর একটা জেদের মিল।

নিবারণের কথার সঙ্গে সঙ্গে তরলা সবেগে কেদারা হইতে উঠিয়া নিবারণের দিকে ডান হাতখানি বাড়াইয়া দিয়া স্নিগ্ধ স্বরে কহিল: তাহলে হাতে হাত দিন নিবারণবাবু! আমাদের মধ্যে গরমিলের আর কোন ভয় রইল না; আমরা ঠিক পুরুষ আর নারী নই—দু'টি—জিদ, অভিন্ন বন্ধু।

যন্ত্র-চালিতের মত নিবারণও তৎক্ষণাৎ উঠিয়া তাহার হাতখানি বাড়াইয়া দিল—তাহার কণ্ঠ দিয়া গাঢ় স্বরে নির্গত হইল: বন্ধু!

এই সময় ভিতরের দিকে পরিচিত একটা শব্দ শুনিয়া তরলা নিবারণের হাত হইতে হাতখানি তাড়াতাড়ি ছাড়াইয়া লইয়া কহিল: বাবা উঠেছেন, আমি দেখছি; আপনি বসুন।...মিনিট কয়েক পরেই সে ফিরিয়া আসিয়া কহিল: বাবা ও ঘরে এসেছেন—আপনি আসুন।

বিপরীত দিকের ঘরখানি কবিরাজখানার উপযুক্ত করিয়া সাজানো। তক্তপোষের উপর শুভ্র চাদরে আবৃত ফরাস বিছানা। মধ্যস্থলে কবিরাজ মহাশয়ের বসিবার স্থান; একখানি কারপেটের আসন আস্তৃত, তাহার পরেই প্রকাণ্ড একটি তাকিয়া। তাহাতে পৃষ্ঠ রক্ষা করিয়া প্রবীণ কবিরাজ বৈদ্যনাথ গুপ্ত নিবারণের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। তরলার পিছনে নিবারণ কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিতেই বৈদ্যনাথ সসম্ভ্রমে উঠিয়া তক্তপোষ হইতেই তাহার উদ্দেশে প্রণাম করিয়া কহিলেন: কি সৌভাগ্য আমার—বসুন।

নিবারণ কহিল : করছেন কি ? আপনি আমার পিতৃতুল্য, আমাকে—

বৈদ্যনাথ কহিলেন : পিতৃবয়সী বলেই তো আর ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করিনি। একে ব্রাহ্মণ, তায় ভূস্বামী ; প্রণাম করব না! বসুন, আপনি বসুন।

উভয়েই উপবেশন করিলে সবিনয়ে নিবারণ কহিল : আমাকে আপনি বলে লজ্জা দেবেন না। আমি আপনার পুত্রস্থানীয়। বিশেষ প্রয়োজনেই আমাকে আপনার কাছে আসতে হয়েছে, আর সে প্রয়োজনের প্রসংগটাও বোধ হয় আপনার কন্যার কাছে শুনেছেন। এখন—

তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিবারণের মুখে নিবদ্ধ করিয়া বৈদ্যনাথ কহিলেন : হ্যাঁ, সবই আমি শুনিছি। বাগচি মশাইও নিজে আমার সঙ্গে দেখা করে গেছেন। ব্যাপারটি সবই বুঝছি নিবারণবাবু, ডাক্তার বাগচি যে খুব বিচক্ষণ আর বিজ্ঞ ব্যক্তি তাতে কোন সন্দেহ নেই। বহু কাল চিকিৎসা করেই মাথার চুল পাকিয়েছেন তিনি ; ওঁকে নেওয়া হোলে ডাক্তারখানার গৌরবই বাড়বে বলে মনে করি। এখন মুস্কিল হয়েছে, ওঁর আসবার আগেই বিজ্ঞাপন দিয়ে কলকাতার ঐ ডাক্তারকে ডাকা। নৈলে তো এ সব হাঙ্গামার প্রয়োজনই ছিল না। তবে কথা হোচ্ছে, তিনিও এমন কোন নামজাদা চিকিৎসক নন যে ডাক্তার বাগচিকে ঠেলে ফেলে তাঁকেই নেওয়া হবে ; আর, চিকিৎসার ব্যাপারে ছেলে-ছোকরা ডাক্তারের চেয়ে বাগচি মশায়ের মত প্রবীণ ডাক্তারকেই সবাই পছন্দ করবেন। কাজেই এর জন্যে ধরাধরি বৃথা, উনিই ও চাকরী পাবেন।

নিবারণ কহিল : আপনি যে সব যুক্তিপূর্ণ কথা বললেন, কমিটীর আর সবাই ঠিক এই কথাই বলেছেন ; তাঁদের মধ্যে প্রায় সকলেরই ইচ্ছা যে, বাগচি মশাই ঐ চাকরী পান।

বৈদ্যনাথ কহিলেন : তাহলে তো সব চুকেই গেল, আর ভাবনা কি ? কমিটীর সবাই যদি ডাঃ বাগচিকে চান—

নিবারণ কহিল: তবুও একটু গোল আছে কবিরাজ মশাই! মেম্বরদের মধ্যে বাপুলী মশাই বোধ হয় বেঁকে দাঁড়াবেন—ডাঃ বাগচিকে নেওয়া হয়, তাঁর এ ইচ্ছা নয়। কলকাতার ডাক্তারটির দিকেই তাঁর ঝোঁক বেশী। তাই আশঙ্কা হয়, মেম্বররা শেষ কালে তাঁর কথায়—

সন্দিগ্ধ কণ্ঠে বৈদ্যনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন: তাঁর সম্বন্ধেই বা এ সন্দেহ কেন? বাপুলী মশাইএর মত বিচক্ষণ ও বিবেচক ব্যক্তি কখনো অন্যায়ের সমর্থন করতে পারেন না। আমরা সকলেই যদি ডাক্তার বাগচিকে যোগ্য বলে মনে করি, তিনি কখনই আমাদের মতের বিরুদ্ধাচরণ করবেন না, এ বিশ্বাস আমার আছে।

তরলা এই সময় কহিল: এই ডাক্তার নির্বাচন নিয়ে বড়-বাড়ীতে দু'টো দল যে গড়ে উঠেছে, আপনি হয়ত সে খবর রাখবার সময় পাননি বাবা! এক দল চাইছেন, ডাক্তার বাগচিকে রাখা হোক; আর এক দলের জিদ হোচ্ছে—কলকাতার ডাক্তারকেই নেওয়া উচিত।

বৈদ্যনাথ মৃদু হাসিয়া কহিলেন: নিজের ব্যবসায়ে ব্যস্ত থাকলেও বড়-বাড়ীর এই দলাদলির খবর আমারো অজানা নেই মা! তবে এ কথাও ঠিক, দুই দলের পিছনেই জোরালো যুক্তি আছে। শেষের দলে বাপুলী মশাই আছেন বলে নিবারণবাবু যে সন্দেহ করছেন, আমি কিন্তু তাতে সায় দিতে পারছি না; তার কারণ, বাপুলীর মত লোক অযোগ্যকে কখনো প্রশ্রয় দেবেন না; তার পর, বৌ রাণীও শেষের দলে আছেন বলে একটা কথা রটেছিল বটে, কিন্তু তিনি নিজে নির্লিপ্ত থেকে কমিটীর উপরেই যখন সব ভার ছেড়ে দিয়েছেন, তখন তাঁকে আর এর মধ্যে আনা চলে না। কাজেই আমি বলি মা, এই নিয়ে মাথা ঘামাবার বা সুস্থ শরীরকে ব্যস্ত করবার কিছু নেই। ব্যাপারটা আমি যত দূর বুঝিছি, ডাক্তার বাগচিই

চাকরী পাবেন, কমিটীর সবাই তাঁকে নেবার অনুকূলেই মত দেবেন। নিবারণবাবুকেও আমি এ কথা জোর-গলাতেই বলছি।

উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে নিবারণ কহিল: আপনার কথা শুনে আমি নিশ্চিন্ত হলাম কবিরাজ মশাই, এ সম্বন্ধে আমার মনে আর কোন সংশয় রইল না।

পনেরো

বাগুলী দাতব্য চিকিৎসালয়ের জন্য চিকিৎসক-নির্ব্বাচনের বহু প্রত্যাশিত দিনটি অবশেষে রীতিমত একটা চাঞ্চল্যের সাড়া তুলিয়া দেখা দিল। কোনো বিখ্যাত মকদ্দমার নিষ্পত্তিগত রায়টি জানিবার জন্য সংশ্লিষ্ট ও অসংশ্লিষ্ট মহল যে-ভাবে কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া উঠেন, বাগুলী চিকিৎসালয়-সংক্রান্ত এই ব্যাপারটিও বাগুলীর অধিবাসীদের মধ্যে অনেকটা সেইরূপ আগ্রহজনক ও উত্তেজক হইয়া উঠিয়াছে। ইহা যে গাঙ্গুলী-বাড়ীর দুইটি প্রবল পরাক্রান্ত পক্ষের জিদ ও প্রতিযোগিতাকে কেন্দ্র করিয়া প্রকটিত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহের কোন অবকাশ ছিল না। সুতরাং এরূপ বিশিষ্ট দুইটি পক্ষের স্নায়ু-সংগ্রামের ফলাফল জানিবার জন্য আগ্রহ পোষণ করা খুবই স্বাভাবিক।

কিন্তু যে-প্রতিপক্ষটির প্রতি লোকের আস্থাপূর্ণ দৃষ্টি সাম্প্রতিক পরিস্থিতির ভিত্তিতে গভীর ভাবে নিবদ্ধ রহিয়াছে, এ দিন তাঁহাকে এ-ব্যাপারে একেবারে নির্লিপ্ত দেখিয়া সংশ্লিষ্ট মহল অবাক হইয়া গেল। প্রাত্যহিক ব্যবস্থা মত চণ্ডী শ্বশুরের চরণ-বন্দনা করিতে গিয়া দেখিল, অভ্যাস মত তিনি আরাম-কেদারায় বসিয়া মুক্ত গবাক্ষ-পথে দিক্-চক্রবালে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন—সুনীল মেঘপুঞ্জ ভেদ করিয়া অপূর্ব গোলকটি যেখানে উঠি-উঠি করিতেছে। গৌরবর্ণ নগ্ন দু'টি

পদতলে পরিচিত হাতের স্পর্শমাত্র তিনি পার্শ্বে দৃষ্টি ফিরাইয়া সহাস্যে কহিলেনঃ তোমার কথাই ভাবছিলাম মা, আজই তো তোমাদের একটা বৃহৎ পরীক্ষা—দেখা যাক্ কোন্ বিড়ালটির ভাগ্যে সিকেটা ছিঁড়ে পড়ে!

শ্বশুরের পদপ্রান্তে গলায় আঁচল দিয়া মাথাটি নত করিবার পর ধীরে ধীরে উঠিয়া হাতের তাম্রপাত্র হইতে পঞ্চমুখী জবা ফুলটি তাঁহার ললাটে ঠেকাইয়া চণ্ডী বলিলঃ এই সাধারণ ব্যাপারটি নিয়ে আপনিও ভাবতে বসেছেন, বাবা?

বধূর মুখের পানে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া হরিনারায়ণ সবিস্ময়ে কহিলেনঃ সাধারণ! এ কথা তুমি বলছ মা? জানো, বাশুলীর সবার মুখেই আজ এইটেই সব চেয়ে বড় কথা! খবর যদি নাও তো, জানতে পারবে—কৌতূহলের তাপে রাতে অনেকের হয়ত ঘুম পর্যন্ত হয়নি—এই ক'টা দিনের মধ্যে কত রকমের কত গল্পই রচে উঠেছে।

একটু হাসিয়া চণ্ডী বলিলঃ আপনি তো জানেন বাবা, পরের কথা নিয়ে গল্পের জাল বুন্‌তে লোকের অভাব হয় না—নিষ্কর্মাদের এর চেয়ে আনন্দ আর কিছুতেই নেই। কিন্তু সে গল্প আমি যেমন শুনতে চাইব না, কেউ শোনাতে এলে আপনিও তখন কানে আঙ্গুল দেবেন নিশ্চয়ই।

চণ্ডীর মুখে দৃষ্টি তেমনই নিবদ্ধ রাখিয়া হরিনারারণ কহিলেনঃ তুমি কি তাহ'লে আজকের ব্যাপারটাকে মোটেই গ্রাহ্য করতে চাইছ না? এটা কি সত্যিই উপেক্ষা করবার মত ব্যাপার?

চণ্ডী কহিলঃ আচ্ছা বাবা, আপনার সেরেস্তায় তো এ রকম ব্যাপার হামেশাই হয়ে থাকে—এক জন চলে গেলে তার জায়গায় আর এক জন লোককে নেওয়া হয়; প্রার্থীদের মধ্যে যাঁকে পছন্দ করা হয় যোগ্যতা বিচার ক'রে, তাঁকেই বাহাল করা হোয়ে থাকে। এই নিয়ে সেরেস্তায়

যাই হোক, বাইরের কেউ মাথা ঘামায় না—কোন গোলও ওঠে না। তবে এ ব্যাপারেই বা এ রকম উল্টো উৎপত্তি হয় কেন?

মৃদু হাসিয়া হরিনারায়ণ কহিলেনঃ এই তো মা, এত বুদ্ধিমতী হোয়েও কথাটা বলতে বাধল না! সেরেস্তায় কোন লোক রাখা, আর এই ডাক্তার ঠিক করা—এ কি এক ধরণের কাজ বলতে চাও? এটা যে এখন দলাদলি ব্যাপারে দাঁড়িয়ে গেছে, আর সেই জন্যেই বাইরের লোকের কৌতূহলও এত বেড়েছে। কাজেই, সেরেস্তার লোক বেছে নেওয়ার সঙ্গে আজকের এই ডাক্তার মনোনয়নের তুলনাই হোতে পারে না। আমরা মুখ বুজিয়ে থাকলেও লোকের মুখে তো চাপা দিতে পারব না—তারা জেনেছে যে, এই ডাক্তার রাখা নিয়ে তোমার শাশুড়ীর সঙ্গে তোমার জেদের লড়াই চলেছে। লোকের ধারণা কি তুমি পালটাতে পারবে মা?

মুখখানা গম্ভীর করিয়া চণ্ডী জিজ্ঞাসা করিলঃ কিন্তু বাইরের লোকের মনে এ ধারণা কেমন করে শিকড় গেড়ে বসল বাবা? আমাদের ভিতর থেকেই যদি মিথ্যে করে জোর করে দাঁড়িয়ে কথাটা বাইরে ছড়িয়ে দেওয়া হয়, আর তাই নিয়ে বাইরের লোক রূপকথা তৈরী করে আনন্দ পায়, সেখানে আমাদের উচিত হোচ্ছে—হয় যারা এ কথা বাইরে ছড়িয়েছে তাদের সন্ধান করে শাস্তি দেওয়া, নয় তো বাইরের কথা উঠলেই কানে আঙুল দিয়ে চুপ করে থাকা।

কথাটার প্রতিবাদে চণ্ডী যে এ-ভাবে গোড়া ধরিয়া টানিয়া রটনাকারীর সন্ধান করিবার কথা বলিবে, হরিনারায়ণ তাহা প্রত্যাশা করেন নাই। চণ্ডী তাহার ভাষণে রটনাকারীর নাম না বলিলেও সে যে এ-ব্যাপারে একেবারে অন্ধকারে পড়িয়া নাই, তাহার উক্তির দৃঢ়তায় হরিনারায়ণ তাহা যেমন উপলব্ধি করিলেন, পক্ষান্তরে কমিটীর উপর এ ব্যাপারটি ছাড়িয়া দিবার পর চণ্ডী যে সম্পূর্ণ ভাবে নির্লিপ্ত

রহিয়াছে এবং তাহার পক্ষ হইতে কোনরূপ তদ্বির হইতেছে না, ইহাতেও তিনি তেমনি নিঃসন্দেহ হইলেন। সুতরাং কোন্ পক্ষের প্রবল প্রচেষ্টায় বাহিরের বায়ুমণ্ডল উত্তপ্ত এবং জল ঘোলা হইয়াছে, তাহাও এত সুস্পষ্ট যে, বোধগম্য হইবার পক্ষে কঠিন নহে। মুখখানা নত করিয়া নীরবে হরিনারায়ণ কথাগুলি ভাবিতে লাগিলেন।

চিন্তামগ্ন শ্বশুরকে লক্ষ্য করিয়া চণ্ডী এই সময় গাঢ় স্বরে কহিল: তাই বলছিলাম বাবা, এই সাধারণ ব্যাপারটাকে এ ভাবে বাড়ানো ঠিক হয়নি। আমার মনে হয়, মাও এটা বুঝেছেন। এখন কমিটীর বিচার যদি আমরা মেনে নিই, এর পরও তাহলে আর কোন গোল উঠবে না। আমিও সেইটে চাই।

হরিনারায়ণ এবার সোজা হইয়া বসিয়া বলিলেন: কিন্তু তোমাকে বাদ দিয়ে তো কমিটী হোতে পারে না মা! আমি যখন ওর চেয়ারম্যান এবং ক্ষমতা তোমাকে দিয়েছি একটা বছরের জন্যে, তখন তোমাকেই আমার চেয়ারে বসে আজকের কাজ চালাতে হবে।

চণ্ডী দৃঢ় স্বরে জানাইল: না বাবা, আমাকে ও-অনুমতি করবেন না—অন্ততঃ এই মিটিংএ আমি আপনার দত্ত ক্ষমতা নিয়ে ও-চেয়ারে বসব না। এ ব্যাপারে আমি একেবারেই নির্লিপ্ত থাকতে চাই।

হরিনারায়ণ কহিলেন: তা কি হয়? কমিটীর ওপর ভার দেওয়া বলতে এই বোঝায় না যে, তুমি চেয়ারম্যানের আসনে বসবে না!

পূর্ববৎ দৃঢ় স্বরেই চণ্ডী কহিল: না বাবা, কমিটীর উপরেই সমস্ত ভার আমি ছেড়ে দিয়েছি অন্ততঃ আজকের এই ব্যাপারে। কমিটীর মেম্বাররাই তাঁদের ভিতর থেকে চেয়ারম্যান ঠিক করে নেবেন। আজ আমি ওর ত্রিসীমাতেও যাব না বাবা! আমার মিনতি, আপনি আমাকে এই নিয়ে আর আদেশ করবেন না।

ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে হরিনারায়ণ কহিলেন: তাহলে যে শিবহীন

বজ্জ হবে মা ! জানো, তুমি ওখানে না গেলে, অগত্যা আমাকেই গিয়ে চেয়ারম্যানের আসনে বসতে হবে।

মুখখানা কঠিন করিয়া চণ্ডী কহিল : সেও হয় না বাবা !

তীক্ষ্ণ স্বরে হরিনারায়ণ জিজ্ঞাসা করিলেন : হবে না কেন ?

চণ্ডী ধীরে ধীরে উত্তর করিল : ভুলে যাবেন না বাবা, সমস্তই ক্ষমতা নির্দিষ্ট কালের জন্য আপনি আমার হাতে ছেড়ে দিয়েছেন ; এখন নিজের হাতে সেই ক্ষমতা আপনি কি করে নেবেন ?

এ কথায় হরিনারায়ণের উদ্দীপ্ত মুখখানা পলকে ম্লান হইয়া গেল, তাঁহার মুখ দিয়া শুধু একটি কথা বাহির হইল : ওঃ !

কণ্ঠস্বর অত্যন্ত কোমল করিয়া চণ্ডী সবিনয়ে কহিল : ব্যাপারটি আজ যে ভাবে দাঁড়িয়েছে বাবা, তাতে কমিটীর উপরেই ভারটি ছেড়ে দিয়ে আমাদের পক্ষে তফাতে থাকাই উচিত হবে। ভালো করে ভাবলেই আপনি এ কথার সমর্থন করবেন।

হরিনারায়ণ নীরবে বধূর মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন মাত্র। চণ্ডী পুনরায় কহিল : অনেক আগে থেকেই বাগুলীর এই দিকটার উপর কারুরই ভালো করে নজর পড়েনি বাবা ! অমরনাথ বাবুর আমোলে লোকে যে সুবিধা পেয়েছে, এখন তা উপকথা হোয়ে দাঁড়িয়েছে। দশ-পনোরো ক্রোশের মধ্যে আর একটা ভালো ডাক্তারখানা নেই, ডাক্তার নেই, এ সব জেনেই তিনি আর এক জন ভালো ডাক্তারকে তাঁর সহকারী করে নিয়েছিলেন। কিন্তু সহকারীটি তাঁকে সরিয়ে দিয়ে নিজে যখন কর্তা হোয়ে বসলেন, আর এক জন ভালো ডাক্তার আনা যে তাঁর কর্তব্য, সেটা ভুলে গেলেন ; আর কমিটীও সে সম্বন্ধে চোখ বুজিয়ে রইলেন। তাই, বিশু ডাক্তার বিদায় হোতে এখন এমন এক জন লোকের উপর ওটার ভার পড়েছে, কম্পাউণ্ডারী ছাড়া যার

আর কোন যোগ্যতাই নেই—কাজেই যোগ্য ডাক্তারের অভাবে লোকের আজ অসুবিধারও শেষ নেই।

হরিনারায়ণ কহিলেন : ডাক্তারী তো বুঝি না মা, তাই এক জন পাশ-করা আর নাম-করা ডাক্তারের উপরেই সব ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকি। বিশু ডাক্তার বুঝিয়েছিল, আর এক জন ডাক্তার এনে খরচ বাড়িয়ে কাজ নেই। যে কম্পাউণ্ডারটিকে আনা হোয়েছে—অনেক ডাক্তারের চেয়েও তার নাকি দক্ষতা বেশী। আমরাও তাই বুঝেছিলাম! তারপর ইদানিং, তুমি যে ভাবে সন্ধান নিয়ে তলিয়ে সব জেনেছ, আমি, বা কমিটীর কেউই তার ধার দিয়েও যাইনি যে মা! আমাদের একটা দোষ কি জানো, যাকে বেশ মনে লাগে, যোগ্যতায় আস্থা থাকে, বিশ্বাস করে তার উপরেই সব ছেড়ে-ছুড়ে দিব্যি নিশ্চিন্ত থাকি; অবিশ্যি, যে ব্যাপারগুলো নিজে ভাল বুঝি নে। আর এমনি মজা—সেই লোক পূরো ভারটি পেয়েই একবার যাচ্ছেতাই সুরু করতে থাকে। এই যেমন বিশু ডাক্তার করে গেছে।

চণ্ডী কহিল : কিন্তু তার জন্যে বাবা, আপনার গরীব প্রজারাই দুঃখ পেয়েছে, বরাবর সহ্য করেছে, মুখ ফুটে বলতেও পারেনি। এই এখনকার কথাই বলছি—ক'দিন ধরে আপনারই এক জন প্রজা তার ছেলের চিকিৎসার জন্যে আকুলি-ব্যাকুলি হোয়ে বেড়াচ্ছে। কম্পাউণ্ডারের ওষুধে কোন ফল হয়নি, এ অঞ্চলে যে ক'জন চিকিৎসা-ব্যবসায়ী আছেন—কারুর কাছেই কাকুতি-মিনতি জানাতে বাকি রাখেনি। কিন্তু সে গরীব, ভিজিট দিতে অক্ষম জেনে, কেউই তার বাড়ী গিয়ে রোগীকে দেখতেও যাননি—ঐ কম্পাউণ্ডারের মতই আন্দাজে ওষুধ দিয়ে মহত্ত্ব দেখিয়েছেন। আমি মাত্র এক জনের কথা বললাম, এমনি কত লোকই ভুগছে, আর বিনা চিকিৎসায় প্রাণ হারাচ্ছে।

বিস্ময়ের সুরে হরিনারায়ণ কহিলেন : সে কি! কেন, শশীবাবু তো এখানে রয়েছেন, এ অবস্থায় তিনি তো—

চণ্ডী কহিল: তাঁকেও বলা হয়েছিল, কিন্তু তিনি রাজী হননি। বলেছেন—নির্বাচনের আগে এখানকার কোন রোগীকে তিনি দেখতে পারেন না। সেরেস্তা থেকেই ভিজিট দেবার কথাও উঠেছিল; কিন্তু রোগীর বাড়ী নাকি অনেক দূরে—অজ পাড়াগাঁয়ে; তাই সেখানে তিনি যাবেন না। তবে এই ভরসাটুকু দিয়েছেন—আজ যদি তিনি ডাক্তারখানার ভার পান, তখন রোগীকে এখানে নিয়ে এলে তিনি তার চিকিৎসা করবেন।

গম্ভীর মুখে হরিনারায়ণ কহিলেন: হুঁ! কিন্তু, নিবারণ যে ভাবে এই শশী ডাক্তারের পক্ষে তদ্বির সুরু করেছে, তাতে মনে হোচ্ছে মা, এঁরই বরাতে সিকে ছিঁড়বে।

চণ্ডী কহিল: কমিটীর সবাই কথাটা শুনেছেন। এর পরও যদি তাঁরা এঁকেই উপযুক্ত মনে করে বাগুলীর চিকিৎসালয়ের ভার দেন, তাই আমাদের মেনে নিতে হবে। কিন্তু তা বলে নিশ্চয়ই আমরা আগেকার মত চোখ বুজিয়ে থাকব না, লোকের প্রয়োজনের দিকে চেয়ে এমন আরো দু'-চার জন ডাক্তার আনাবো—গরীব রোগীদের প্রতি যাঁরা সত্যই দরদী; আত্মাভিমানের চেয়ে রোগীদের সারিয়ে তোলাই হবে যাঁদের কাছে বড় কথা।

দুর্ভেদ্য অন্ধকারের মধ্যে বধূর শেষের কয়টি কথা যেন হরিনারায়ণের চোখের উপর তীক্ষ্ণ আলোক-রশ্মির একটা সূক্ষ্ম রেখাপাত করিল। উৎসাহিত হইয়া তিনি সহর্ষে বলিয়া উঠিলেন: বা, বা! এর উপর আর কথা নেই মা! তুমি যে একবারে হাল ছেড়ে না দিয়ে মনে মনে একটা উপায় স্থির করে রেখেছ, তার আভাস পেয়ে আমি সত্যই আনন্দে অভিভূত হয়ে পড়েছি। সত্যি মা, চিকিৎসা-ব্যাপারে এ অঞ্চলটা অনেক পিছিয়ে আছে, এর উপায় আমাদের করতেই হবে! কোন এক জনের উপর ভার দিয়ে এখন থেকে আর নিশ্চিন্ত থাকলে হবে না। তুমি ঠিকই বলেছ মা, চার-পাঁচ জন

ভালো ভালো ডাক্তার এনে তালুকের প্রজাদের সুযোগ-সুবিধা করে দিতে হবে—তাহলে হাতুড়েগুলোর পাল্লায় পড়ে তারা মরতে থাকবে না, আর যাঁকেই চিকিৎসার ভার দেওয়া হোক, তিনিও যাতে এদিকে নজর রেখে চলেন, আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে।

চণ্ডীর বুঝিতে বিলম্ব হইল না, শ্বশুর সহসা এতটা উৎসাহী হইয়া উঠিলেন কেন? যদি শশী ডাক্তারকেই কমিটী মনোনীত করিয়া ফেলেন, তাহাতে চণ্ডী যে অভিমান করিয়া তাহার অধিকার ত্যাগ করিবে না, নূতন কোন অশান্তিও দেখা দিবে না—অন্য দিক দিয়া তাহার অভিপ্রায় সিদ্ধ করিয়া সে যে এই অপ্রীতিকর অবস্থাটা ভুলিতে চাহিবে, ইহাই হরিনারায়ণের এই আকস্মিক হর্ষের হেতু। মনে মনে হাসিয়া এবং পলকে আত্মসংবরণ করিয়া চণ্ডী কহিল: আমি এখন যাচ্ছি বাবা!

হরিনারায়ণ বাধা দিবার ভংগিতে তাড়াতাড়ি কহিলেন: আর একটা কথা মা, গোবিন্দও কি ওখানে যাবেনা? তারও অন্তত যাওয়া উচিত তো?

শান্ত সংযত কণ্ঠে চণ্ডী কহিল: না বাবা, কমিটী নিরঙ্কুশ হয়েই ব্যাপারটার নিষ্পত্তি করেন, ওঁরও এই ইচ্ছা।

এইখানেই প্রসংগটির উপসংহার করিয়া চণ্ডী শ্বশুরের কক্ষ হইতে তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল। হরিনারায়ণ স্তব্ধভাবে বসিয়া রহিলেন।

অন্য দিন এ সময় মাধুরী দেবী প্রায়ই নিদ্রামগ্ন থাকেন, কিন্তু আজ অতি প্রত্যূষেই তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হওয়ায় প্রাতঃকৃত্যাদির জন্য উঠি-উঠি করিতেছিলেন, এমন সময় স্বামীর সহিত বধূর সংলাপ তাঁহার শ্রুতিস্পর্শ করে। ফলে, তাঁহার আর শয্যাত্যাগ করা হয় নাই, সন্তর্পণে পার্শ্ববর্তী কক্ষের সংলাপের দিকে দুই কর্ণ নিবদ্ধ করিয়া একই ভাবে শয্যায় পড়িয়াছিলেন। চণ্ডীর প্রস্থানের পরেই তিনি ধীরে ধীরে স্বামীর বিশ্রাম কক্ষে প্রবেশ করিয়া যে দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে তাকাইলেন, তাহাতে প্রশ্ন সূচিত হইতেছিল। এমন অসময়ে পত্নীকে দেখিয়া হরিনারায়ণ

কিঞ্চিৎ বিস্মিত ভাবেই জিজ্ঞাসা করিলেন: এত সকলেই আজ ঘুম ভাঙলো যে?

সামনের কেদারাখানিতে বসিতে বসিতেই মাধুবী দেবী উত্তর করিলেন: এত হাঁকাহাঁকিতেও ঘুম যদি না ভাঙে, শেষে তুমিই কুম্ভকর্ণের মাসী বলে খোঁটা দিতে!

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া হরিনারায়ণ কহিলেন: বটে! কিন্তু যে সুরে এখন আমরা কথা বলছি, এর চেয়েও চড়া সুরে তো বৌমার সঙ্গে কথা হয়নি, তবু তোমার ঘুম ভেঙ্গে গেল? কিন্তু বৌমার কথায় তো হুল ছিল না যে কানে ফুটবে? বরং শুনে যদি থাক, খুসি হবারই কথা।

মুখখানি একটু মচকাইয়া মাধুরী দেবী উত্তর করিলেন: তোমার বৌমার কথায় কথা কইলেই তুমি তো ক্ষেপে ওঠ জানি। বৌমাই তোমাকে বিধান দিয়েছেন, বাইরের কথায় থাকবে না—বেশী কথা বলবে না, অথচ এ-ঘরে তিনি এলেই তো দেখি—কথার খই ফোটা সুরু হয়েছে, তার আর বিরাম নেই। এত বুঝদার হোয়েও তখন তাঁর হুঁস থাকে না, আর তোমার কথা কি বল্‌ব বলো—ভাবো যে বৌমা মধুবর্ষণ করছেন!

মৃদু হাসিয়া হরিনারায়ণ কহিলেন: কিন্তু আজ তিনি সত্যই মধুবর্ষণ করে গেছেন।

অপ্রসন্ন ভাবেই মাধুরী দেবী জিজ্ঞাসা করিলেন: কি ভেবে কথাটা বলা হোচ্ছে?

হরিনারায়ণ উত্তর করিলেন: তোমাদের অবস্থাটা ভেবেই বলা হয়েছে গো! বৌমা তো স্পষ্ট করেই বলে গেছেন, আজকের ব্যাপারে উনি একেবারেই নির্লিপ্তই থাকবেন, এমন কি—তোমার শশী ডাক্তারকে বাহাল করা হলেও ওঁর কোন আপত্তি নেই। বৌমার কথাটা শুনে সত্যিই আমার বুক থেকে যেন একটা বোঝা নেমে গেছে। আশ্চর্য, কথাটা শুনেও তুমি সুখী হোতে পারছ না!

ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া মাধুরী দেবী একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেনঃ না। তোমার বৌমাকে তোমার চেয়েও আমি ভালো চিনি। সব দিক দিয়ে বেয়ে-চেয়ে তিনি যখন দেখলেন, হালে পানি পাবার আর যো নেই—বাইরের এক অনামী ছোকরা ডাক্তারকে কেউ পছন্দ করবে না—তাঁর জেদ কিছুতেই রক্ষা হবে না, তখনই তিনি কমিটীর ওপরে ভার দিয়েছেন। কিন্তু তা বলে একেবারে হাল ছাড়েননি—আড়াল থেকে এমন করে সেটি চালাচ্ছেন কেউ যাতে না জানতে পারে।

স্তব্ধ ভাবেই হরিনারায়ণ পত্নীর মুখের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া এই অদ্ভুত কথা শুনিতেছিলেন। এই সময় আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিলেনঃ হাতের হালটি এখন বৌমা কি ভাবে চালাচ্ছেন, সে খবর তুমি যখন জেনেছ, বলেই ফেল—আমিও শুনি।

স্বামীর বিস্মিত মুখের উপর কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া মাধুরী দেবী কহিলেনঃ সে কথা বৌমা তো নিজের মুখেই বলে গেলেন, ভালো করে একটু ভেবে দেখলেই জানতে পারতে।

সহজ কণ্ঠেই হরিনারায়ণ কহিলেনঃ নিজের অক্ষমতা যখন স্বীকার করছি, তুমিই না হয় সেটি জানিয়ে দাও।

অসঙ্কোচে মাধুরী দেবী কথাটা বলিয়া ফেলিলেন। সহজভাবেই জানাই-লেন—চণ্ডীর কথাগুলি অনুশীলন করিয়া তিনি ইহাই বুঝিতে পারিয়াছেন যে, ডাক্তার বাগচিকে কমিটী বাহাল করিলেও তিনি তাঁহাকে না তাড়াইয়া ছাড়িবেন না। বাগচি মহাশয়ের সঙ্গে আরও কতিপয় ডাক্তার রাখা এবং ডাক্তারখানার ভার বাগচির উপর দিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া না থাকিবার যে প্রসংগ তিনি তুলিয়াছেন, তাহার নির্গলিতার্থই হইতেছে, ডাক্তার বাগচির মত সম্মানিত ব্যক্তিকে পদে পদে অপদস্থ করা এবং তাঁহার অধস্তন ডাক্তারদিগকে প্রশ্রয় দেওয়া। এমন কি, কলিকাতা হইতে যে ডাক্তারটিকে আহ্বান করা হইয়াছে, তাঁহাকেও এই অজুহাতে ডাক্তার-

খানার সংস্রবে নিযুক্ত করা হইবে এবং তিনি যাহাতে ডাক্তার বাগচির উপর কর্তৃত্ব করিতেও সঙ্কুচিত না হন, সেইরূপ প্রশ্রয়ও তাঁহাকে প্রদত্ত হইবে।

পত্নীর উপলব্ধিমূলক কথাগুলি শুনিয়া হরিনারায়ণ কৌতূহলহীন অলস দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিয়া কহিলেন : এই কথা ! আমি ভেবেছিলাম, না জানি বৌমার কি ভীষণ ষড়যন্ত্রের কথাই বা জেনে ফেলেছ তুমি ! দেখছি, তোমার সেই প্রখর বুদ্ধিও ক্রমশঃ ভোঁতা পড়ে গেছে। নৈলে, ডাক্তার বাগচিকে নিয়ে যে জেদের যুদ্ধ চালিয়েছ, তাতে জয়লাভ নিশ্চিত জেনেও তুমি খুসি নও—এর পর বৌমা কি করবেন না করবেন তাই নিয়ে মাথা ঘামাতে সুরু করে দিয়েছ ! এটা বুঝছ না যে, আজকের ব্যাপারে তুমি যদি জিতে যাও, অর্থাৎ তোমার ঐ বাগচিই যদি বাহাল হোয়ে যায়, তাহলে বৌমা সরে দাঁড়ালেও—লোকে তোমাকেই বাহোবা দেবে ! তার পর ভার একবার হাতে পেলে তাকে দাবানো কি সহজ কথা বলতে চাও ? ভারপ্রাপ্ত ডাক্তারের যে সব ক্ষমতা কমিটী থেকেই স্থির করে দেওয়া হয়েছে, কমিটী থেকে তার অদল-বদল করাও বড় সহজ কথা নয়, যাকে বলে—দশ হাত জলে।

কথাগুলি বলিতে বলিতেই হরিনারায়ণ কণ্ঠে জোর দিয়া হাসিয়া উঠিলেন, এবং সেই হাসির ফাঁকে আড় চোখে লক্ষ্য করিতে লাগিলেন যে, পত্নীর অন্তর্নিহিত সন্দিগ্ধ ও অস্বচ্ছন্দ ভাবটি কাটিয়া গেল কি না !

ষোলো

পূর্ব হইতে ব্যবস্থা হইয়াছে যে, বেলা ঠিক দশ ঘটিকায় বাশুলী দাতব্য চিকিৎসালয়ে কমিটীর সদস্যগণ সমবেত হইয়া পদপ্রার্থী চিকিৎসকদ্বয়ের এক জনকে মনোনীত করিবেন। প্রার্থীদ্বয়কেও নির্দিষ্ট সময় বাশুলী চিকিৎসালয়ে উপস্থিত হইবার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে। ডাক্তার

বাগচি বাগুলী-প্রাসাদেই অতিথিরূপে অবস্থিতি করিতেছেন। ডাক্তার প্রতাপ রায় কলিকাতায় থাকেন; আহ্বান-পত্রের উত্তরে জানাইয়াছেন যে, নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট সময়েই তিনি যথাস্থানে উপস্থিত হইবেন।

দাতব্য চিকিৎসালয়ের সুবৃহৎ ঘরে কমিটীর সদস্যগণ স্ব স্ব আসন গ্রহণ করিয়াছেন। প্রতিযোগিদ্বয়ের জন্য দুইখানি আসন পুরোভাগে দুই দিকে রাখা হইয়াছে। ডান দিকের চেয়ারখানি অধিকার করিয়া বসিয়াছেন ডাক্তার শশী বাগচি। বাম দিকের আসনখানি ডাঃ রায়ের জন্য খালি রহিয়াছে। সকলেই উদ্‌গ্রীব হইয়া তাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছেন।

চিকিৎসালয়ের বাহিরে কৌতূহলী তরুণ দলের অপ্রতিহত গতি ক্রমশঃই জনতার আয়তন প্রসারিত করিতেছিল। চিকিৎসালয়ের দ্বারবান ছাড়াও জমিদারী সেরেস্তার এক দল পাইক শান্তি রক্ষার জন্য আহুত হইয়াছে। নির্বাচন-পর্ব শেষ না হওয়া পর্যন্ত চিকিৎসালয়ে বাহিরের লোক-জনের প্রবেশ নিষিদ্ধ হওয়ায় তাহারা সন্তর্পণে ও সতর্ক ভাবে দ্বার রক্ষা করিতেছে। সকালের দিকে প্রত্যহই এই চিকিৎসালয়ে নানা স্থান হইতে বহু রোগীর সমাগম হইয়া থাকে। পূর্ব-বিজ্ঞপ্তি সত্ত্বেও নিষিদ্ধ সময়টি অনেকেই স্মরণ রাখিতে পারে নাই; ফলে সমাগত রোগী বা রোগীদের প্রতিনিধিস্থানীয় জনগণকেও বাহিরে আটকাইয়া রাখা হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে নামদার খাঁ নামে খর্বাকৃতি এক বৃদ্ধের আকুলি-ব্যাকুলি অত্যন্ত মর্ম্মন্তুদ পরিস্থিতির সৃষ্টি করিয়াছে অনেকক্ষণ হইতে। এই লোকটির একমাত্র উপায়ক্ষম পুত্র আরজান খাঁর কঠিন অসুখ। কয়দিন ধরিয়াই সে গাঙ্গুলী বাবুদের তালুকের অন্তর্গত মল্লিকপুর নামক মৌজা হইতে আসা-যাওয়া করিতেছে; এই চিকিৎসালয় হইতে ঔষধ-পত্রও লইয়া গিয়াছে—এ অঞ্চলের চিকিৎসকদের মধ্যে অনেকেই কৃপা-পরবশ হইয়া বিনামূল্যে ব্যবস্থা এবং ঔষধ-পত্রও দিয়াছেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হয়

নাই। রোগীর রোগযন্ত্রণা ক্রমশঃই বাড়িয়া চলিয়াছে। খাঁ বেচারী বৃদ্ধ, জমিদার সরকারে যৎসামান্য জমি-জমা রাখে, জমির আয়ে সংসার চলে না, উপযুক্ত পুত্র সূত্রধরের কাজ করিয়া যে অর্থ উপার্জ্জন করে তাহাতেই কোনরূপে তাহাদের জীবিকা নির্বাহ হয়। সে পুত্র কঠিন রোগে শয্যাশায়ী। জমিদার হুজুরের দাওয়াইখানায় নয়া ডাক্তার লওয়া হইবে এবং দুই জন ডাক্তারের মধ্যে একজন ভারী ডাক্তার আগেই আসিয়াছেন শুনিয়া সে সাহস করিয়া দেওয়ানবাবুর কাছে আগেই ধর্ণা দিয়া পড়িয়াছিল, তিনি যদি ঐ ডাক্তারবাবুকে দিয়া তাহার ছাবালটির জান বাঁচাইবার উপায় করিয়া দেন এই আশায়। সহৃদয় দেওয়ান রাধানাথ বাপুলী বেচারীর অবস্থা উপলব্ধি করিয়া প্রস্তাবটি ডাক্তার বাগচির গোচর করিয়াছিলেন। কিন্তু বৃদ্ধের দুর্ভাগ্যক্রমে ডাঃ বাগচি দেওয়ানজীর প্রতি প্রসন্ন ছিলেন না, তিনি অত্যন্ত রুক্ষ ভাবেই প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যান করেন। এমন কি, সেরেস্তা হইতে উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিবার প্রতিশ্রুতিও ডাক্তার বাগচির মনোবৃত্তিকে কোমল করিতে পারে নাই। তিনি শুধু ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া এই ভরসাই দিয়াছিলেন যে, বাগুলীর চিকিৎসালয়ের ভার যদি তিনি পান, তাহা হইলে সেই রোগীর চিকিৎসার ভার লইতে পারেন—কিন্তু রোগীকে এখানে আনিতে হইবে। ইতিমধ্যে রোগীর অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠায় নিরুপায় হইয়া বৃদ্ধ পুনরায় এই দিন আসিয়া হাজির হইয়াছে এবং তাহার মুখে সবিশেষ শুনিয়া কতিপয় তরুণ তাহাকে ঐ বৃদ্ধ ডাক্তারটির আশা ছাড়িয়া দিয়া অন্য উপায় দেখিতে পরামর্শ দিয়াছে। তাহারা যুক্তি দিয়াছে যে, কলিকাতা হইতে যে ডাক্তারটি এখনি এখানে আসিয়া উপস্থিত হইবেন, পথেই তাঁহাকে ধরিয়া তাহার অবস্থা জানাইলে হয়ত কোন কিনারা হইয়া যাইবে। এবং তাহারাও সকলে তাঁহাকে সুপারিশ করিবে।

চিকিৎসালয়ের ফটক হইতে কিঞ্চিৎ দূরে একটা প্রাচীন নিম্ব

বৃক্ষতলে আশ্রয় লইয়া নামদার খাঁ এই বহু-প্রত্যাশিত ডাক্তারটির প্রতীক্ষার সঙ্গে সকাতরে খোদার নিকট প্রার্থনা করিতেছিল, তাঁহার দোয়ায় ডাক্তারবাবুটি যেন তাহার প্রতি মেহেরবান হন।

দশটা বাজিতে মিনিট দশেক মাত্র বিলম্ব—এমন সময় রাজপথে প্রতীক্ষারত জনতা দেখিল, দুই ঘোড়ার একখানি তৃতীয় শ্রেণীর ছ্যাকরা গাড়ী দ্রুতবেগে তাহাদের অভিমুখেই আসিতেছে। জনতা অধিকতর কৌতূহলী হইয়া চিকিৎসালয়ের সম্মুখবর্তী পথের অনেকখানি স্থান এমন ভাবে আবৃত করিয়া ফেলিল যে, গাড়ীখানি আর অগ্রসর হইবার পথ না পাইয়া নিম্ব বৃক্ষমূলে—যেখানে বসিয়া বৃদ্ধ নামদার খাঁ কাতর কণ্ঠে খোদার দোওয়া কামনা করিতেছিল—ঠিক সেইখানেই সহসা থামিয়া গেল। গাড়ীর মধ্যে বসিয়াছিলেন একমাত্র আরোহী—দীর্ঘাকৃতি, বলিষ্ঠ গঠন এক সুশ্রী সুদর্শন যুবক। বাঙালী ভদ্রলোকের মত সাধারণ বেশভূষা তাঁর—কাপড়-জামা পরনে, গায়ে একখানা এণ্ডির চাদর, চোখে মোটা চশমা। বয়স ত্রিশ কিম্বা বত্রিশের বেশী নয়। গাড়ী থামিতেই জানালা দিয়া বাহিরে চাহিয়াই তিনি বুঝিলেন যে, গন্তব্য স্থানেই আসিয়া পড়িয়াছেন। তৎক্ষণাৎ ক্ষিপ্রহস্তে গাড়ীর দরজা খুলিয়া সম্মুখের আসন হইতে চামড়ার ব্যাগটি লইয়া নামিয়া পড়িলেন। তাঁহার আকৃতি এবং কোটের পকেটে পরিদৃশ্যমান বক্ষ-পরীক্ষা যন্ত্রটির অংশবিশেষ লক্ষ্য করিয়াই উৎসাহী তরুণ দলের বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে, এই ব্যক্তিই আজিকার বহু-প্রত্যাশিত ডাক্তার প্রতাপ রায়।

ইতিমধ্যে পূর্বোক্ত তরুণদের কেহ কেহ বৃদ্ধ নামদার খাঁর অন্তরে সাহস সঞ্চারিত করিয়া তাহাকে আগন্তুক সম্বন্ধে প্ররোচিত করিয়া তুলিয়াছিল। গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া ডাক্তার রায় কয়েক পদ অগ্রসর হইয়াছেন, এমন সময় বৃদ্ধ খাঁ ঝড়ের বেগে তাঁহার সম্মুখে আসিয়া পদদ্বয় দুই হাতে আঁকড়াইয়া ধরিল, সঙ্গে সঙ্গে আর্ত কণ্ঠে কহিল:

খোদার দোওয়ায় জনাবকে পেয়েছি—পায়ে ঠেলতি পারবা না—একটা যোয়ানের জান বাঁচান হুজুর !

ডাক্তার রায় স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন। না দাঁড়াইয়া পা বাড়াইবারও উপায় তাঁহার ছিল না—বৃদ্ধ দৃঢ় বাহুবন্ধনে তাঁহার বলিষ্ঠ পদদ্বয় এমন ভাবে আবদ্ধ করিয়াছে যে, পদচালনা ভিন্ন মুক্তির অন্য উপায় নাই। তিনি কিন্তু এই দৃশ্যে ক্ষুব্ধ, বিরক্ত, ক্রুদ্ধ বা বিস্মিত হইলেন না—জনসেবার যে ব্রত তিনি নিষ্ঠার সহিত গ্রহণ করিয়াছেন, বিপন্ন আর্তের অন্তর্বেদনা তাহার চক্ষু-প্রান্তে সুস্পষ্টভাবে পাঠ করিবার যে ভাষায় অভিজ্ঞ হইয়াছেন, তাহাতে এই বেদনাক্লিষ্ট আতুর মানুষটির মর্মন্তুদ প্রার্থনার পশ্চাতে কি কাহিনী প্রচ্ছন্ন আছে তাহার আভাসও বুঝিতে তিনি অভ্যস্ত থাকায়, সঙ্গে সঙ্গে নিজে নত হইয়া নিজের হাতে বৃদ্ধের হাতখানি ধরিয়া তুলিতে তুলিতে বলিলেন: ছি! ওঠ, ভয় কি! অসুখ-বিসুখে এত বিহ্বল হোতে নেই—শক্ত হওয়া চাই। কার অসুখ ?

কল্পনাও করে নাই বৃদ্ধ—শুধু বৃদ্ধই বা বলি কেন, সমবেত কৌতূহলী প্রাণচঞ্চল তরুণ দলও প্রত্যাশা করে নাই যে, কলিকাতার এক জন পাস-করা ডাক্তার এতটা সহানুভূতির সঙ্গে এ-ভাবে পল্লীগ্রামের একটা দরিদ্র চাষার সঙ্গে আলাপ করিবেন !

বৃদ্ধ বিহ্বল ভাবে ক্ষণকাল ডাক্তারের মুখের পানে চাহিয়াই পরক্ষণে হাউ-হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, সেই রোদন-রোলের ভিতর দিয়াই তাহার কণ্ঠস্বর নির্গত হইল: কি কইমু হুজুর—এক মাত্র ছাবাল—বত্রিশ বছর উমর, এক-ঘর কাচ্চা-বাচ্চা—ঐ থালি রোজগেরে—তারে যমে ধরেছে হুজুর! দশ দিন ধরে ভুগতে নেগেছে—এখন নিদেন কাল হুজুর! আর কি কইবা—

স্নিগ্ধস্বরে ডাক্তার জিজ্ঞাসা করিলেন: বাড়ী কোথায়—কাছে, না দূরে ?

নত হইয়া সেলাম করিয়া বৃদ্ধ জানাইল : দূরে হুজুর, তিনখানা গাঁয়ের পরে মল্লিকপুরে বাড়ী—এহান থেকে তিন কোশ হবেক হুজুর !

নিকটেই ভাড়াটে গাড়ীখানা দাঁড়াইয়াছিল। হাতের ঘড়িটি একবার দেখিয়া লইয়া ডাক্তার গাড়োয়ানকে জিজ্ঞাসা করিলেন : মল্লিকপুর যেতে পারবে ? যা ভাড়া চাও—পাবে।

গাড়োয়ানও ব্যাপারটি লক্ষ্য করিতেছিল এবং কলিকাতাবাসী এই ডাক্তারটির কাণ্ড দেখিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল। কথাটা শুনিয়া সসম্ভ্রমে উত্তর করিল : যাবো হুজুর ! ভাড়ার জন্যে আটকাবে না, যা খুসি হোয়ে দেবেন, তাই নেব।

বৃদ্ধ নামদার খাঁ বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু তাহার মনের মধ্যেও একটা আশঙ্কা জাগ্রত হইয়া তাহাকে বিচলিত করিতেছিল ; কোন ক্রমে সঙ্কোচ কাটাইয়া সে বলিয়া ফেলিল : কিন্তু হুজুর ! মুই যে বড্ডো গরীব, গাড়ীভাড়া, তার পর হুজুরের—

দৃঢ় স্বরে ডাক্তার কহিলেন : দেনেওয়ালা খোদা, তাঁরই দোহাই দিয়ে আমাকে যখন ডেকেছ, তাঁর কাছ থেকেই সব আদায় করে নেব—তোমার কোন ভাবনা নেই, কোন খরচ তোমার নেই—গাড়ীতে উঠে বসো। আমি একবার এখানে একটু খবর দেব।

কিন্তু খবর তাঁহাকে দিতে হইল না, বাহিরের ব্যাপারটির বিস্ময়কর কাহিনী ইতিমধ্যেই ভিতরে প্রচারিত হইয়াছিল।

সবিস্ময়ে কমিটির সদস্যগণ শুনিলেন যে, সাগ্রহে তাঁহারা যে ডাক্তারটির প্রতীক্ষা করিতেছেন, পথে এক রোগী তাঁহাকে পাকড়াও করিয়াছে।

কথাটা শুনিয়া ডাক্তার বাগচি বিদ্রূপ করিয়া কহিলেন : আলো-চাল দেখলে যেমন ভেড়ার মুখ চুলকোয়, কলকাতার নয়া ডাক্তারগুলো তেমনি পেসেণ্ট পেলে ডিউটি ভুলে যায়।

ডাক্তার বাগচির কথাটার প্রতিবাদ করিয়া এক ছোকরা বলিয়া

উঠিল : যা ভাবছেন, তা নয় স্যার! উনি ঘরের খেয়ে বনের মোষ চরাতে চলেছেন!

কমিটীর সদস্যগণ বুঝিলেন, বাহিরে একটা কিছু ঘটিয়াছে—যাহাতে ডাক্তার রায় ভিতরে প্রবেশ করিতে সমর্থ হন নাই। তাঁহারা অগত্যা কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া ভীড় ঠেলিয়া বাহিরে যাওয়াই সঙ্গত মনে করিলেন।

গাড়ীখানা যেখানে দাঁড়াইয়াছিল, সেই স্থানে ডাক্তার রায়ের সহিত কমিটীর সদস্যবৃন্দ এবং ডাক্তার বাগচির আলাপ-পরিচয় হইল। কমিটীর পক্ষ হইতে কবিরাজ বৈদ্যনাথ গুপ্ত মহাশয় তাঁহাকে ভিতরে যাইবার জন্য অনুরোধ করিলে ডাক্তার রায় সবিনয়ে কহিলেন : মাপ করবেন, গাড়ী থেকে নামতেই এই বৃদ্ধ আমাকে জানালেন, এঁর ছেলেটির অবস্থা খুব খারাপ। কাজেই এঁর সঙ্গে মল্লিকপুর যেতে হোচ্ছে।

কবিরাজ সবিস্ময়ে কহিলেন : সে কি! দশটা যে এদিকে বাজে—এখনি আপনাদের নিয়ে—

মৃদু হাসিয়া ডাক্তার রায় কহিলেন : তা জানি। কিন্তু ওর চেয়েও এই ব্যাপারটি জরুরী। মানুষ মরণাপন্ন—এ খবর পেলে, সব কাজ ফেলে সেখানেই ছোটা চাই—এই হোচ্ছে আমার গুরুর আদেশ। আপনারা হয় এটা কালকের জন্যে মুলতুবী রাখবেন, না হয় সেরেই ফেলবেন। আমাকে কিন্তু মল্লিকপুরে যেতেই হবে। আচ্ছা—নমস্কার।

আর কোন কথা শুনিবার প্রত্যাশা ত্যাগ করিয়াই ডাক্তার রায় গাড়ীতে উঠিয়া বসিলেন এবং গাড়ীখানার এক পার্শ্বে বিহ্বল ভাবে দণ্ডায়মান খর্বাকৃতি বৃদ্ধ নামদার খাঁর হাতখানা গাড়ী হইতে ঝুঁকিয়া ধরিয়া সবলে তাহাকেও গাড়ীর মধ্যে আনিয়া দৃঢ়স্বরে গাড়োয়ানকে কহিলেন : হাঁকাও।

পূর্বোক্ত ঘটনার পর কমিটীর সদস্যগণ ভিতরে প্রত্যাবর্তন করিলেও

পুনরায় বৈঠকের শোভাবর্ধনে যেন কুণ্ঠিত হইতেছিলেন। অগত্যা, চত্বরের এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তাঁহারা কর্তব্য নির্ধারণে প্রবৃত্ত হইলেন।

ডাঃ বাগচিই প্রথমে সঙ্কোচটুকু কাটাইবার উদ্দেশ্যে কহিলেন: উনি তো কমিটীকে অগ্রাহ্য করেই চলে গেলেন!

কথাটা কাহারও কাহারও অন্তরে কাঁটার মত বিঁধিয়া বুঝি খচ্ খচ্ করিয়া উঠিল। কিন্তু পরক্ষণে রাধানাথ বাপুলীর তীক্ষ্ণ কণ্ঠের কথাগুলিও সেখানে যেন প্রলেপের কাজ করিল। তিনি কহিলেন: কিন্তু ওঁর কথাগুলিও গ্রাহ্য করবার মত। উনি আমাদের চোখে আঙ্গুল দিয়েই যেন ত্রুটিটা দেখিয়ে দিয়ে গেলেন।

অন্যতম সদস্য ভুবন দত্ত জিজ্ঞাসা করিলেন: তাহ'লে আমরা এখন কি করব বলুন?

বাপুলী কহিলেন: সে আপনারা স্থির করুন।

আর এক সদস্য কৈলাস চক্রবর্তী কহিলেন: তা'হলে এখানে দাঁড়িয়ে কেন, চলুন বসা যাক; তার পর—

বাপুলী কহিলেন: কিন্তু আমাকে ছেড়ে দিতে হবে।

সবিস্ময়ে সদস্যগণ বাপুলীর দিকে চাহিলেন; সদস্য যদু ঘোষাল বিস্ময়ের স্বরে বলিয়া ফেলিলেন: সে কি! আপনি—

বাপুলী কহিলেন: ঐ ডাক্তারটি যেমন বলে গেলেন, এখানে ঢোকার চেয়ে মরণোন্মুখ রোগীটিকে দেখা তাঁর আগের কাজ, আমাকেও তেমনি বলতে হোচ্ছে—ঐ ডাক্তারটি অপরিচিত স্থানে রোগী দেখতে গিয়ে যাতে অসুবিধায় না পড়েন, সে ব্যবস্থা আমাকেই করতে হবে, আর সেইটিই আমার মস্ত কাজ।

কথাগুলি দৃঢ়স্বরে বলিয়া এবং কোন উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়াই বাপুলী চলিয়া গেলেন। সকলেই স্তব্ধ ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন, কাহারও মুখ দিয়া একটি কথাও বাহির হইল না। কিন্তু এই স্তব্ধতা বেশীক্ষণ

স্থায়ী হইল না—ভাঙ্গিয়া গেল নিবারণের আকস্মিক আগমনে। দ্বারদেশ হইতেই সে কহিল: পাগলের পিছনে পাগলকে ছুটতে দিন, কিন্তু আপনারা তো পাগল হন নি—কি ভাবছেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ? আপনাদের কাজ আপনারা—

কমিটীর সদস্য না হইলেও এই মনোনয়ন ব্যাপারটির সহিত নিবারণ ঘনিষ্ঠ ভাবে সংশ্লিষ্ট, ইহা কমিটীর সভ্যগণ গূঢ়ভাবে জ্ঞাত থাকিলেও তাহার এই উদ্ধত আচরণ ও অনধিকার নির্দেশ এখানে প্রত্যেকের চিত্ত বুঝি বিকৃত করিয়া দিল। এমন কি, যে বৈদ্যনাথ কবিরাজ তাহার প্রতি বিশেষ প্রীতিমান ছিলেন, তিনিই সর্বাগ্রে কথাটা তাহাকে শেষ করিবার অবসর না দিয়াই প্রতিবাদের ভংগিতে বলিয়া উঠিলেন: আমাদের কাজ আমরাই ভালো বুঝেছি, তোমার উপদেশের অপেক্ষা না করেই। ডাক্তার রায় ফিরে না আসা পর্যন্ত এ ব্যাপারটা মুলতুবীই থাকবে—আজকের য়্যাজেণ্ডায় এই কথাই আমরা লিখব।

নিবারণ তথাপি যুক্তি দেখাইয়া কবিরাজ মহাশয়কে বুঝাইবার চেষ্টা করিল। কিন্তু তিনি পূর্ব উক্তিতেই দৃঢ় থাকিয়া কহিলেন: এ হবার নয়। তোমাদের এত দিনের চাল এই ডাক্তার এক তুড়িতে বেচাল করে দিয়েছেন। হাওয়া এখন তাঁর দিকে।

অল্পক্ষণের মধ্যে কথাটা বাগুলীর সর্বত্র লোকমুখে প্রচারিত হইয়া এই অজ্ঞাত অপরিচিত ডাক্তারটিকে বিখ্যাত করিয়া তুলিল।

সতেরো

হরিনারায়ণের সহিত চণ্ডীর কথোপকথনের মধ্যে মাধুরী দেবী যদিও রোগীর প্রসংগটি শুনিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা যে এ ভাবে গুরুত্বপূর্ণ হইয়া উঠিবে, তখন ধারণাও করেন নাই। এখন উপলব্ধি করিলেন যে, ডাক্তার বাগচি ইচ্ছাপূর্বক কি ভাবে নিজেই নিজের শুভাদৃষ্টের দ্বারটি তাঁহার

প্রতিযোগীর জন্য খুলিয়া রাখিয়াছিলেন! নিবারণ যখন শশী ডাক্তারকে লইয়া ম্লান মুখে কমিটীর পক্ষপাতিতার বিরুদ্ধে নালিশ করিতে আসিল, মাধুরী দেবী তখন জ্বালাময়ী দৃষ্টিতে ভাগ্যান্বেষী এই কৃপাভাজনটির দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ- নিজের দোষত্রুটি সব চাপা দিয়ে কমিটীর উপরে মিছিমিছি দোষ দিতে এসেছেন আপনি! যেখানে আপনাকে বসাবার জন্যে আমি এত চেষ্টা করছি, সেখানে যে এমন একটা ব্যাপার ঘটে ছিল—বাপুলী মশাই আপনাকে ভিজিট দিয়ে রোগী দেখতে পাঠাবার কথা যখন বলেছিলেন—আমাকে সে কথা জানানোও দরকার মনে করেননি। এই সহজ বুদ্ধিটুকুও আপনার নেই—কাজ আদায় করবার সময় কাউকে চটাতে নেই, সকলের সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নিতে হয়! ভোট নেবার সময় বড় বড় মানী লোকেরা কি ভাবে মনের আসল ভাব চেপে রেখে অন্ত্যজ অস্পৃশ্য ভোটারদেরও বাহ্যিক ভাবে তোয়াজ করে থাকে, সে কি আপনি জানেন না?

শশী ডাক্তার বলিলেন ঃ বাপুলীর সঙ্গে গোড়া থেকেই আমার বনি-বনাও হয়নি, বিরোধী দলের লোক জেনেই ওঁর সে প্রস্তাবটা আমি অগ্রাহ্য করেছিলাম।

মাধুরী দেবী কহিলেন ঃ আপনি বুদ্ধিমান হোলে ওঁর প্রস্তাব কিছুতেই অগ্রাহ্য করতেন না; অন্তত, আমাকেও জানাতেন।

মৃণালিনী এই সময় কহিল ঃ দাদা বলছিল, ব্যাপারটা নাকি সাজানো। ডাক্তার দাদুকে জব্দ করবার জন্যেই ভূয়ো রোগী খাড়া করে ওরা—

মাধুরী দেবী তর্জনের ভঙ্গিতে বলিয়া উঠিলেন ঃ থামো, তোমার দাদা এমন অনেক কথা শোনে যা ঠিক নয়, আর নিজে যা বলে, তা নিছক মিথ্যে। এ সব কথা তুলে নিজেদের আর খাটো কোরো না। যদি কথাটা সত্যিই হয়, তা'হলেও বলবো যে, কোন কিছু নিয়ে নতুন বৌ-এর

সঙ্গে বোঝা-পড়া করতে যাওয়াই ঝকমারি—সব দিক দিয়েই তোমাদের থোঁতা মুখ ভোঁতা করবার অস্ত্র সে চালাতে জানে।

সেই দিনই মাধুরী দেবী নিবারণকে একান্তে ডাকিয়া কহিলেন: আমি নিষেধ করছি নিবারণ, যদি এখনো নিজের মান-ইজ্জত রাখতে চাও, প্রতিজ্ঞা কর যে, আর কোনদিন বৌদির সঙ্গে ঝগড়া করতে যাবে না।

মুখখানা রক্তবর্ণ করিয়া নিবারণ উত্তর করিল: কিন্তু তুমি ভুলে যাচ্ছ মা—আমিও নিবারণ, কারুর বারণ মেনে চলবার শিক্ষা কখনো পাইনি। ছোট-ঘরের ঐ মেয়েটাকে লোকে যত বড়ই ভাবুক না কেন, আমার ধারণা তাতে টলবে না মা, আমার চোখে বরাবরই ও ছোটই থাকবে।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পুত্রের মুখের পানে চাহিয়া মাধুরী দেবী কহিলেন: তোমার বুদ্ধি আর চোখের দৃষ্টি থাকলে এ নিয়ে আর বড়াই করতে না নিবারণ। মুখের কথায় কাউকে ছোট করা যায় না, নিজেকে তুমি নিজেই কত ছোট করেছ, সেটা দেখতে পাচ্ছ না বলেই এখনো মিছে আস্ফালন করছ।

নিবারণের ঔদ্ধত্য তথাপি প্রশমিত হইল না; মায়ের কথায় ক্ষণিকের জন্য তাহার মুখখানা কালো হইয়া গেল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আপনাকে সামলাইয়া লইয়া রুক্ষ ম্লান মুখখানাকে আরক্ত করিয়া সে উত্তর দিল: দুনিয়া-শুদ্ধ লোক আমাকে ছোট ভাবলেও আমি কিন্তু নিজেকে ছোট ভাবি নে। গরীবের মেয়ে এ-বাড়ীতে এসে অবধি আমাকে সব দিক দিয়েই ছোট করবার চেষ্টা করেছে, তার কাছে আমি গাধা, আমাদের আভিজাত্য অসার, তার পর আমার মাতামহকে উদ্দেশ করে যে-সব কথা বলেছে—সে অপমান তোমরা ভুললেও, আমি সহ্য করব না। আর তুমি কি চাও মা, আমি ছোট হোয়ে বেঁচে থাকি? তা'হলে কেন আমাকে সব রকমে বড়ো হবার আবেষ্টন দিয়ে গড়ে তুলেছিলে? এখন তার প্রত্যেকটি

জোর করে গা থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে আমাকে শিষ্ট শান্ত সহজ হোতে বলছ কোন মুখে? বাগুলীর গদীর ছবি আমার চোখের উপর তুলে ধরেছিল কে? কার কাছে ভরসা পেয়ে, আশ্বাস পেয়ে, সাহস পেয়ে আমি নিজেকে বড় ভেবেছিলুম? সেই ভাবেই আমি তৈরী হয়েছি; সেই ভাবধারা ফল্গুর মত আমার বুকের মধ্যে চাপা রয়েছে—যে দিন বন্যার মত ফুটে বেরুবে, তুমি কি মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে?

মাধুরী দেবী অপলক দৃষ্টিতে উত্তেজিত পুত্রের মুখপানে তাকাইয়া রুদ্ধনিশ্বাসে এই মর্মন্তুদ কথাগুলি শুনিতেছিলেন। শুনিতে শুনিতে তাঁহার মনে হইতেছিল, মাতৃত্বের কঠিন আবরণ মধ্যে দীর্ঘকাল ধরিয়া অতি সতর্ক ভাবে একমুখী স্বার্থের আবরণ মধ্যে যে পুত্রপ্রীতি তিনি লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন, কিছু দিন পূর্বে স্বামীর দৃষ্টিতে তাহা উদ্ঘাটিত হইলেও মাতৃত্বের অকাট্য যুক্তির মায়াজালে সে দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করা যত সহজ হইয়াছিল, আজ মর্ম্মাহত পুত্রের উত্তেজিত কণ্ঠের জিজ্ঞাসার আঘাতে সে যুক্তিজাল বুঝি ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া গেল, তাহাকে ঠেকাইবার মত ভাষাও তাঁহার কণ্ঠে আজ নাই! ক্ষণকাল স্তব্ধ ভাবে নীরব থাকিবার পর জোরে একটা নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া তিনি ক্ষুব্ধ স্বরে কহিলেন: তোমার কাছ থেকে এ প্রশ্ন যে কোন দিন আসবে, আমি তা ভাবতেও পারিনি; তাই এর জবাব আমি এখনি দিতে পারব না; তা ছাড়া বুঝছি—এর জবাবও বুঝি নেই। সংসারে চিরদিনই মায়েরা এমনি অসহায় বাবা! সন্তানের স্বার্থের দিকেই শুধু মায়ের দৃষ্টি একমুখী হোয়ে একই ভাবে পড়লে, বুঝি এক দিন এমনি করেই তাকে অনুতাপ করতে হয়! আজ আমি এ বাড়ীর সবার কাছেই অপরাধী। যুক্তি দিয়ে আর সকলের মুখ বন্ধ করলেও, তোমার মুখ আমি বন্ধ করতে পারব না বাবা! তোমার মনের জ্বালা আমি বুঝতে পারছি, আর এর জন্যে আমিই যে সব চেয়ে বেশী দায়ী, সেটি বুঝে তোমাকে বলছি—যে অন্যায় করেছি, তার জন্যে যদি কোন খেসারত দিতে হয়

আমাকে, আর তুমি তাই নিয়ে অভাগিনী মাকে ক্ষমা করতে পারো—আমাকে জানিও। সেইটিই হবে আমার প্রায়শ্চিত্ত।

কথাগুলি শেষ হইতেই অঞ্চলে মুখ চাপিয়া মাধুরী দেবী তাড়াতাড়ি কক্ষ হইতে একরূপ ছুটিয়া বাহির হইয়া গেলেন—তাঁহার অন্তরে তখন যে ঝড় বহিতেছিল, নিজেকে সামলাইয়া পুত্রের সম্মুখে উপস্থিত থাকিবার মত অবস্থা তাঁহার মত দৃঢ়চিত্ত নারীর পক্ষেও তখন সম্ভব ছিল না।

আর নিবারণ—নিচের ঠোঁটটি উপরের বলিষ্ঠ দন্তপাটি দ্বারা চাপিয়া ধরিয়া উত্তেজনার এক বিশেষ মুহূর্তে মায়ের কণ্ঠোচ্চারিত কথাগুলির আসল অর্থ বাহির করিতে নিজের বিদ্যা ও বুদ্ধিকে প্রবুদ্ধ করিতে লাগিল।

আটারো

পূর্ণ একটি সপ্তাহ পরে—অষ্টম দিনে ডাক্তার রায় বাগুলীতে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

কিন্তু যে পরিস্থিতির মধ্যে এই নবাগত ডাক্তারটি মল্লিকপুর নামক দূরবর্তী দরিদ্র পল্লীতে যাত্রা করিয়াছিলেন, বাগুলীর সর্বশ্রেণীর অধিবাসিবর্গ তাহার পরিণতি জানিবার জন্য একান্ত কৌতূহলী না হইয়া পারেন নাই। অথচ, অন্য সময় তিন ক্রোশ দূরবর্তী উক্ত পল্লীর কোন অখ্যাত ও দরিদ্র অধিবাসীর গৃহাগত কোন ব্যাধি ইহাদিগকে কোন দিন আকৃষ্ট করিয়াছে, এমন কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। ঘটনাচক্রে এইরূপ সামান্য ঘটনাও ব্যাপক ভাবে অসামান্য হইয়া উঠে।

সেদিন ছ্যাকড়া গাড়ীতে ডাক্তার রায়ের মল্লিকপুর যাত্রার খানিক পরেই রাধানাথ বাপুলীও প্রাসঙ্গিক প্রয়োজনীয় দ্রব্যজাত ও খাদ্যাদি লইয়া মল্লিকপুরে রওয়ানা হন। কতিপয় উৎসাহী স্বেচ্ছাসেবক সহ রাজীবও তাঁহার সহযাত্রী হয়। এই যাত্রার পশ্চাতে বধূরাণী চণ্ডীর

সুচিন্তিত নির্দেশ সাধারণের অজ্ঞাত থাকিলেও অভিযাত্রীদিগকে রীতিমত প্রেরণা দেয়। মল্লিকপুর গ্রামখানির অধিকাংশ অধিবাসী নিম্ন শ্রেণীর মুসলমান, ইহাদের অর্ধাংশের উপজীবিকা কৃষিকার্য, কিয়দংশ রাজমিস্ত্রী, সূত্রধর ও দর্জির কাজে অভ্যস্ত। তরুণ ও প্রবীণ দল সাধারণতঃ এই জাতীয় শ্রমিকরূপেই পরিচিত। কতক হাঁস, মুরগী, ছাগল, গাভী, মহিষাদি পালন করে এবং ডিম্ব-দুগ্ধাদি বাগুলীর ন্যায় সমৃদ্ধ অঞ্চলে যোগান দিয়া বিক্রয়লব্ধ উপস্বত্ব ভোগ করে। কয়েক ঘর সম্পন্ন গৃহস্থের নিদর্শনও পাওয়া যায়—ব্যবসায় সম্পর্কে তাহারা যে বিত্তবান হইয়াছে, সুবিস্তীর্ণ অঞ্চলে ঘন সন্নিবদ্ধ মৃন্ময় কুটীরশ্রেণীর মাঝে মাঝে বিনির্মিত কোন কোন ইষ্টকালয় তাহার সাক্ষ্য দিয়া থাকে। কিন্তু অর্থভাগ্য লাভ করিয়া দালান-কোঠা তুলিলেও, শিক্ষা ও সংস্কৃতির দিক দিয়া তাহারা যে অতিশয় দীন—যে তিমিরে সেই তিমিরেই রহিয়াছে, বাসভূমির পারিপার্শ্বিক আবেষ্টন ও নিরক্ষর প্রতিবাসীদের দুরবস্থা যেন চোখে অঙ্গুলি দিয়াই প্রদর্শন করিতেছে। এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলটির এক পার্শ্বে একটি দীর্ঘ ঝিলকে পরি-বেষ্টন করিয়া নমঃশূদ্র, বাগ্‌দী ও ধীবরদের পল্লীগুলি তাহাদের ব্যবসায়গত বৈশিষ্ট্যের নানা নিদর্শন দ্বারা প্রকাশ করিয়া থাকে; এ ক্ষেত্রে ইহারা সাধারণতঃ টোটকা, হাতুড়ে ডাক্তার এবং রোজার দ্বারস্থ হইয়া মুস্কিল আসান করিতে চাহে। রোগ যেখানে দুর্বোধ্য ও দুর্নিবার হইয়া উঠে, তখনই ডাক্তারী দাওয়াইখানায় ধর্ণা দিয়া থাকে। সদর মহকুমার পরেই বাগুলী সর্বাধিক সমৃদ্ধ অঞ্চল এবং এখানকার রাজাবাবুদের দাতব্য দাওয়াইখানার খ্যাতি আট-দশ ক্রোশব্যাপী বিভিন্ন অঞ্চলে পরিব্যাপ্ত। বাগুলী ব্যতীত আর কোথাও কোন দাতব্য চিকিৎসালয়ের ব্যবস্থা না থাকায় এই সুবিস্তীর্ণ অঞ্চলের বাসিন্দাদের পক্ষে উক্ত চিকিৎসালয়টির উপযোগিতা কতখানি—দীর্ঘপথযাত্রায় গাড়ীতে বসিয়া ডাক্তার রায় সহযাত্রীর নিকট হইতেই সে সকল তথ্য সংগ্রহ করিতে সমর্থ হন এবং

তাহার রোগীকে দেখিবার পূর্বেই অঞ্চলবাসীদের অসহায় অবস্থা ও সহনশীল প্রকৃতির সুস্পষ্ট আভাসও পান।

এ পর্যন্ত ডাক্তার তাঁহার সহযাত্রী নামদার খাঁকে জিজ্ঞাসাও করেন নাই যে, পুত্রটি কি রোগে আক্রান্ত হইয়াছে। যে অপরিচিত গ্রামাঞ্চলের মধ্যবর্তী রাস্তা দিয়া তিনি চলিয়াছেন, রাস্তার দুই পার্শ্বে যে সকল স্থান ও অধিবাসী তাঁহার নেত্রপথবর্তী হইতেছে, তাহাদের সম্পর্কে তাঁহার সাগ্রহ প্রশ্ন বৃদ্ধ খাঁকে পর্যন্ত অবাক করিয়া দিয়াছে। সে ভাবিয়া পায় না, কলকাতার এ হেন পাসকরা ডাক্তারবাবু এমন করিয়া গাঁয়ের কথা, গাঁয়ের মানুষের কথা, তাদের সুখ-দুঃখ ভাল-মন্দের কথা খুঁটাইয়া খুঁটাইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন কেন?

তাহার পর এই দরিদ্র গৃহস্বামীটি মানী ডাক্তারবাবুকে বাড়ীতে আনিয়া কোথায় বসাইবে, কি করিয়া খাতির করিবে, এই সব তদ্বির করিতে যখন পাগলের মত হইয়াছে—পাড়ার লায়েক বাসিন্দা বসির মিঞার বাড়ী হইতে একখানা খুরসী চাহিয়া আনিবার জন্য হাঁক-ডাক সুরু করিয়া দিয়াছে, সেই অবস্থায় ডাক্তারবাবুই তাহাকে থামাইয়া সর্বাগ্রে বাড়ীর উঠান ও তাহার সামনের মাটির দাওয়াটি পরিষ্কার করিবার কাজে যেই লাগাইয়া দিলেন, তখন সে নিজেই বুঝি লজ্জায় এতটুকু হইয়া গিয়াছে। সত্যই, কি হাল করিয়া রাখিয়াছে ইহারা উঠান ও দাওয়াটির! শিশুদের সদ্য-ত্যক্ত মল, মুরগীর ছাল, ডিমের খোলা, ছাগলের নাদি, ছিন্ন মলিন কাপড়-চোপড়—এমনই কত কদর্য দুর্গন্ধময় বিশ্রী বস্তু চারি দিকে ছড়াইয়া রহিয়াছে। দুই নাতীকে লইয়া বৃদ্ধ খাঁ আবর্জনাগুলি সরাইবার সময় বক্রদৃষ্টিতে দেখিতে লাগিল—উঠানের এক পার্শ্বে যে সুপুষ্ট লাউ গাছটির পল্লবিত শাখা গৃহের চালাগুলি ছাইয়া ফেলিয়াছে এবং চালার নীচে বাঁশের মাচাটিও আবৃত করিয়া বহু ফল প্রসব করিয়াছে, সেগুলি দেখিয়া ডাক্তারবাবুর কি আনন্দ! মাচার

নিম্নে দোদুল্যমান লাউগুলি লইয়া বালকের মত তাঁহার কি খেলিবার ধুম !

অল্পক্ষণ পরেই পরিচ্ছন্ন দাওয়ার উপর বাড়ীতে বয়ন করা একখণ্ড নূতন মাদুর বিছাইয়া দিল নামদার খাঁ ডাক্তারকে বসাইবার উদ্দেশ্যে। কিন্তু ডাক্তার তাঁহার ব্যাগটি গাড়ী হইতে আনাইয়া সেই মাদুরের উপর রাখিয়া বলিলেন: আগে রোগী দেখবো, সেইখানেই বসা যাবে।

দাওয়ার সামনের গৃহে রোগী থাকে। ছোট একটি দরজা, মাটির ঘর। এক পার্শ্বে একখানি তক্তাপোষের উপর মলিন শয্যা, শয্যার আস্তরণও বালিসের ওয়াড় এমন ময়লা যে, বিশ্রী রঙ ধরিয়া দুর্গন্ধ বাহির হইতেছে। গৃহখানির ভিতর বায়ু চলাচলের কোন পথ নাই—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গবাক্ষগুলি অতি সন্তর্পণে রুদ্ধ। মলিন শয্যায় পূর্ণবয়স্ক এক যুবা অতি কষ্টে অস্পষ্ট আর্ত স্বরে বক্ষ-যন্ত্রণা ব্যক্ত করিতেছে।

ডাক্তার প্রথমেই ঘরের জানালাগুলি মুক্ত করিয়া দিলেন। গৃহটিও পরিচ্ছন্ন ছিল না—এলোমেলো ভাবে ব্যবহার্য বস্তুগুলি মেঝের উপর ছড়াইয়াছিল। সেগুলি সরাইবার ব্যবস্থা করিয়া ঘরখানির কিছুটা পরিচ্ছন্নতা আনিয়া ডাক্তার রোগীকে লইয়া পড়িলেন।

ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই বাপুলী আসিয়া পড়িলেন তাঁহার সহায়ক দল ও প্রয়োজনীয় সামগ্রীসমূহ লইয়া। তৎপূর্বেই ডাক্তার সর্ববিধ পরীক্ষার পর রোগীর চিকিৎসা আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার ব্যাগটি প্রয়োজনীয় দুর্লভ ঔষধপত্র ও আধুনিক ইনজেক্সনের দ্রব্যজাতে পূর্ণ ক্ষুদ্র একটি ডিস্পেন্সারী-স্বরূপ। প্রতিষেধক লোসনের গন্ধে গৃহ ভরিয়া গিয়াছে—রোগীর বুকে-পিঠে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হইয়াছে; একটি ইনজেক্সনও দিয়াছেন। ডাক্তারের ব্যবস্থায় ঘরের শ্রীও পাল্টাইয়া গিয়াছে।

ছ্যাকরা গাড়ীর গাড়োয়ান গাড়ী হইতে ঘোড়া দুইটি খুলিয়া দিয়া

বিশ্রাম করিতেছিল। বাপুলী আসিয়াই তাহাকে ভাড়া ও পুরস্কার দিয়া বিদায় করিয়া দিলেন। জমিদার-বাড়ীর বৃহৎ ল্যাণ্ডো গাড়ীতে ডাক্তার ও শুশ্রূষাকারীদের খাদ্যাদি আসিয়াছিল। ইতিমধ্যেই পল্লীর সম্পন্ন গৃহস্থ বসির মিঞা আসিয়া জানাইয়া গিয়াছে যে, তাহার বাড়ীর বৈঠকখানায় ডাক্তারবাবুর বিশ্রামের ব্যবস্থা করিয়া রাখা হইয়াছে। ডাক্তারের মুখে বাপুলী শুনিলেন, রোগী নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হইয়াছে। অবস্থা খুবই খারাপ, তবে উপযুক্ত চিকিৎসা ও শুশ্রূষার ব্যবস্থা হইলে হয়তো রক্ষা পাইতে পারে। শুশ্রূষাকারীদিগকে পাইয়া—বিশেষত, সেবাকার্যে হাতে-কলমে রাজীবের শিক্ষাপটুতা দেখিয়া ডাক্তার অনেকটা নিশ্চিন্ত হইলেন।

বাপুলী কহিলেন: বধূরাণী বলেছেন, রোগীকে বাঁচাবার জন্যে চেষ্টার যেন কোন ত্রুটি না হয়। আপনার যা যা প্রয়োজন, জানাবা মাত্রই সে-সমস্তই উপস্থিত করা হবে। যদি বাগুলীতে কোন জিনিস না পাওয়া যায়, সদর থেকেই আনিয়ে দেওয়া যাবে।

ডাক্তার কহিলেন: কলেরা, নিউমোনিয়া, এপোপ্লেক্সী, মেনেনজাইটিস প্রভৃতি রোগের যা-কিছু জরুরী ওষুধপত্র আমার ব্যাগেই থাকে, আর এই ব্যাগ আমার সকল সময়ের সাথী। ওষুধের জন্যে আপনাকে ব্যস্ত হোতে হবে না। তবে, আমার কি ধারণা জানেন—রোগীর সঙ্গে বাড়ীর লোকজনের নিরাপত্তাও দেখা চাই। এদের অবস্থা তো বুঝতেই পারছেন, খাবার সংস্থান নেই। রোগীর খাদ্য-পথ্যের সঙ্গে ওদেরও খাবার ব্যবস্থা করে দিয়ে একটা অপূর্ব আনন্দ উপলব্ধি করুন। আর একটি কথা, রোগীর ব্যবহারের জন্য পরিষ্কার বিছানাপত্র এবং কাপড়-জামাও চাই।

বাপুলী কহিলেন: আপনার কথাতেই বুঝতে পারছি, আপনি যখন এসেছেন, রোগী বাঁচবেই; আর তাকে বাঁচাবার জন্যে তার পরিজনদের দুঃখ-কষ্টের অবসান যে করতেই হবে, এ কথা বৌরাণীও বলে দিয়েছেন।

আমিও তৈরী হয়েই এসেছি। খান কয়েক ধোপ-দুরস্ত মোটা চাদর আমাদের সঙ্গেই এসেছে, উপস্থিত এতেই কাজ চলুক; তার পর আর সব জিনিস যা যা প্রয়োজন হবে, আজই আনাবার ব্যবস্থা করে দেব।

অতঃপর ডাক্তারের সম্মুখেই গৃহস্বামী নামদার খাঁকে ডাকিয়া আনিয়া বাপুলী তাহার হাতে নগদ এক শত টাকা দিয়া কহিলেন: বাশুলীর সেরেস্তা থেকে এই টাকা তোমাকে দেওয়া হোচ্ছে; তুমি ভেবো না যে, খয়রাৎ করে সেরেস্তা বাহাদুরী জানাচ্ছে। তোমরা হোচ্ছ প্রজা—সন্তানের মত; তোমাদের আপদে-বিপদে জমিদার-সরকার তোমাদের সাহায্য করতে বাধ্য, আর এতে তোমাদের দাবীও আছে। এই টাকায় সংসারের অভাব মিটিয়ে ফেল; সংসারে শান্তি ও সুসার না এলে রোগীর মনে শান্তি আসবে না—সেই জন্যেই এই ব্যবস্থা করা হোয়েছে।

বৃদ্ধের দুই চক্ষু ঝাঁপাইয়া তখন অশ্রুর বন্যা বহিয়াছে; আনন্দে, ভাবের প্রাচুর্যে, কৃতজ্ঞতার আবেগে তাহার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া গেল। ডাক্তার জানাইলেন: রোগীর যে রকম অবস্থা, তা'তে এখানে থেকেই আমাকে ওর চিকিৎসা করতে হবে।

বাপুলী কহিলেন: আপনার ইচ্ছার উপর আমাদের কোন কথা নেই। আপনি যদি এখানে থাকতে চান, কোন অসুবিধা যা'তে আপনার না হয়, সে ব্যবস্থা আমি করব। আমার সঙ্গে যাঁরা এসেছেন, তাঁরাও আপনার সঙ্গেই এখানে থাকবেন। আমি আবার আপনাকে আমাদের বৌরাণীর পক্ষ থেকে সবিনয়ে বলছি ডাক্তারবাবু, এই রোগীকে সারিয়ে তোলার জন্যে আপনি যে-কোন ব্যবস্থা করতে বলবেন, তার কোন ত্রুটি হবে না।

প্রফুল্ল মুখে ডাক্তার কহিলেন: আপনাদের বৌরাণীর সম্বন্ধে আমি যে সব কথা শুনেছিলাম, এখন ভাবছি, সেগুলির কোনটিই অতিরঞ্জিত নয়। বাঙলা দেশের এমনি কোন ষ্টেটের সংস্রবেই আমি কাজ করতে

চেয়েছিলাম—ঠিক এই ভাবেই মফঃস্বলের বাসিন্দাদের চিকিৎসা করবার আগ্রহে। আমি যদি কিছু দিন এখানে থাকি, পল্লী-অঞ্চলের এ অবস্থার প্রতিকার করাই হবে আমার প্রধান কাজ। আর, এতে যে আপনাদের পরিপূর্ণ উৎসাহ পাব, তার নমুনা তো আপনি হাতে-কলমেই দেখিয়ে দিলেন। কি অদ্ভুত ব্যাপার বলুন দেখি—তিন-চার ক্রোশ জুড়ে যে সব গ্রাম, হাজার হাজার লোকের বসতি, সেখানে এক জন ডাক্তার নেই!

বাপুলী কহিলেনঃ আপনি এখানে এসেই যে উদারতা দেখিয়েছেন ডাক্তারবাবু, তাতে সমস্ত অঞ্চলটার মধ্যেই একটা সাড়া পড়ে গেছে, সবাই ধন্য ধন্য করছে আপনার নামে।

কুণ্ঠিত ভাবে ডাক্তার কহিলেনঃ এখন রোগীকে যদি চাঙ্গা করে তুলতে পারি, তবেই আমার এ প্রচেষ্টা সার্থক হবে।

ইহার পর ডাক্তারের সহিত শুশ্রূষাকারীদের অবস্থিতি ও আহারাদির যাবতীয় সুব্যবস্থা করিয়া বাপুলী মহাশয় বাশুলীতে ফিরিয়া যান। সাত দিনব্যাপী চিকিৎসার পর রোগীকে রোগমুক্ত ও পথ্য দান করিয়া অষ্টম দিন বাপুলী মহাশয়ের সুষ্ঠু তত্ত্বাবধানে ডাক্তার রায় সহকর্মীদের সহিত বাশুলী-ভবনে প্রত্যাবর্তন করেন।

সেই দিবসই অপরাহ্ণে পাঠাগারের উদ্যোগে বাশুলীর অধিবাসীরা ডাক্তার রায়কে বিশেষ ভাবে সম্বর্দ্ধনা করিবার জন্য এক সভা আহ্বান করিলেন। ডাক্তার রায় এই সব বাহ্যিক অনুষ্ঠানের পক্ষপাতী নহেন বলিয়া প্রথমে আপত্তি তুলিয়াছিলেন। কিন্তু পাঠাগারের সম্পাদকরূপে রাজীব যখন ইহার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে যুক্তি প্রদর্শন করিল, তখন তাঁহার পক্ষে আর আপত্তি করা সম্ভবপর হইল না। মল্লিকপুরে রোগীর পরিচর্যা-ব্যাপারে এই উৎসাহী রাজীব ছেলেটির প্রতি বিশেষ ভাবেই তিনি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন।

মল্লিকপুরের এক দরিদ্র রোগীর প্রতি বাশুলীর জমিদার সরকারের

অত্যধিক বদান্যতা এবং সেই সম্পর্কে নবাগত এই ডাক্তারটিকে বিপুল ভাবে মর্যাদা দানের জন্য নিবারণ ও ডাক্তার বাগচী অত্যন্ত বাড়াবাড়ি ভাবিয়া মনে মনে ক্ষুণ্ণ ও বিরক্ত হন। এই সূত্রে এমন সংবাদও তাঁহাদের কর্ণগোচর হইল যে, পরবর্তী মনোনয়নের দিবস বাশুলীর মহোৎসাহী তরুণ সমাজ নাকি ডাক্তার রায়কে মনোনীত করিবার জন্য কমিটীর সদস্যগণের উপর প্রভাব বিস্তার করিবে এবং সেই সঙ্গে কালো নিশান লইয়া এক দল তরুণ মিছিল করিয়া বাহির হইবে—তাহাদের নিশানের বুকে লেখা থাকিবে—'ডাক্তার বাগচী, ফিরিয়া যাও!' কথাটা মাধুরী দেবীও কোন সূত্রে জানিতে পারেন। সঙ্গে সঙ্গেই তিনি ডাক্তার বাগচীকে গোপনে আহ্বান করিয়া নিজের সম্মান আরো ক্ষুণ্ণ না করিয়া বিদায় লইতে অনুরোধ জানান। সেই সঙ্গে যে অর্থ তিনি খেসারত স্বরূপ ডাক্তার বাগচীর হাতে তুলিয়া দেন, তাহার প্রাচুর্যে ডাক্তারের সকল ক্ষোভের অবসান ঘটে। ফলে, ডাক্তার রায়ের সম্বর্ধনা-আসরেই রাষ্ট্র হইয়া গেল যে, ধূমকেতুর মত যে বৃদ্ধ ডাক্তারটি বাশুলীর আকাশের একাংশ আবৃত করিয়াছিলেন, তিনি অদৃশ্য হইয়াছেন। এই শুভ সংবাদটি শুনিয়া বাশুলীর সর্বসাধারণ যে আশ্বস্ত ও পরিতুষ্ট হইলেন, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ ছিল না।

চিকিৎসক মনোনয়নের দিন মধ্যাহ্ন-ভোজনের পর হরিনারায়ণ সহসা অসুস্থ হইয়া পড়েন। খবর পাইবামাত্র গোবিন্দ ও চণ্ডী কর্তার শয়নকক্ষে আসিয়া দেখিল, মাধুরী ও মৃণালিনী মাথার দিকে দুইখানি কেদারায় পাশাপাশি বসিয়া রোগীর দিকে চাহিয়া আছেন।

চণ্ডী তাড়াতাড়ি শ্বশুরের শয্যাপ্রান্তে বসিয়া তাঁহার অবসন্ন পদদ্বয় গাড়ে তুলিয়া লইল। ক্ষীণ কণ্ঠে হরিনারায়ণ কহিলেন: বৌমা বুঝি?

চণ্ডী জিজ্ঞাসা করিল: মাথায় কি কষ্ট হোচ্ছে বাবা?

মৃদু স্বরে হরিনারায়ণ কহিলেন: হ্যাঁ—মা।

গোবিন্দ মাধুরীকে লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিল : ডাক্তারকে খবর দেওয়া হোয়েছে, মা ?

মাধুরী দেবী কণ্ঠস্বর কিঞ্চিৎ তিক্ত করিয়া উত্তর করিলেন : না। উনি বললেন—বৌমা ওঁর চিকিৎসা করবেন, তাঁর ওষুধ ছাড়া আর কোনো ডাক্তারের ওষুধ উনি খাবেন না। বাপুলি মশাইকেও পাওয়া গেল না—তিনি নতুন ডাক্তারকে তোয়াজ করতে মল্লিকপুরে গেছেন।

গোবিন্দ কহিল : ডাক্তার বাগচী মশায় তো বাড়ীতেই রয়েছেন, তাঁকে একবার ডাকলে—

গোবিন্দের কথায় বাধা দিয়া মাধুরী দেবী কহিলেন : যদি তাঁর ওষুধই না খাবেন, ডেকে আনা মানে তাঁকে অপমান করা। বৌমা তো এসেছেন, উনিই—

বলিতে বলিতে বৌমার দিকে সহসা মুখ ফিরাইয়া চাহিতেই তাঁহার মুখের কথা বন্ধ হইয়া গেল। স্তব্ধ-বিস্ময়ে তিনি দেখিলেন, ইতিমধ্যেই বৌমা অঞ্চল হইতে রূপার একটি ক্ষুদ্র কৌটা খুলিয়া তন্মধ্যে রক্ষিত চূর্ণ পদার্থ কয়েক টুকরা কাগজে ঢালিতেছেন। বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে, চণ্ডী শ্বশুরের জন্য ঔষধ লইয়াই আসিয়াছে।

অনতিবিলম্বে একটি পুরিয়া লইয়া চণ্ডী শ্বশুরের শিয়রের দিকে আগাইয়া আসিয়া কহিল : ওষুধটা খেয়ে ফেলুন বাবা, মাথার যন্ত্রণা এখনি কমে যাবে।

সুবোধ সরল শিশুর মত হরিনারায়ণ মুখ-ব্যাদান করিতেই চণ্ডী চূর্ণ পদার্থ-টুকু মুখবিবরে ঢালিয়া দিয়া তৎক্ষণাৎ টিপয় হইতে জলপাত্রটি মুখে ধরিল। এক চুমুক জলপান করিয়া হরিনারায়ণ কহিলেন : আমি জানতুম মা, খবর পেয়েই তুমি একবারে তৈরী হয়েই আসবে। তোমার ওষুধে আমার বিশ্বাস আছে।

চণ্ডী মুখখানা একটু কঠিন করিয়া কহিল : এ কথা বলবার তো কোন

দরকার ছিল না বাবা! আপনি তো জানেন, আর ডাক্তাররা একবাক্যে আপনাকে বলেছেন, যখনই এইভাবে অসুস্থ হবেন, তখনই শুয়ে পড়বেন, মুখখানি বুজিয়ে ফেলবেন—একটি কথাও বলবেন না। তবে?

হরিনারায়ণ কি বলিতে যাইতেছিলেন, চণ্ডী তৎক্ষণাৎ ভ্রূভঙ্গি করিয়া কহিল: আবার কথা বলতে চাইছেন বাবা? তা'হলে আমরা উঠে যাবো। কথা আপনি কিছুতেই বলতে পারবেন না; শুয়ে শুয়ে মুখখানি বুজিয়ে আমাদের কথা শুনুন।

হরিনারায়ণ ইহার পর সত্যই নীরব হইলেন এবং অল্পক্ষণ পরেই ঘুমাইয়া পড়িলেন। চণ্ডী শাশুড়ীর দিকে চাহিয়া কহিল: ঘুমটাই এখানে আসল ওষুধ মা! যে অস্থির মানুষ, কিছুতেই মুখ বুজিয়ে থাকতে চান না। ঘুমিয়ে যখন পড়েছেন, আর ভয় নেই।

সত্যই, গভীর নিদ্রান্তে হরিনারায়ণ সেদিন সুস্থ হইয়া উঠায় বিপত্তি অল্পের উপর দিয়াই চলিয়া যায়। কিন্তু চণ্ডীর কঠোর শাসনে পরদিনও তাঁহাকে শয্যাশায়ী অবস্থায় নীরবে সমস্ত দিন অতিবাহিত করিতে হইল।

তৃতীয় দিনে তিনি পূর্ববৎ আরাম-কেদারায় বসিয়া এবং চণ্ডীর সহিত কথা কহিয়া যেন বর্তাইয়া গেলেন। কথা-প্রসঙ্গে ডাঃ রায় এবং মল্লিকপুরের সেই মুসলমান রোগীটির কথা উঠিতেই চণ্ডী কহিল: কাকা-বাবু সেদিককার ব্যবস্থা সব করে এসেছেন। আর, ঈশ্বর যা করেন, সে যে মঙ্গলের জন্যেই—এই ব্যাপারে সেটাও বেশ বোঝা গেছে।

হরিনারায়ণ জিজ্ঞাসা করিলেন: কি ভেবে কথাটা বলছ মা?

চণ্ডী কহিল: একটা দরিদ্র প্রজার জন্যেও আপনার দরদ যে কতখানি সেটা আপনার তালুকের সবাই জানতে পারল। এর পর ও অঞ্চলের লোকেরাও বুঝতে পারবে যে, ঝাড় ফুঁকে বা হাতুড়ে রোজার ওষুধে রোগ সারে না। এখন থেকে সবাই ডাক্তারখানার ওষুধ খেতে চাইবে ভালো হবার জন্যে।

হরিনারায়ণ কহিলেনঃ অবিশ্যি যদি এই রোগীটা না টেঁসে যায়। তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে বৌমা, তুমি যেন মনে ঠিক দিয়ে রেখেছ—রোগী বেঁচে উঠবেই।

চণ্ডী কহিলঃ এ রোগে যদি থামা দেওয়া যায়, তার পর রোগ বেড়ে না ওঠে, তা'হলে আর ভাবনা নেই। খবর পেয়েছি, সেই লক্ষণই দেখা গেছে।

হরিনারায়ণ কহিলেনঃ আমি ভাবছি মা, ঐ রোগীটার শুভাদৃষ্টের কথা! খুব সাধারণ আর অখ্যাত হোয়েও আজ তার এমনি সৌভাগ্য যে, বাশুলীতে এমন লোক নেই, যে তার জন্যে না ভাবছে! তুমিও মা ঐ লোকটার জন্যে—

গাঢ় স্বরে চণ্ডী কহিলঃ বাবা, যেদিন আপনার তালুকের প্রত্যেক প্রজাটির জন্যে আমাদের মনে এমনি দরদ আসবে—সেই দিন বুঝবো, প্রজাপালনের যে ভার আপনার হাতে এসে পড়েছে, সত্যিই সে সার্থক হোয়েছে!

হরিনারায়ণ কহিলেনঃ এই সঙ্গে আমিও স্থির বুঝিছি মা, মানুষ যা ভাবে, যদি সে ভাবনার সঙ্গে নিষ্ঠা থাকে, অন্তরের যোগ থাকে, তাহলে তা পূর্ণ হবেই। তার সাক্ষী এই দেখ না মা, কমিটীর ওপরে সব ভার ছেড়ে দিয়ে তুমি তো নিশ্চিন্ত হোয়ে ঘরে বসেছিলে, কিন্তু এমনি আশ্চর্য, ভগবান নিজেই তোমার ইচ্ছাটি পূরণ করে দিলেন। এর পর ঐ ডাক্তারকে নেওয়া হবে না—এ কথা বলবার সাহস আর কেউ পাবে?

কক্ষ মধ্যে সে সময় মাধুরী দেবী উপস্থিত ছিলেন, তিনি মুখখানি অন্য দিকে ফিরাইয়া লইলেন। চণ্ডীও শ্বশুরকে শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া আস্তে আস্তে নীরবে উঠিয়া গেল।

ইহার কয়েক দিন পরে ডাক্তার মনোনয়নের পাঠ চুকিয়া গেলে,

মাধুরী দেবী সহসা হরিনারায়ণকে কহিলেন : তোমার কাছে একটা ভিক্ষা আমার আছে।

স্থিরদৃষ্টি পত্নীর মুখে নিবদ্ধ করিয়া হরিনারায়ণ কহিলেন : কোন দিন তো তোমার মুখে এ কথা শুনিনি? কি ব্যাপার বল দেখি?

মাধুরী দেবী কহিলেন : আমার জীবনে এর আগে এমন দুর্দিনও বুঝি আর কোন দিন আসেনি, সেই জন্যেই এটা চাইতে হোচ্ছে।

মৃদু স্বরে হরিনারায়ণ কহিলেন : বল।

মাধুরী দেবী কহিলেন : শুনেছিলাম, বছর সাতেক আগে আমার নামে সরস্বতী পরগণাটি কিনেছিলে?

হরিনারায়ণ কহিলেন : কুণ্ঠিত হোয়ে কথাটা বলছ কেন? ও-পরগণাটা শুধু যে তোমার নামে কেনাই হোয়েছে তা নয়, ওর মুনাফাও তোমার নামে আলাদা জমা হোচ্ছে।

বিস্ময়ের সুরে মাধুরী দেবী কহিয়া উঠিলেন : বলো কি?

হরিনারায়ণ উত্তর করিলেন : তালুকটা কেনার কথা তোমাকে যখন বলি, তোমার কাছ থেকে কোন সাড়াই পাইনি। ব্যাপারটা তুচ্ছ ভেবেই চুপ করেছিলে। কিন্তু আমি আমার কর্তব্য ভুলিনি। বছর সালিয়ানা ওর আয়ের সব টাকাই তোমার হিসাবে জমা করবার হুকুম দিই।

মাধুরী দেবী জিজ্ঞাসা করিলেন : সে কত হবে?

হরিনারায়ণ কহিলেন : সঠিক বলতে হোলে হিসাব তলব করতে হয়, আন্দাজ মত বলতে পারি—সাত সনে বছরে গড়-পড়তা বিশ হাজার ধরলে এক লাখ চল্লিশ হাজার হয়। এ টাকা সব তোমার।

মাধুরী : এ টাকা আমি ইচ্ছা করলেই পেতে পারি?

হরিনারায়ণ : তোমার টাকা তুমি পাবে—এতে জিজ্ঞাসার কি আছে?

মাধুরী : তা'হলে আমার নামের ঐ তালুক দান-বিক্রী করবার অধিকার আমার আছে?

হরিনারায়ণ: জমিদারের মেয়ে আর জমিদার-বংশের গৃহিণী হোয়ে এ কথা জিজ্ঞাসা করাই বৃথা। ও-তালুক তোমার, তুমিই ওর মালিক। কিন্তু এত কাল পরে আজ হঠাৎ এ কথা কেন?

মাধুরী দেবী কহিলেন: সেই কথাই এখন তোমাকে বলব। আর আমার নামে সঞ্চিত সমস্ত টাকা আমি আজ আহুতি দেব।

সভয়ে ও সবিস্ময়ে হরিনারায়ণ পত্নীর দিকে চাহিয়া কম্পিত কণ্ঠে কহিলেন: কি ব্যাপার আমাকে জানাও তো—কিছু লুকিও না, সব বলো।

গাঢ় স্বরে মাধুরী দেবী কহিলেন: তাই বলছি। তুমি শোনো—মনে আছে, মাস কয়েক আগে হঠাৎ এক দিন বৌমার সঙ্গে বোঝাপড়া করতে গিয়ে নিজেই হেরে যাও, তার পর পরাজয়ের সেই জ্বালা ভোলবার জন্যে আমার কাছে এসেছিলে আর একটা বোঝা-পড়ার মতলব নিয়ে?

স্নিগ্ধ স্বরে হরিনারায়ণ কহিলেন: মনে আছে বৈ কি, তবে তুমিও তোমার মাতৃত্বের দিক দিয়ে নজির দেখিয়ে যে জবাব দিয়েছিলে, আমাকেও বোঝা-পড়া করতে এসে শেষে হার স্বীকার করে লজ্জায় সরে যেতে হয়েছিল। কিন্তু আজ সে পুরানো কথা কেন?

বিজলী বিকাশের মত মুখের কোণে হাসির একটু তীক্ষ্ণ রেখা প্রকাশ করিয়া মাধুরী দেবী কহিলেন: পুরানো কথাই অনেক সময় কঠিন সমস্যার সমাধান করে দেয় যে! সেই পুরানো কথাই আজ আমার বুকে কাঁটার মত ফুটে এমনি যন্ত্রণাদায়ক হয়েছে যে, আমি কিছুতেই সহ্য করতে পাচ্ছি নে তার জ্বালা!

হরিনারায়ণ বাবু এতক্ষণে আরাম-কেদারায় অঙ্গ ঢালিয়া কথা কহিতেছিলেন, এক্ষণে সন্তর্পণে সোজা হইয়া বসিয়া উদ্বিগ্ন ভাবে কহিলেন: তোমার মুখ দেখেই তার আভাস পাচ্ছি। কি হোয়েছে আমাকে বল—কি সে যন্ত্রণা, কে দিয়েছে, কার জন্যে—

আর্ত স্বরে মাধুরী দেবী কহিলেন: বলছি, সেই কথাই বলছি, সে আর কেউ নয়, আমার ছেলে, আমার—নিবারণ।

মুখখানা কঠিন করিয়া কণ্ঠে জোর দিয়া হরিনারায়ণ কহিলেন: নিবারণ?

ভগ্ন স্বরে মাধুরী দেবী উত্তর করিলেন: হ্যাঁ। সেই পুরোনো কথা ধরে সেও আমার কাছে এসেছিল বোঝা-পড়া করতে, কিন্তু আমি তাকে বোঝাতে পারিনি, পুত্রস্নেহ দিয়ে স্বার্থের যে বোঝা ভারি করেছিলুম, তার ভার সইবার শক্তি যখন হারিয়ে ফেলেছি, কি জবাব তাকে দিতে পারি বল? নিবারণের কাছে আমি হেরে গেছি, তার ব্যথায় সান্ত্বনা দেবার আমার কিছু নেই; সেই জন্যেই আমি ভেবেছি—

গম্ভীর মুখে হরিনারায়ণ কহিলেন: এতক্ষণে বুঝতে পেরেছি, কেন তুমি ভিক্ষা চাইছিলে! কিন্তু বলতে পারো—তোমার নামের পরগণা, সঞ্চিত টাকা নিবারণকে দান করলেই কি তুমি শান্তি পাবে? এতেই তার সঙ্গে তোমার বোঝা-পড়া সব শেষ হয়ে যাবে? আর সেও কি তোমাকে মুক্তি দেবে?

উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে মাধুরী দেবী কহিলেন: তা আমি জানি না, জানতে চাই না। আমি এইটুকু জানি, আশার যে ছবি আমিই তার মনে শিশুকাল থেকে ফুটিয়ে দিয়েছি, সে আশা ভঙ্গের পর নিজেকে ছোট করে কিছুতেই সে বাঁচতে পারবে না; তার চেয়ে ঐ সম্পত্তিকে সম্বল করে নিজের ভবিষ্যৎ সে গড়ে তুলুক। মা হোয়ে যে অন্যায় আমি করেছি, এই হোক তারই প্রায়শ্চিত্ত—আমার ভুলের মাশুল।

ধীর স্বরে হরিনারায়ণ কহিলেন: বেশ, এতে যদি তুমি সান্ত্বনা পাও, আমি সুখীই হব। তোমার নামের ঐ তালুক আর টাকার মালিক যখন তুমি—নির্ব্যূঢ় স্বত্বে যদি নিবারণকেও জুটোই দিতে চাও, তাতে আমার বা ষ্টেটের পক্ষ থেকে আপত্তির কিছু নেই।

উনিশ

ইহার পর কতকগুলি গঠনমূলক ঘটনার ভিতর দিয়া আরও তিনটি মাস নিরুপদ্রবেই অতিবাহিত হইয়াছে। ঘটনারাজির অল্প-বিস্তর বৈচিত্র্য জনসাধারণের অন্তরে যথেষ্ট চাঞ্চল্যও তুলিয়াছে। যথা :

বিভিন্ন পল্লীতে চণ্ডীর শিক্ষা-বিস্তারের পরিকল্পনা কিছু কিছু পরিবর্তিত আকারে কার্যকরী হইয়াছে। উপরন্তু মল্লিকপুরের ঘটনাটিকে উপলক্ষ করিয়া শিক্ষার সঙ্গে-সঙ্গে স্বাস্থ্যরক্ষারও অঙ্গাঙ্গী ব্যবস্থা অত্যন্ত জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। গাঙ্গুলী বাবুদের বিশাল জমিদারীর মধ্যে যে যে অঞ্চলে তহশীলদারীর কাছারী বিদ্যমান—বিঘার পর বিঘা মুক্ত জমি, চারি ধারে ঝিল, বড় বড় বাগান ও পুষ্করিণী-সংলগ্ন বৃহৎ বৃহৎ বাড়ী অধিকার করিয়া জমিদার সরকারের প্রতিনিধিরূপে এক এক তহশীলদার মুহুরী ও পাইক-বরকন্দাজদের সহিত বসবাস ও প্রজা শাসন করিয়া থাকে, সেই সুবিস্তীর্ণ সরকারী জমিতেই প্রস্তাবিত পাঠশালা, পাঠাগার ও দাতব্য চিকিৎসালয় খুলিবার আয়োজন চলিয়াছে। কয়েক স্থানে গৃহের প্রাচুর্য থাকায় প্রাথমিক কাজ আরম্ভ হইয়াছে; অন্যান্য স্থানে গৃহ নির্মাণের কাজ দ্রুতগতিতে চলিয়াছে। একই স্থানে পাশাপাশি বাড়ীতে বিভিন্ন বিভাগের এই ব্যবস্থা শিক্ষার্থীদের পক্ষে বিশেষ সুবিধাজনক হইয়াছে। ডাক্তার রায় স্থির করিয়াছেন যে, যাহারা পাঠশালায় বিদ্যাশিক্ষা করিতে আসিবে, তাহাদিগকে শিক্ষার সঙ্গে স্বাস্থ্যরক্ষা ও রোগীর সেবা-শুশ্রূষার প্রণালীও শিক্ষা দিয়া ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া লইবেন। বাশুলীর এক দল শিক্ষিত তরুণ এ কার্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছে, এবং ডাক্তার রায় কলিকাতা হইতে বাছিয়া বাছিয়া এমন কতকগুলি কৃতী কর্মীকে আনিয়াছেন—চিকিৎসা-ব্যাপারে যাঁহাদের মোটামুটি অভিজ্ঞতা আছে, পল্লী-অঞ্চলে থাকিয়া আর্তসেবা পছন্দ করেন এবং পিছনে কোন আকর্ষণও নাই।

ফলে, গ্রামাঞ্চলে রীতিমত একটা আলোড়ন উপস্থিত হইয়াছে। অবশ্য, তহশীলদারদের নির্ঝঞ্ঝাট জীবনযাত্রার পথে এই সব কর্মচাঞ্চল্য উপদ্রব-স্বরূপ হইলেও, স্থানীয় অধিবাসীরা কিন্তু আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে। তাহারা কল্পনাও করে নাই যে, কিছুদিন পূর্বে যে সব বড় বড় কথা তাহারা শুনিয়াছিল, সত্য সত্যই এত শীঘ্র তাহা কার্যে পরিণত হইবে।

ওদিকে মাধুরী দেবী সরস্বতী পরগণাটি নিবারণকে দানপত্র দ্বারা অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। নিবারণের ইচ্ছা ছিল যে, বাগুলীর সেরেস্তা হইতে তাহার তালুকের সেরেস্তা তুলিয়া ঐ তালুক-সংলগ্ন সরস্বতী-কানন নামক বিখ্যাত উদ্যান-ভবনে স্থাপিত করিবে। কিন্তু কার্যত তাহা হয় নাই। বাগুলীর বুকের উপরেই সে তাহার 'রাজগী' চালাইবার ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া ফেলিয়াছে, ইহার পশ্চাতে রহিয়াছে তাহার বান্ধবী তরলার কূট বুদ্ধিদীপ্ত এক রহস্যময় নির্দেশ।

বৈদ্যনাথ কবিরাজের পরিবারবর্গ যে দিবানিদ্রায় একান্ত অভ্যস্ত এবং এজন্য তৃতীয় প্রহরটি ব্যাপিয়া বৃহৎ বাড়ীখানি প্রায়ই নিস্তব্ধ থাকে, এই তথ্যটি নিবারণের অবিদিত ছিল না। ইদানীং প্রায় প্রত্যহই এই প্রহরটির প্রারম্ভে বাহিরের রুদ্ধদ্বারে অতি সন্তর্পণে নিবারণ আসিয়া দাঁড়াইবা মাত্র বাতায়ন-পথে প্রতীক্ষারত দু'টি বড় বড় কৌতূহলী চক্ষু চঞ্চল হইয়া উঠিত, এবং পরক্ষণে ভিতর হইতে খুট করিয়া রুদ্ধ দ্বারটি খুলিয়া দিয়া তরুণী তরলা সহাস্যে তাঁহাকে পার্শ্বের ঘরে লইয়া যাইত। স্বামীদের স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে পত্নী-সমাজের কর্তব্য সম্বন্ধে সেখানে তাহাদের বহু আলোচনা হইত। ডাক্তার মনোনয়ন ব্যাপারে নিবারণের প্রচেষ্টা ও ব্যর্থতাকে তরলা নিজের ব্যর্থতা ভাবিয়া বেদনাহত হইলেও, সে মনে মনে স্থির করিয়া ফেলে যে, ঐ ডাক্তারকেই পুনরায় বাগুলীতে আনাইয়া উপযুক্ত প্রতিষ্ঠা তাঁহাকে দিয়া প্রারম্ভেই একটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিবে। ইহার ফলে, নিবারণের জিদ প্রকারান্তরেও অন্তত বজায় থাকিবে। মনে মনে

উৎফুল্ল হইয়া নিবারণ ভাবে, এমন ভাবে এ পর্যন্ত কেহ তাহাকে উৎসাহ দেয় নাই—সেই কুখ্যাত বিশু ডাক্তারটি ছাড়া। উৎসাহদীপ্ত দৃষ্টিতে তরলার আরক্ত মুখের পানে চাহিয়া নিবারণ বলিয়া উঠে—'আপনি যদি আমাকে বুদ্ধি যুগিয়ে দেন ত আমি অসাধ্য সাধন করতে পারি।' পুরুষের মুখে বুদ্ধির প্রশংসা শুনিলে আত্মপ্রসাদে অভিভূত হইয়া পড়ে না এমন মেয়ে পৃথিবীতে অতি বিরল। তরলা ভাবিতে থাকে, এই জেদী ছেলেটির ঘটে এমন কিছু সুবুদ্ধি সে যোগান দিবে যথার্থ-ই যাহা সার্থক হইবে। তরলা তখন জিজ্ঞাসা করে—'বিদ্যাভারতীর কাজ সুরু হয়ে গেছে শুনেছেন তো?'

নিবারণ শুষ্কস্বরে উত্তর করে—'হ্যাঁ, প্ল্যান করেছে ভালই। তালুকের মধ্যে অনেকগুলো মৌজা আছে তো, দু'তিনটে মৌজার এলাকায় এক-একটা কাছারী খোলা হয়—ঐ অঞ্চলের মধ্যে সেরা জমিতেই কাছারী-বাড়ী ওঠে। চার দিকে ঝিল, ভিতরে অনেকখানি করে ফাঁকা জায়গা, বাগান, দীঘি—তার মাঝখানে কাছারী-বাড়ী। যদি কখনো সদর থেকে কর্তারা মহাল দেখতে যান, আর কিছু দিন ওখানে থাকেন, সেই ভেবে কাছারী-বাড়ীর পিছনে সম্ভ্রম বজায় রেখে মালিকদের থাকবার মত আলাদা আলাদা মহল প্রত্যেক অঞ্চলে একই আদলে তৈরী করিয়েছিলেন আমার খেয়ালী বাবা মশাই! লোকে মফঃস্বলের ঐ সব কাছারী-বাড়ী দেখে ভাবত, বাবুদের টাকা রাখবার তো জায়গা নেই; তাই, মৌজায় মৌজায় এই সব বাড়ী বানিয়ে ফেলে রেখেছেন! মাঝে থেকে নায়েব-গোমস্তারাই তার সুযোগ সুবিধা ভোগ করছিল। বছর দুই আগেও আমি কাছারী-বাড়ীর বাইরের দিকটা রেখে পিছনের বাড়ী, জমি, দীঘি, ঝিল সব বিলি করবার প্রস্তাব তুলেছিলাম, কিন্তু বাবা তাতে বলেছিলেন—ওগুলো বিলি করলে আয় যে পরিমাণে বৃদ্ধি পাবে, আমার মানটা তার তুলনায় একশো গুণ খর্ব হবে। অথচ, আজ নতুন-বৌ ক্ষমতা হাতিয়ে নিয়ে নিজের খেয়াল

মতন তাঁর কাজে এখন সেগুলো লাগাচ্ছেন! ঐ সব বাড়ীতে পাঠশালা বসছে, লাইব্রেরী হচ্ছে, ডাক্তারখানা, নার্সিংহোম—আরো কত কি! তার পর মেয়েদের আব্রু বজায় রেখে শেখাবার সব ব্যবস্থা—এলাহি কাণ্ড! বাবারও মুখ বন্ধ, বলবার কিছু নেই।'

সেদিন স্তব্ধ ভাবেই তরলা নিবারণের কথাগুলি শুনিয়াছিল! তাহার বুঝিতে অসুবিধা হয় নাই যে,পুত্র হইয়াও নিবারণ তাহার রহস্যময় পিতাকে বুঝিতে পারে নাই। আয়বৃদ্ধি হইবে জানিয়াও এক দিন তিনি পুত্রের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন, অথচ সেই সম্পর্কেই ব্যয়বৃদ্ধি সত্বেও বিদ্যাভারতীর ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কিছুই বলেন নাই। নিশ্চয়ই তিনি উপলব্ধি করিয়াছেন যে, শেষের ব্যবস্থায় যে পরিমাণে অপব্যয় হইবে, তাহার শতগুণ উর্ধ্বে উঠিবে খ্যাতিপথে কৌলিক মান। তরলা ভাবিতে থাকে, এই বিরাট পরিকল্পনার সঙ্গে একদা ঘনিষ্ঠ ভাবে সেও সংশ্লিষ্ট ছিল, বিদ্যাভারতী সেদিন তাহাকে নিজের ডান হাত ভাবিয়া আশান্বিত হইয়াছিলেন। কিন্তু তার পর একদিন এক দণ্ডেই এমন ভাবে তাহাদের মধ্যে মতান্তর ঘটিল যে, পূর্বের নিবিড় যোগসূত্রের কোন চিহ্নই এখন আর নাই। সেই যে সে তাঁহার সম্মুখ হইতে সদর্পে চলিয়া আসিয়াছে, সেখানে পুনর্গমনের পথও সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। আজ, সেই পরিকল্পনার রূপ-রেখা বুঝি অগ্নিশিখার মতই তাহাকে পরিবেষ্টন করিয়া তাহার সর্বাঙ্গে উত্তাপ-জনিত একটা দুঃসহ জ্বালা ধরাইয়া দিয়াছে। এই জ্বালার অবসান ঘটাইতে হইলে কোন্ পথে গিয়া তাহাকে আশ্রয় লইতে হইবে—এইমাত্র নিবারণ তাহার যে বুদ্ধির প্রশংসা করিয়াছে—সেই বুদ্ধির আলোকেই উদ্ভাবিত করা চাই। তাই নিবারণের কথার উত্তরে অবিচলিত কণ্ঠে তাহাকে বলিতে হয়—'আপনার খেয়ালী বাবার মুখ বন্ধ করবার কৌশল উনি জানেন বলেই এটা সম্ভব হয়েছে। আপনিও তো এক সময় ওঁর স্নেহটুকু পুরোপুরি দখল করে বসেছিলেন, একটা বড় সুযোগই তখন হারিয়ে ফেলেছেন—

কিছুই আদায় করে নিতে পারেননি। কিন্তু আপনার বৌদির কাণ্ড দেখুন, তাঁর বরাতে সেই সুযোগটি আসবা মাত্রই তিনি নিজের কোলে ঝোলটুকুর ষোল আনাই টেনেই নিলেন—ছিটেফোঁটাও আর অবশিষ্ট নেই আপনার নেবার মত। তাই বলি, বাবাকে ছেড়ে এখন মাকে ধরুন—যদি কিছু পাবার থাকে ওঁর কাছেই এখনো আছে।'

তরলার কথায় নিবারণের চক্ষু অমনি খুলিয়া যায়; সেও বুঝিতে পারে যে, এখন পর্যন্ত গাঙ্গুলী-বাড়ীর শুদ্ধান্তে তাহার মায়ের অখণ্ড প্রতাপ এবং পিতাকেও সে প্রভাবের অধীনতা স্বীকার করিতে হয়। আর তাহাকে বড় করিবার জন্য—কৌলিক মর্যাদার সহিত তাহার প্রতিষ্ঠাকল্পে মায়ের প্রচেষ্টাও তো সে সবই জানে এবং উপরন্তু তাহার মা যে বিপুল আয়সম্পন্ন সরস্বতী পরগণা নামক বিস্তীর্ণ তালুকের স্বত্বাধিকারিণী, এ তথ্যও তো তাহার অবিদিত নহে। বাগুলীর গদী যদি তাহাকে ত্যাগ করিতেই হয়, তাহা হইলে মাতৃস্বত্বে এই তালুকের স্বত্ববান হইয়া সে ত প্রতিযোগী ভূস্বামীরূপে নূতন করিয়া ভাগ্যের সহিত সংগ্রাম করিতে পারে! এবং তখন হয়ত এই মনস্বিনী মেয়েটির বুদ্ধির আলোকে সাফল্যের পথটিও চিনিয়া লইতে সমর্থ হইবে। তরলার এই ইঙ্গিতই তৎকালে নিবারণকে মায়ের সহিত বোঝাপড়া করিবার জন্য উৎসাহিত করিয়া তোলে এবং অভিমানিনী মাতা পুত্রের শোচনীয় ব্যর্থতার জন্য নিজেকেই অপরাধিনী সাব্যস্ত করিয়া তাঁহার যথাসর্বস্ব প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপ সমর্পণ করিতে বাধ্য হন। সে কথা আগেই বলা হইয়াছে।

কার্যোদ্ধারের পর মায়ের দানপত্র এবং সম্পত্তির হস্তবুদ তরলাকে দেখাইয়া নিবারণ যেদিন সহর্ষে বলিয়াছিল—জানেন, এর নিট মুনাফা বিশ হাজার টাকা, সাত বছরের মুনাফার টাকা মা'র নামে আলাদা জমা ছিল—সেটাও মা এই সঙ্গে আমাকে দিয়েছেন! এখন আমি স্থির করেছি, নদীর ধারে আমাদের যে বিখ্যাত বাগান-বাড়ী আছে, নাম—সরস্বতী-

কানন, ঐখানেই সেরেস্তা বসাব। আপনি কি বলেন?' তরলা জানায়—'আমার একটা কথা শোনেন তো বলি?' নিবারণ বলে—'আপনার বুদ্ধিতেই যখন চলতে হবে, শুনবো না মানে? বলুন আপনি।' তরলা তখন বলিতে থাকে—'দেখুন, বিশু ডাক্তারের পাল্লায় পড়ে সরস্বতী-কাননে একটা কেলেঙ্কারী কাণ্ড যখন বাধিয়েছিলেন, এখনই সেখানে কিছু করতে যাওয়া ঠিক নয়; বরং বাগুলীতে থেকেই আপনাকে কাজ করতে হবে।' ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া নিবারণ বলে—'ঐ বাড়ীতে থেকে?' তরলা জানায়—'না। এমন বাড়ী চাই, যার বার-মহলে আপনার সেরেস্তা আর থাকা চলবে, ভিতর মহলে আমাদের সমিতির কাজ হবে।' নিবারণ একটু উদ্বিগ্ন ভাবেই বলে—'সে তো খুব ভালো হয়, কিন্তু তেমন বাড়ী এখানে পাই কোথা?' মুখ টিপিয়া হাসিয়া তরলা বলে—'এই ত! জমিদার হোয়েও জমির সঙ্গে আপনাদের চেনা-শোনা নেই। রায় সাহেবের হাবেলীর কথা ভুলে গেলেন? খালি বাড়ী পড়ে আছে—ঐটে কিনে ফেলুন না?'

অন্ধকারের মধ্যে হঠাৎ কে যেন দপ্ করিয়া একটা আলো জ্বালিয়া দিল। নিবারণের মনে পড়িয়া গেল—বৎসর কয়েক পূর্বে কলিকাতা হইতে এক রায় সাহেব আসিয়া বাগুলীর কোন দায়গ্রস্ত অধিবাসীর বাস্তভিটা-সংলগ্ন প্রায় বারো বিঘা লাখরাজ জমি ক্রয় করেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই ক্রীত জমির উপর বাগুলীর জমিদার-বাড়ীর আদর্শে হাতাওয়ালা প্রকাণ্ড দেউড়ীযুক্ত এক বৃহৎ অট্টালিকা ফাঁদিয়া বসেন। নদীর দিকেও বহু বিস্তীর্ণ ভূভাগ বন্দোবস্ত করিয়া সেখানে একটা পাটের কল নির্মাণের পরিকল্পনা করিতে থাকেন। হরিনারায়ণ বাবু সে সময় সস্ত্রীক তীর্থভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন। ফিরিয়া আসিয়া দেখেন, খেতাবধারী এক দাম্ভিক শিল্পপতি তাঁহার বুকের উপর বাঁশগাড়ী চাপাইয়া বসিয়াছেন! অর্থাৎ তাঁহারই এলাকায় অন্যের লাখরাজ জমি হস্তগত করিয়া বহিরাগত এই মানুষটি

এমন এক ইমারত গাঁথিয়া তুলিতেছেন, যাহাতে তাঁহার মর্যাদা ক্ষুণ্ণ না হইয়া পারে না। তাহার পর যেই শুনিলেন, বাশুলীতে বিরাট প্রাসাদ তুলিয়া উক্ত রায় সাহেবটি সরস্বতী নদীর তীরবর্তী প্রায় দুই মাইল পরিমিত স্থান বন্দোবস্ত করিবার জন্য উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়াছেন, তখন তিনি রীতিমত গম্ভীর হইলেন। বহিরাগত ব্যক্তি তাঁহার এলাকায় আসিয়া বিপন্ন অধিবাসীর বাস্তুভূমি খরিদ করিতে কিরূপে সমর্থ হইল, তাঁহার সেরেস্তাই বা নীরবে তাহা কেমন করিয়া দেখিল, এই কৈফিয়ৎ যখন তিনি দেওয়ানজীর নিকট তলব করিলেন, তাঁহাকেও অপ্রস্তুতের একশেষ হইতে হইল। বস্তুত পক্ষে, ঐ চতুর রায় সাহেবটি চুপি-চুপিই বিক্রয়-কার্যটি শেষ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। রায় সাহেবের অট্টালিকার নির্মাণকার্য শেষ না হওয়া পর্যন্ত হরিনারায়ণ বাবু নীরব রহিলেন, বাহিরের কেহই এ সম্বন্ধে তাঁহার মনোভাব বুঝিতে পারিল না। ওদিকে রায় সাহেবও স্বীয় পদবী ও ঐশ্বর্যের অহঙ্কারে হরিনারায়ণ বাবুর দ্বারস্থ না হইয়া আইনসঙ্গত উপায়ে গবর্ণমেন্টের সাহায্যে নদীতীরবর্তী অঞ্চলটি কারখানার প্রয়োজনে ন্যায্য দরে ক্রয় করিয়া লইবার জন্য তদ্বির করিতে লাগিলেন। সবিশেষ জ্ঞাত হইয়া হরিনারায়ণ বাবু আরও গম্ভীর হইলেন।

এদিকে গৃহ নির্মাণের পর রায় সাহেব ঘটা করিয়া গৃহপ্রবেশের আয়োজন করিলেন। বহির্মহলের প্রাচীর-বেষ্টিত বৃহৎ প্রাঙ্গণে সারি সারি পটমণ্ডপ পড়িল। উৎসবের পূর্বদিন আমন্ত্রিত আত্মীয়-স্বজনের ভোজ ও রাত্রিবাসের জন্য। পরদিন ক্রিয়াকর্মাদির পর স্বদলবলে নবগৃহে প্রবেশ করিবেন। মধ্যাহ্নে তথায় বিরাট ভোজেরও ব্যবস্থা আছে। গৃহপ্রবেশের পূর্বদিন রাত্রির প্রথম প্রহরে—পটমণ্ডপের পাকশালায় পাচকগণ যখন রন্ধনে ব্যস্ত, অপ্রত্যাশিত ভাবে সমস্ত মণ্ডপ ব্যাপিয়া এমনই ভীষণ অগ্নিকাণ্ড সুরু হইল যে, ভৌতিক কাণ্ডের মত একটা দারুণ বিভীষিকার সৃষ্টি করিয়া আসন্ন উৎসবানন্দ পলকে পণ্ড করিয়া দিল। তরুণ দলের

তাসের আড্ডা, প্রবীণদের সতরঞ্চি খেলার আসর, গল্প-গুজব রত মহিলাদের মজলিস একসঙ্গে সব স্তব্ধ হইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে 'আগুন—আগুন' শব্দ তুলিয়া বহু লোক ধাইয়া আসিল ; কিন্তু জলের পরিবর্তে চারি দিক হইতে পুকুরের পচা পাঁক, ইট-পাথর, পূরীষাদি বৃষ্টিধারার মত পড়িতে লাগিল এবং সেই সঙ্গে অদৃশ্য কণ্ঠের একটা সতর্ক-বাণী স্তব্ধ-বিস্ময়ে সকলে শুনিতে পাইল, তাহার মর্ম হইতেছে—এই ব্রহ্মভিটার প্রতিষ্ঠাতার অতৃপ্ত আত্মা এখানে তাহার বংশধর ভিন্ন অন্য কাহাকেও তিষ্ঠাইতে দিবে না। এ ভিটায় দীপ জ্বলিবে না, যাগ-যজ্ঞ হইবে না, কেহ পাত পাড়িবে না, বাস করিবে না—সাবধান!

রায় সাহেব দারোয়ানদের ডাকিয়াও কোন সাড়া পাইলেন না—তাহারাও সন্ধ্যার পর দেউড়ীর ভিতরে চৌতারায় বসিয়া মহোল্লাসে সিদ্ধির ভাণ্ডারা খুলিয়া দিয়াছিল; দুর্ঘটনার পরে তাহাদিগকে জমিদার-বাড়ীর পাইকবর্গ বাড়ীর বাহিরে একটা ডোবা হইতে বেঁহুস ও বিশ্রী অবস্থায় উদ্ধার করিয়া আনে। পটমণ্ডপ হইতে তুমুল আর্তনাদ শুনিয়া বাশুলীর জমিদার সেরেস্তার কর্মচারীরা পাইক-বরকন্দাজদের লইয়া সাহায্যার্থ উপস্থিত হয়। তাহাদের চেষ্টায় অগ্নিকাণ্ড আয়ত্তে আসে ; কিন্তু রায় সাহেব ও তাঁহার পরিজনবর্গের মনোবল ভাঙ্গিয়া পড়ে। গ্রামবাসীরাও অকুস্থলে ছুটিয়া আসে। জনৈক প্রবীণ ব্যক্তি এই প্রসঙ্গে রায় সাহেবের হঠকারিতার নিন্দা করিয়া বলেন—'আপনার উচিত ছিল, এ ভিটে কেনবার আগে আমাদের জিজ্ঞাসা করা। আপনি টাকাগুলি জলে ফেলেছেন, আপনি তো এ ভিটেয় টিকতে পারবেনই না, সাধলেও কেউ এ বাড়ীতে মাথা গলাবে না।' দৈবজ্ঞের মত মর্মন্তুদ ভাষায় কথাগুলি শুনাইয়া তিনি যে ভীড়ের মধ্যে কোথায় মিশিয়া গেলেন, কেহ তাহা জানিতে পারিল না। দুর্ঘটনায় পাকশালা বিধ্বস্ত ও ভাণ্ডারজাত যাবতীয় বস্তু অব্যবহার্য হওয়ায় পটমণ্ডপ হইতে ভয়ার্ত সকলকেই সম্বর্ধনা

করিয়া জমিদার-বাড়ীতে লইয়া যাওয়া হয় এবং ভুরিভোজের পর সেখানেই বিশিষ্ট ও সুষ্ঠু ভাবে রাত্রিবাসের সুব্যবস্থা বিপন্ন উদ্বাস্তুদিগকে চমৎকৃত করে। পরদিনই রায় সাহেব সহৃদয় হরিনারায়ণ বাবুকে ধন্যবাদ দিয়া সেই যে বাশুলী হইতে বিদায় লইয়া চলিয়া যান, তাহার পর কোন দিন তাঁহাকে বাশুলীর পরিত্যক্ত বাটীতে প্রত্যাবর্তন করিতে বা পূর্ব-পরিকল্পিত জুটমিল সম্পর্কে নদীতীরবর্তী অঞ্চলগুলি ক্রয় করিবার জন্য উদ্যোগী হইতে দেখা যায় নাই। পূর্বোক্ত দুর্ঘটনার পর কলিকাতায় গিয়া রায় সাহেব হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হইয়া যে শয্যায় শয়ন করেন আর তাঁহাকে জীবিতাবস্থায় সে শয্যা ত্যাগ করিতে হয় নাই—দীর্ঘ ছয় মাস কাল একাদিক্রমে যন্ত্রণাদায়ক রোগভোগের পর তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন এবং তৎপূর্বে পরিজনবর্গকে নিষেধ করিয়া যান যে, বাশুলীর সেই অভিশপ্ত বাড়ীতে তাঁহার বংশের কেহ যেন কখনও বসবাস করিবার সঙ্কল্প পোষণ না করে। সুতরাং তদবধি উক্ত সুবৃহৎ অট্টালিকা সেই ভাবেই তালাবদ্ধ অবস্থায় পড়িয়া থাকে; পল্লীর অতি বড় সাহসী লোকেরাও রায় সাহেবের এই ভূতুড়ে হাবেলীর ত্রিসীমায় যাইতে ভরসা করে না।

তরলা-কথিত 'রায় সাহেবের হাবেলী' নামক বাড়ীর ইহাই মোটামুটি ইতিহাস এবং এই নামটি শুনিবা মাত্রই নিবারণের স্মৃতিপথে অতীতের উক্ত রহস্যময় কাহিনী সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। অতঃপর তরলার দিকে চাহিয়া বিস্ময়ের সুরে সে প্রশ্ন করে—'সেই ভূতুড়ে বাড়ীর কথা বলছেন?' তরলা কলকণ্ঠে উত্তর দেয়—'ভূত তো আপনারাই, ভয়ের কি আছে?' সবিস্ময়ে নিবারণ পুনরায় জিজ্ঞাসা করে—'এ কথার মানে?' তরলাও তেমনিই সপ্রতিভ কণ্ঠে উত্তর দেয়—'মানেটা কি এত দিনেও আপনি ভেবে ঠিক করতে পারেন নি? আমার কাছে কিন্তু জলের মত সোজা হয়ে গেছে নিবারণবাবু!'

—কি রকম?

—রকমটা হোচ্ছে অবাস্তবের জঞ্জাল থেকে বাস্তব তথ্যটি খুঁজে বার করা।

অবাক হইয়া তরলার মুখের পানে চাহিয়া থাকে নিবারণ। তরলা এক ঝলক হাসিয়া বলিতে থাকে—'দেখুন, ইদানীং মানুষ পড়াও আমার একটা সাধনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কাজেই, অনেককেই পড়তে হয় আমাকে, সে পড়ায় সাহায্য করে ঘটনা। ঐ ভূতুড়ে হাবেলীর গল্প শুনে শুনে আমার মনে কত যে প্রশ্ন উঠেছে কি বলব! ওর মধ্যে কিন্তু বড় হয়ে উঠেছেন আপনার বাবা। আমি ইদানীং ওঁকেই ভালো করে পড়বার চেষ্টা করছি; আশ্চর্য্য, ছেলে হোয়েও আপনি যেটা উপেক্ষা করে গেছেন। কিন্তু আপনার বৌ-ঠাকরুণ পরের মেয়ে হোয়েও সেটা ধরে রেখেছেন বলেই বরাবর জিতে চলেছেন; নৈলে তিনি এত সহজে তাঁর কাছ থেকে চাবিকাঠিটি হাতাতে পারতেন না! তবে ঐটি হাতে পেয়ে নিশ্চিন্ত আছেন বলেই, আমার পড়া বিদ্যাটি এই ফুরসদে কাজে লাগাতে চাইছি। আমি আপনার বাবাকে ভালো করে পড়তে পেরেছি বলেই জলের মতন বুঝেছি যে, ও-বাড়ীর ঐ ভূতুড়ে কাণ্ডটি ওঁরই পাকা মাথার পরিকল্পনা, আর এ শুধু ওঁর পক্ষেই সম্ভব।'

স্তব্ধ ভাবে নিবারণ কথাগুলি ভাবিতে থাকে; কিছুক্ষণ পরে উৎসাহের ভঙ্গিতে বলে—'সত্যিই আপনি অদ্ভুত মেয়ে—আমাদের নতুন বৌ-এর সঙ্গে আপনিই ঠিক পাল্লা দিতে পারবেন। এখন আপনার কি মতলব বলুন তো?'

তরলা বলিতে থাকে—'কলকাতায় গিয়ে রায় সাহেবের ওয়ারিসানদের কাছ থেকে বাড়ীখানা আগে কিনে ফেলুন। রায় সাহেব এক দিন ঐ বাড়ীতে বসে বাগুলীর জমিদার বাবুদের সঙ্গে রেসারেসি চালাবেন ভেবেছিলেন। মাথাটা তিনি খেলিয়ে ছিলেন ভালো। একটা মিল খুলতে পারলে হাজার হাজার লোক তাঁর তাঁবেয় থাকবে—জমিদারকে তিনি

তুড়িতে উড়িয়ে দেবেন। কিন্তু মিল খোলবার আগেই এই বাড়ী ফেঁদে জমিদারবাবুদের বুকের ওপর বাঁশগাড়ী চাপিয়েছিলেন! তাই বুদ্ধিমান জমিদার বুদ্ধির বড়ে টিপে তাঁকে মাত করে দিতে পেরেছিলেন। এখন বুঝছি, আমাদের কাজের সুবিধের জন্যেই এ কাণ্ড হয়েছিল। আপনি ঐ বাড়ীর বার-মহলে জেঁকে বসুন সেই রায় সাহেবের মতলব নিয়ে; আপনার পিছনে থাকবে সরস্বতী পরগণার তালুক! বাশুলীর বুকের ওপর সদর সেরেস্তা বসিয়ে এখান থেকেই জমিদারী চালাতে থাকুন ওদের ওপর টক্কর দিয়ে। আর ঐ বাড়ীর ভিতর-মহলটা দিন আমাকে ছেড়ে—আমি ওখানে 'নারী-প্রগতি সমিতি' বসিয়ে বিদ্যাভারতীর সঙ্গে জেদের লড়াই চালাতে থাকি। বলুন, ব্যবস্থা কেমন লাগছে? মনে ধরছে?'

নিবারণ আনন্দে অভিভূত হইয়া তরলার বুদ্ধিদীপ্ত যুক্তির প্রশংসা করিতে থাকে এবং পরদিনই কলিকাতায় চলিয়া যায়। ফলে, লক্ষাধিক টাকায় নির্মিত বাড়ী ও সংলগ্ন সুবিস্তীর্ণ ক্রীত জমি মাত্র কয়েক সহস্র টাকায় রায় সাহেবের ওয়ারিসানের নিকট হইতে ক্রয় করা হয়। এই ব্যাপারেও তরলার যুক্তি নিবারণের উদ্দেশ্যসিদ্ধির পক্ষে বিশেষ সহায়তা করে। বিক্রেতা পক্ষকে জানানো হয় যে, একটি দাতব্য প্রতিষ্ঠানের জন্যই উক্ত অপবাদগ্রস্ত বাড়ীটি ক্রয় করা হইতেছে—বসবাসের জন্য নহে; কারণ, ঐ বাড়ীর ত্রিসীমাতেও কেহই যাইতে চাহে না ইত্যাদি। বাড়ী ক্রীত হইলে নিবারণ তরলার পত্র লইয়া শোভাবাজার অঞ্চলের নারী-প্রগতি সমিতির কর্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করে। স্বামী-পরিত্যক্তা এবং বিবাহে অনিচ্ছুক কুমারীদিগকে স্বাবলম্বী করিবার উদ্দেশ্যে তিনি একটি প্রতিষ্ঠান খুলিয়া কয়েক বৎসর ধরিয়া কাজ চালাইয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু উপযুক্ত স্থান ও অর্থাভাবে প্রতিষ্ঠানটি বিশেষ প্রতিষ্ঠাপন্ন হইবার অবকাশ পায় নাই। তরলা এই সমিতির সভানেত্রী এবং নিয়মিতরূপে মাসিক চাঁদা দিয়া থাকে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানের কর্ত্রী শ্রীমতী সুপ্রভা সেনকে এই মর্মে অনুরোধ

করা হয় যে, তিনি কলকাতার বাড়ীতে প্রতিষ্ঠানের সামান্য একটু অংশ রাখিয়া বাকি সমস্ত সভ্যদের লইয়া যদি বাগুলীর প্রতিষ্ঠানে চলিয়া আসেন, ব্যয়ের জন্য ভাবিতে হইবে না, বরং সেখানকার প্রাসাদতুল্য বৃহৎ বাড়ীতে কাজের বহু সুবিধাই হইবে। এই উদ্দেশ্যেই কলিকাতার প্রতিষ্ঠানের নামের সহিত এখানকার প্রতিষ্ঠানের নামকরণের কোন পার্থক্য রাখা হয় নাই। তরলার প্রস্তাবে সুপ্রভা সানন্দে সাড়া দেয় এবং তাহার শোভাবাজারের ক্ষুদ্র বাড়ীতে সমিতির অংশ-বিশেষ রাখিয়া বাগুলীতে আসিতে সম্মতি দান করে।

ইহার পর জঙ্গলাকীর্ণ বাড়ী ও বাগানগুলির সংস্কারাদি শেষ করিয়া বাহির-মহলে সরস্বতী মহালের সেরেস্তা, নিবারণের জন্য সুসজ্জিত স্বতন্ত্র বাসস্থান এবং অন্য দিকে নারী-প্রগতি সমিতির মেয়েদের জন্য বিভিন্ন বিভাগগুলির অঙ্গসজ্জা ও বিধি-ব্যবস্থা করিতে একটি মাস কাটিয়া যায়।

সংস্কার কালে বাগুলীর অধিবাসীরা অবাক বিস্ময়ে চাহিয়া থাকে; এই সূত্রে নানা প্রশ্নও উঠে—রায় সাহেবের উত্তরাধিকারীদের পুনরায় এই দুর্বুদ্ধি হইল কেন? কিন্তু ক্রমে আসল কথাটা রাষ্ট হইয়া পড়িলে তাহাও সকলকে বিস্ময়াপন্ন করিয়া তোলে। অবশেষে সকলেই জানিতে পারে যে, নিবারণবাবু তাঁহার মাতৃদত্ত সরস্বতী মহালের একমাত্র মালিক হইয়া এই ভূতুড়ে হাবেলীর একাংশে তাঁহার তালুকের সেরেস্তা বসাইতেছেন এবং বৈদ্যনাথ কবিরাজের কন্যা তরলার কর্ত্রীত্বে নারী-প্রগতি সমিতি কায়েম হইয়া বসিতেছে।

নির্দিষ্ট দিনে খুব ঘটা করিয়া নিবারণ সুসংস্কৃত বাড়ীতে তাহার তালুকের নূতন সেরেস্তার প্রতিষ্ঠা ও পুণ্যাহ উৎসবের আয়োজন করিল। সঙ্গে সঙ্গে ঐ দিনই বাড়ীর অপরাংশে নারী-প্রগতি সমিতির উদ্বোধন দিবস নির্ধারিত হইল। একই দিনে প্রায় একই স্থানে দুইটি প্রতিষ্ঠানের উৎসব ধার্য হইলেও সময়ের দিক দিয়া কিছুটা পার্থক্য রহিল। নিবারণ

তাহার সেরেস্তার পত্তন ও পুণ্যাহ উৎসবের কাল পূর্বাহ্নের দিকে নির্দিষ্ট করিল, পক্ষান্তরে তরলার বিজ্ঞপ্তি পত্রে প্রকাশ পাইল যে, নারী-প্রগতি সমিতির উদ্বোধন উৎসব আরম্ভ হইবে অপরাহ্ণ পাঁচটায়।

স্বামী-সম্পর্কে তরলার দুরদৃষ্টের কথা বাগুলীর বাসিন্দাদের অজ্ঞাত থাকে নাই। এই অসামান্য রূপবতী ও বিদুষী মেয়েটির তরুণ বয়সে এরূপ ভাগ্য-বিপর্যয় বাগুলীর মত পল্লী-সমাজে একটা মর্মান্তিক দুর্ঘটনারূপেই প্রতীয়মান হইয়াছিল। বিশিষ্ট মণ্ডল তাহার শ্বশুরের সহানুভূতিমূলক আহ্বান-পত্র এবং তৎসম্পর্কে গাঙ্গুলী-বাড়ীর নূতন বধূর যুক্তি ও তাহার সহিত তরলার মতানৈক্যের কথাও অল্পবিস্তর জ্ঞাত ছিলেন। তাঁহারা কেহই তরলার মতবাদের উপর আস্থা স্থাপন করিতে পারেন নাই, বরং তিক্ত কণ্ঠে তীব্র ভাবে নিন্দাই করিয়াছেন। কিন্তু পক্ষান্তরে এই মেয়েটিই যে নিবারণের সহিত মিশিয়া তাহাকে নিজের মতবাদে আস্থাশীল করিয়া তলে তলে একটা সমিতি খুলিবার ব্যবস্থা স্থির করিয়া ফেলিয়াছে এবং একই দিনে একই বাড়ীতে নিবারণের নবলব্ধ তালুকের পুণ্যাহ উৎসবের সহিত তাহার সর্বনাশা সমিতির উদ্বোধন উৎসবও অনুষ্ঠিত হইতে চলিয়াছে—বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পূর্বে ঘুণাক্ষরেও কেহ এ-সব কথা জানিতে পারে নাই। এমন কি, প্রায় প্রত্যহ দিবাভাগের এক নির্দিষ্ট প্রহরে বৈদ্যনাথ কবিরাজের বহির্বাটির রুদ্ধ কক্ষে অত্যন্ত সন্তর্পণে ও সতর্কতা সহকারে ইহাদের আলোচনা বাড়ীর জনপ্রাণীও জানিবার সুযোগ পায় নাই।

কলিকাতায় কাজ গুছাইয়া নিবারণের বাগুলীতে প্রত্যাবর্তনের পর রীতিমত তোড়জোড় করিয়া কুখ্যাত পোড়ো বাড়ীটির সংস্কার কার্য আরম্ভ হইলে, তরলা এক দিন হঠাৎ অসঙ্কোচে পিতৃ-সমক্ষে তাহার সঙ্কল্পের কথা উত্থাপিত করে। কন্যা যে শ্বশুরালয়ে যাইতে সম্মত নহে—সহৃদয় শ্বশুরের সমীচীন প্রস্তাব তাহার অন্তর স্পর্শ করে নাই, ইহা তিনি জ্ঞাত ছিলেন। কিন্তু গাঙ্গুলী-বাড়ীর বধূরাণীর যুক্তিও সে অগ্রাহ্য করিয়াছে

শুনিয়া তিনি এতই ব্যথা পাইয়াছিলেন যে, এ সম্পর্কে কন্যার সহিত আলোচনা করাও সঙ্গত মনে করেন নাই। এক্ষণে সেই কন্যা স্বাধীনভাবে 'নারী-প্রগতি সমিতি'র সহিত যোগ দিবার ব্যবস্থা পাকা করিয়া, নিয়ম রক্ষার মতই তাহার ইচ্ছাটি জানাইলে অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত ভাবেই তিনি শুধু জিজ্ঞাসা করেন—'কাজটা কি ভালো হবে মা ?'

দিব্য সহজ কণ্ঠেই তরলা উত্তর করে—'উপস্থিত আমি যে অবস্থায় পড়েছি, এর চেয়ে ভালো কাজ আমার পক্ষে আর কিছু আছে বলে তো জানা নেই বাবা !'

অসহিষ্ণু ভাবে পিতা বলেন—'জানা নেই—এ কথা বোল না, ভালো যুক্তিই গাঙ্গুলী-বাড়ীর বৌমা তোমাকে দিয়েছিলেন, কিন্তু তুমি সে সব পছন্দ করনি।'

গাঙ্গুলী-বাড়ীর বধূর কথা শুনিয়াই তরলার মুখখানি কঠিন হইয়া উঠে, তিক্ত স্বরে সে প্রতিবাদ করে—'একটা চলিত কথা আছে বাবা—যার কাজ তার সাজে, অন্য লোকে লাঠি বাজে! ওঁর পক্ষে যেটা ভালো, আমাকেও যে তাই মেনে নিতে হবে, তার কোন মানে নেই। আমারো বুদ্ধি আছে, বিচার করেই আমি কাজ করি।'

ক্ষুব্ধ কণ্ঠে পিতা বলেন—'বুদ্ধি থাকলে তুমি শ্বশুরের ডাকে সাড়া না দিয়ে এ ভাবে স্বেচ্ছাচারিণী হতে না মা !'

পিতার কথায় কন্যার দুই চক্ষু বুঝি জ্বলিয়া উঠে, সবলে আপনাকে সামলাইয়া কণ্ঠস্বর যথাসাধ্য সংযত করিয়া উত্তর দেয়—'আমি মেয়ে বলেই এ কথা আপনি বলতে পারলেন বাবা ! যদি আমার কোন ভাই, এমনি একটা সমিতি খুলে তাই নিয়ে মাতামাতি করতেন, কোন দোষ তাঁর হোত না ; যোগ দেবার আগে তিনি হয়তো আপনার অনুমতি নেওয়াও দরকার মনে করতেন না। আমি আপনার অনুমতি চাইছি, এই আমার অপরাধ হয়েছে—যেহেতু আমি মেয়ে।'

অন্তর্নিহিত বিরক্ত ভাব এবার মুখে ফুটাইয়া পিতা বলেন—'এটা হোচ্ছে তোমার দায়ে পড়ে লৌকিকতা করা! এখানে সমিতি খোলা হেচ্ছে—তোমার মতলবেই, তার সব-কিছু কাজ এগিয়ে গেছে, তুমি তাতে মাথা দেবেই। এখন না জানালে নয়—তাই চক্ষুলজ্জার খাতিরে আমার মত নিতে এসেছ। আমি জানি, আমার মত না পেলেও তুমি যাবেই, আমার তোয়াক্কাই রাখবে না; তবে আর আমাকে জিজ্ঞাসা করা কেন? তোমার যা-খুসি তাই কর।'

নিবদ্ধ দৃষ্টিতে ক্ষণকাল পিতার মুখের দিকে চাহিয়া থাকে তরলা, তাহার পর স্থির অথচ দৃঢ় স্বরে বলে—'তাহলে আজই আমাদের বোঝা-পড়া হোয়ে যাওয়াই আমি ভালো মনে করি বাবা! আমার পক্ষে এখন দু'টো পথ আছে। একটা হোচ্ছে—এ-বাড়ীতে থেকেই সমিতির কাজ করে যাওয়া। আর এ-ও বলি—আমি যে কাজ করবো, তাতে মেয়েদের ভুল ভেঙে দিয়ে জাগিয়ে তোলা ছাড়া এমন কিছু থাকবে না, যাতে আপনার মাথা নিচু হবে। আমার লক্ষ্য শুধু মেয়েদের বড় করে তোলা; কাজেই নিজে কখন ছোট হব না—এ আপনি স্থির জানবেন। এর পর—অন্য পথ হোচ্ছে, আমার কাজে আপনার আপত্তি থাকলে, বাধ্য হয়েই আমাকে এ বাড়ী ছেড়ে সমিতির বাড়ীতেই আশ্রয় নিতে হবে। এখন আপনিই বলুন আমি কি করব?'

ক্ষণকাল চিন্তার পর পিতা তাঁহার সিদ্ধান্ত জানাইয়া দেন কন্যাকে—'তুমি বাড়ীতে থেকেই সমিতির কাজ কর মা, তাতে আমরা তোমাকে বাধা দেব না।'

তরলা তৎক্ষণাৎ হেঁট হইয়া পিতাকে গড় করিতে করিতে গাঢ় স্বরে বলে—'আমিও আপনার পা ছুঁয়ে বলছি বাবা, আপনার নামে, বাড়ীর নামে, বংশের নামে দাগ পড়ে, এমন কোন অন্যায় আমি করব না কোন দিন।'

এইগুলিই হইল, সাম্প্রতিক ঘটনারাজির পরিবেশে বাঙালীর জনসাধারণের মানসিক চাঞ্চল্যের মোটামুটি উপাখ্যান।

কুড়ি

উক্ত উৎসবের কয়েকদিন পূর্ব্বে গোবিন্দনারায়ণের মহলের সেই সুসজ্জিত দালানে 'বিদ্যাভারতী-শিক্ষা-প্রসার-প্রতিষ্ঠানে'র এক বৈঠক আহূত হওয়ায়, কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্যগণ সকলেই উপস্থিত হইয়াছেন। বধূরাণী চণ্ডীকে সম্বর্ধনা করিবার সময় 'বিদ্যাভারতী' উপাধি প্রদত্ত হইয়াছিল। পাঠাগারের সভায় তাঁহারই পরিকল্পিত শিক্ষা-প্রসার প্রস্তাবকে উপলক্ষ করিয়া যখন প্রতিষ্ঠান গঠনের কাজ আরম্ভ হয়, সদস্যগণ নামকরণ সম্পর্কে একবাক্যে বিদ্যাভারতী নামটি রাখিবার প্রস্তাব করেন। বিদ্যাভারতীর একান্ত আপত্তি সত্ত্বেও সদস্যগণের সমবেত নির্বন্ধাতিশয্যে তাহা গৃহীত হয়। সুতরাং সেই নামেই প্রতিষ্ঠানের কাজ চলিতেছে।

পণ্ডিত হৃষীকেশ শাস্ত্রীকে সভাপতি করিয়া প্রতিষ্ঠানের কার্যনির্বাহক সমিতি গঠিত হইয়াছে। ডাঃ রায় ও রাজীব যুগ্ম সম্পাদকরূপে কাজ করিতেছে। সদস্যদের মধ্যে রাধানাথ বাপুলী, গোবিন্দনারায়ণ, বিদ্যাভারতী ও গৌরীদেবী—উপস্থিত এই কয়জনের নাম দেখা যায়। এদিনের বৈঠকে গৌরীদেবীর যোগ দিবার কথা। তাহাকে আনিবার জন্য শ্যামাপুরে গাড়ী পাঠানো হইয়াছে। গৌরীদেবী ব্যতীত সকলেই উপস্থিত—সে আনিলেই সভার কাজ আরম্ভ হইবে।

সকালের দিকেই বৈঠক বসিয়াছে। বৈঠকের পর এখানেই মধ্যাহ্ন ভোজনের ব্যবস্থা হইয়াছে। বিদ্যাভারতীর সাগ্রহ অনুরোধে বাহিরের সকলেই সম্মতি দিয়াছেন। এখানে আসিবার পর প্রত্যেককেই প্রাতরাশেও পরিতৃপ্ত করা হইয়াছে।

কথা হইতেছিল নিবারণের পুণ্যাহ উৎসব এবং তরলার নারী-প্রগতি সমিতি লইয়া। শাস্ত্রী মহাশয় বলিতেছিলেন: রায় সাহেব গোড়াতেই ভুল করেছিলেন। জমিদারদের উপর তাঁর একটা বিদ্বেষ ছিল বলেই তিনি হরিনারায়ণ বাবুর মতন জমিদারের বুকে বসে দাড়ি উপড়াবার মতলব করেছিলেন। শিল্পপতিরা যে ভূমিপতিদের চেয়ে করিতকর্মা আর চালিয়াৎ লোক, সেটা হাতে কলমে দেখাতে চেয়েছিলেন। চুপি চুপি জমিদারের এলাকাতেই বহু লাখরাজ জমি কিনে ফেললেন—জমিদারের সেরেস্তায় খাজনা দিতে হবে না, রাজা-প্রজা সম্বন্ধ থাকবে না—এই ভেবে। ইমারতও ফাঁদলেন জমিদার-বাড়ীর ওপর টেক্কা দিয়ে। জমিদার-বাড়ীর দেউড়ীর মাথায় দুদিকে দুটো সিংহ, ওনার দেউড়ীতে বসালেন এক জোড়া বাঘ। তারপর নদীর কিনারার দিকে যে-অঞ্চলটা অন্য তালুকের এলাকায় পড়ে এবং সেই তালুকটি নদীর ওপারে, উনি তাড়াতাড়ি সেই অঞ্চলেই মিল বসাবেন বলে গবরমেণ্টকে ধরে য়্যাকুইজিসানের ফন্দী আঁটলেন। করলেন সব, কিন্তু হয়ে দাঁড়ালো সেই বজ্র আঁটুনির ফস্কা গেরোর মতন। জলে বাস করতে নেমে কুমীরকেই কলা দেখাতে গেলেন। সবাই জানে, হরিনারায়ণ বাবুর ধনুর্ভঙ্গ পণ—এ অঞ্চলে জুটমিল বসাতে দেবেন না। রায় সাহেবও জেদ ধরলেন—মিল বসিয়ে তবে ছাড়বেন। ওপরে বসে বিধাতাপুরুষও হেসেছিলেন নিশ্চয়ই! তার ফল হলো কি—শেষে টাকি পর্যন্ত বিসর্জন হোয়ে গেল। ভূতেই কাণ্ডটা করুক বা রায় সাহেবের দুরদৃষ্টেই সব তছনছ হোক, কেউ কিন্তু বলতে পারবে না যে, হরিনারায়ণ বাবুই ও-সব করিয়েছিলেন। এ ব্যাপারে কেউ তাঁকে না রাম, না গঙ্গা—কিছুই বলতে শোনেনি। এমন কি, তাঁরই সেরেস্তার কর্মচারী আর পাইক-বরকন্দাজরা হামৃরাই হোয়ে পড়ে রায় সাহেবদের উদ্ধার না করলে হয়ত প্রাণেই বাঁচতেন না কেউ। তার পর হলো কিনা—সুদিনে যে জমিদার-

বাড়ীর ত্রিসীমায়ও যাননি রায় সাহেব, দুর্দিনে সেখানেই পাত পাড়তে হলো তাঁকে, দুর্যোগের সে রাতটা সেখানেই কাটালেন! এই জন্যেই জ্ঞানী ব্যক্তিরা বলেন, দম্ভ করে কিম্বা কারুর ওপর টেক্কা দিয়ে কোন বড় কাজের পরিকল্পনা করতে নেই।

বাপুলী মহাশয় এই প্রসঙ্গে সহাস্যে বলিলেন: আসলে রায় সাহেব হরিনারায়ণ বাবুর চোখ দুটোই খুলে দিয়ে গেলেন। তিনি যে সময় মিল বসাবার জন্যে গ্রামকে গ্রাম সরকারের সাহায্যে য়্যাকুইজিসান করবার ফন্দী আঁটছিলেন, হরিনারায়ণ বাবু সেই ফাঁকে সমস্ত তালুকটাই রাণীর নামে কিনে ফেললেন চুপি চুপি। তাই ত আজ সরস্বতী নদীর ওপারের সরস্বতী পরগণাও আমাদের ষ্টেটের সামিল হয়েছে। সেই থেকেই ত তালুকের মধ্যে ঢালাও হুকুম দেওয়া হয়—এখন থেকে লাখরাজ জমি ষ্টেটকে না জানিয়ে কেউ যেন বিক্রী না করে।

শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন: সেই জন্যেই ত রায় সাহেবের ঐ হাবেলী পড়ে থাকা সত্ত্বেও কেউ কিনতে বা বন্দোবস্ত করতে ভরসা করেনি—পাছে হরিনারায়ণ বাবুর কোপে পড়তে হয় এই ভয়ে। ওখানে বাস করতে যাওয়া মানেই ঘুমন্ত সিংহকে জাগিয়ে দেওয়া। নিবারণবাবু হোচ্ছেন ছেলে—ওঁর কথা আলাদা। মায়ের তালুক পেয়ে ওখানেই উনি তালুকের কাছারী বসিয়ে বাহাদুরী দেখালেন—এ যেন হলো সেই বিষস্য বিষমৌষধম্।

বাপুলী মহাশয় হাসিতে হাসিতে বলিলেন: তা বটে! তবে কি জানেন শাস্ত্রী মশাই, বিষ বস্তুটা বড়ই বিশ্রী—যদি গেঁজে ওঠে, তখন সে বিষ কণ্ঠে ধারণ করে কে যে নীলকণ্ঠ হবেন—সেও এক সমস্যা! জানেন ত, সমুদ্র মন্থনে বিষও উঠেছিল, আবার অপ্সরী উর্বশীও উঠেছিল; সেই সঙ্গে লক্ষ্মী যদি না উঠতেন, আর হরি-হর না থাকতেন, তাহলে সেই দিনই সব ধ্বংস হয়ে যেত!

শাস্ত্রী মহাশয় সহাস্যে কহিলেন: তা, এখানেও হরিনারায়ণ আছেন, ভয়ের কিছু নেই—শেষ রক্ষা তিনিই করবেন। এদিকেও আছেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মী আর গোবিন্দ, অতএব মাভৈঃ।...কথাগুলি বলিতে বলিতে শাস্ত্রী মহাশয় চণ্ডী ও গোবিন্দের দিকে চাহিলেন।

বাপুলী মহাশয় এবার একটু গম্ভীর হইয়া বলিলেন: আপনি ত সবই জানেন শাস্ত্রী মশাই, চণ্ডীমার আগ্রহে আমরা যে প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তুলছি, এর মধ্যে কোন ফাঁক নেই। ঐ যে রায় সাহেবের কথা বললেন—তাঁর মত কোন একটা লোক-দেখানো ভণ্ডামীও এতে নেই; শিক্ষা আর স্বাস্থ্য—এই দুটিই এখন পল্লী অঞ্চলে প্রয়োজন, তারই জন্যে যথাসাধ্য আয়োজন আরম্ভ করা গেছে। আমরা কিন্তু ভাবতে পারিনি যে, কারুর সঙ্গে টক্কর দিয়ে আমাদের কাজ করতে হবে, কিম্বা আর কেউ আমাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে এগিয়ে আসবে। কিন্তু ছোটবাবুর সেরেস্তা, আর বৈদ্যনাথবাবুর মেয়ে তরলার ঐ সমিতি—সেদিনের কুখ্যাত একই বাড়ীতে খোলা হোচ্ছে শুনে সত্যিই কিছুটা উদ্বিগ্ন হোতে হয়েছে।

চণ্ডীর দিকে চাহিয়া শাস্ত্রী মহাশয় সহসা প্রশ্ন করিলেন: মা বিদ্যা-ভারতীও কি উদ্বিগ্ন হয়েছেন?

চণ্ডী এতক্ষণ নীরবেই দুই শ্রদ্ধাভাজন প্রবীণের সংলাপ শুনিতেছিল; কথা প্রসঙ্গে শাস্ত্রী মহাশয় এমন প্রশ্ন তাহাকে করিয়া বসিলেন যে, আর তাহার পক্ষে নীরব থাকা চলে না, এবং এস্থলে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হইতে চলিয়াছে, ইহাতে তাহার কি অভিমত—তাহা জানিবার জন্য সংশ্লিষ্ট মহলের কৌতূহলও স্বাভাবিক।

আস্তে আস্তে ধীরকণ্ঠে চণ্ডী শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রশ্নের উত্তর দিল: আমার কথা যদি বলেন পণ্ডিত মশাই, তাহলে আমি বলব—ঠাকুরপোর সাহস দেখে আমি খুসীই হয়েছি। কুসংস্কার ও গুজোব আমাদের মন অনেক সময় দুর্বল করে দেয়, আমরা এগিয়ে যেতে ভয় পাই। এই

বংশের প্রতিষ্ঠাকে খাটো করবার জন্যে যে-বাড়ীখানা একদিন খাড়া করা হয়েছিল, তার দরজা আর খোলা হয়নি বলেই চুপ করে না থেকে ঠাকুরপো যে ঐ বাড়ীতেই জেঁকে বসছেন, এতে উনি বংশের মুখরক্ষাই করছেন। এ বয়সে নিষ্কর্মা হয়ে বসে থাকা মানেই মনকে ছোট করা—যত সব কুচিন্তাকে মনের মধ্যে ঠাঁই দেওয়া। ওঁর যে রকম স্বভাব, মনের মত লোকের মতলব হয়ত নেবেন, কিন্তু কারুর কথামত বা হুকুম মেনে চলবার পাত্রই উনি নন। মায়ের চেয়ে ছেলেকে বেশী কে চিনবে বলুন! ওঁর প্রকৃতি জেনেই মা ওঁকে আলাদা একটা গদীতে বসিয়ে দিয়ে ভালোই করেছেন। এতে যদি মনে ওঁর রেসারেসির ভাব জেগেও ওঠে, সেও আমি ভালো মনে করি। স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন—চুপ করে মনমরা হয়ে বসে থাকার চেয়ে ডাকাতি করাও ভালো! বাইবেলে আছে—সয়তান নিষ্কর্মাদের খুঁজে বেড়ায়। তাই বলি, ঘরে নিষ্কর্মা হোয়ে বসে থেকে হিংসাপনা বা কুজড়োমিপনা না করে ঠাকুরপো যদি দুঁদেডানপিটে দুর্দান্ত হোয়ে ওঠেন, সেও ঢের ভালো।

বাপুলী মহাশয় বলিলেন: শুনলেন ত শাস্ত্রী মশাই চণ্ডীমার কথা! আমরা হয়ত এই নিয়ে খারাপ কিছু হতে পারে ভেবে মনে মনে উদ্বিগ্ন হচ্ছিলাম, আর উনি কিনা খপ করে বলে ফেললেন—এতে খুসীই হোয়েছেন, ওঁর ঠাকুরপো যা চান, তাই পেয়েছেন—এতে ভয় পাবার কিছু নেই।

শাস্ত্রী মহাশয় পুনরায় প্রশ্ন করিলেন: না হয়, তোমার কথাই মেনে নিলাম মা, নিবারণবাবু বিষয় পেয়ে ঐ পোড়ো বাড়ীতে জমকে বসে ভালোই করেছেন। কিন্তু বদ্যিনাথের মেয়ে? ওর সম্বন্ধে তোমার কি ধারণা বল ত মা? ও যে তোমার ওপর টেক্কা দিয়ে একটা সমিতি গড়েছে, শুনছি নাকি কলকাতা থেকে কতকগুলো ধিঙ্গী মেয়ে নিয়ে এসেছে—তারা হয় ত লেকচার দিয়ে গ্রামের মেয়েদের বিগড়ে দেবে!

এতে তুমি কি বলতে চাও শুনি, কি তোমার মত মা? ওদের এই আন্দোলন কি তুমি নীরবে সমর্থন করবে?

তেমনি ধীরভাবেই চণ্ডী উত্তর করিল: আমি এই জানি পণ্ডিত মশাই, আন্দোলন বলতে বোঝায়—চেতনা। মানুষ যখন কোন বিষয় খুব ভালো করে বুঝে নিজেকেও তার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারে, তখন তার মনে এই সাধ হয় যে, সেটা সবাইকে বুঝিয়ে দিয়ে অবস্থার পরিবর্তন করবে—তখনই তার মনে চেতনা আসে। এই চেতনাই তাকে আন্দোলনে মাতায়, আর সে-আন্দোলন সার্থক হোতে বাধ্য। এখন দেখতে হবে পণ্ডিত মশাই, যে বিষয় নিয়ে তরলা আন্দোলন চালাতে চাইছেন, সে সম্বন্ধে তাঁর মনে ঠিক মত চেতনা এসেছে কিনা? আমি ওঁর সঙ্গে আলাপ করে এইটুকু বুঝতে পেরেছি—রান্না-বান্না আর ঘর-কন্না ছাড়াও মেয়েদের যে আরো কিছু করবার আছে, এ-চেতনা সত্যিই ওঁর মধ্যে এসেছে। সেই জন্যেই ওঁকে পেয়ে আমি আশা করেছিলাম, এ অঞ্চলের মেয়েদের মধ্যেও আস্তে আস্তে উনি এ-চেতনা জাগাতে পারবেন; তাদের বোঝাবেন যে, রান্না-বান্না আর ঘর-কন্না করতে করতেই আরো অনেক কিছু কাজ করতে পারা যায়। তাতেও জ্ঞান বাড়বে, অনেক জানা শোনা হবে, অথচ সংসারের কোন ক্ষতি হবে না। এর বেশী কিছু ওঁর কাছে প্রত্যাশা আমি করিনি। কিন্তু উনি গোড়াতেই সমাজ-সংস্কার করতে মেতে উঠেছেন! এ তো আলাদা একটা বড় ব্যাপার। তারপর আমার মনে হয়, এ সম্বন্ধে কোন চেতনাই ওঁর মধ্যে এখনো আসেনি। বাঙ্গালী মেয়েদের অবস্থা ত দেখছেন! এদের মনে নেই দুরাশা, জীবনে নেই ষড়যন্ত্র দলাদলি; মনে দুঃখ বিরক্তি বা অসন্তোষ এলে তখনি ঝেড়ে ফেলে, দুরন্তপনা বা মারামারির কথা ভাবতেই পারে না; এরা বড় জোর স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া করে বাপের বাড়ী যেতে জানে, তার পর রাগ পড়ে গেলে ফিরে এসে মিটমাট করে বাধ্য হয়ে থাকে। খুব

যারা ভালো মেয়ে—শান্ত শিষ্ট ধীর, নিজেকে স্বামীর সেবিকা ভেবেই সুখী থাকে। এই তো বাঙ্গালী মেয়েদের জীবনধারার গতি! কিন্তু আশ্চর্য এই যে, এঁদের মধ্যে কেউই ঠিক বন্ধুর মত স্বামীর সঙ্গিনী হোতে চান না! এখানে স্বামি-স্ত্রী দুপক্ষেরই ত্রুটি। আমার মনে হয়, এ ত্রুটি থেকে তরলার মত শিক্ষিতা মেয়েও মুক্ত নয়। তাহলে স্বামীর সঙ্গে তাঁর ছাড়াছাড়ি হোত না। নিশ্চয়ই উনি স্বামীর বন্ধু হোতে পারেন নি। এখন বলুন ত, যে দিকটা নিজেই ভালো করে বুঝতে পারেননি, যে পথ চেনেন নি—কি করে তিনি অগ্রবর্তিনী হোয়ে আর দশজন মেয়েকে সে পথে নিয়ে যাবেন? কাজেই এ নিয়ে ব্যস্ত হবার কিছু নেই।

শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন: তোমার যুক্তি অকাট্য মা, এসব কথা আমরাও কোনদিন ভাবিনি। কিন্তু এ আন্দোলনে সমাজের অনিষ্ট হবে জেনেও ব্যস্ত হোতে বারণ করছ কেন, সেও ভেবে পাচ্ছিনে। আমার মত হচ্ছে—এখন থেকেই এ-ব্যাপারে বাধা দেওয়া উচিত, যাতে ও আন্দোলন গোড়াতেই বন্ধ হোয়ে যায়।

মৃদু হাসিয়া চণ্ডী বলিল: আমাকে ক্ষমা করবেন পণ্ডিত মশাই, এখানেও কিন্তু আমার ঐ এক কথা—জড়ভরতের মত বসে থেকে মন ভারি করার চেয়ে একটা এমন কিছু করাই ভালো, যাতে বেশ সাড়া পড়ে যায়। কি আছে আমাদের সমাজের মেয়েদের মধ্যে বলুন ত? সাধ করে কি কবিগুরু আমাদের লক্ষ্য করে বলেছিলেন—

> আমার কেবল আছে জানা—
> রাঁধার পরে খাওয়া, আবার
> খাওয়ার পরেই রান্না-বান্না!

এই তো মেয়েদের অবস্থা! করুন না ওঁরা একটা আন্দোলন, শুনুন না বাইরের মেয়েদের মুখের কথা, শুনে মনের জড়তাও ত কাটবে। তাই

বা মন্দ কি? তবে, এ বিষয়ে কোন ভুল নেই পণ্ডিত মশাই, তরলারা নারী-প্রগতির দিক দিয়ে ওদেশের অনুকরণে মেয়েদের স্বাধীন করবার জন্যে যত চেষ্টাই করুন, আর আন্দোলন চালান, একটা দোলা দেওয়া ছাড়া দলে যে কাউকে ভেড়াতে পারবেন তা মনে হয় না। তার কারণ, অতীতের আদর্শ, সংস্কৃতি ও ভাবধারার উপর শ্রদ্ধা, বিশ্বাস না থাকলে লোকের শ্রদ্ধা পাওয়া যায় না। তাহলেও তরলার এই চেষ্টা দেখে মেয়েরা একটু ভরসাও ত পাবেন, ভাবতেও হয়ত শিখবেন, তাই বা মন্দ কি?

শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন: কিন্তু মা, তুমি যে আদর্শ দেখিয়েছ, এ অঞ্চলে সমাজের সব স্তরেই তাই নিয়ে সবাই ধন্য ধন্য করেছে। বিদ্যার সঙ্গে যাদের কোন সম্বন্ধই নেই—তারা পর্যন্ত। এর পর তরলার ঐ কু-আদর্শের ফল কি খারাপ হবে না বলতে চাও, মা?

তেমনই ধীরভাবে স্নিগ্ধ স্বরে চণ্ডী শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রশ্নের উত্তর দিল: কিন্তু একথাও মনে রাখতে হবে পণ্ডিত মশাই, তরলাও সমাজের মেয়ে, নিজের জীবনে একটা শক্ত আঘাতও সে পেয়েছে। সেই অভিজ্ঞতা নিয়ে সমাজ-বিরোধী কাজ যদি সে করতে যায় গায়ের জ্বালায়, তার জন্যে আমাদের কোমর বেঁধে তাঁকে বাধা দিতে যাওয়া কখনই ঠিক হবে না বলেই আমি মনে করি। আপনিই বলুন, যে ক্ষতি তার হোয়েছে, তার কোন প্রতিকারও ত সমাজ করেন নি—করবার সাধ্যও নেই! কাজেই তরলা যদি তার ক্ষতি পূরণ করতে এগিয়ে যান, তাঁকে শাস্তি দিতে যাওয়াও কি সঙ্গত হবে? এর ফলে তাঁর রোক আরও উগ্র হোয়ে উঠবে, হয়ত সমাজের বাইরেই তিনি চলে যাবেন। যদি তরলা আমাদের সমাজের মেয়ে না হোতেন তাহলে আমরা কখনই চুপ করে থাকতে পারতাম না। আপনারা ত শুনেছেন, বিয়ের আগে শ্যামাপুরে মিশনারী স্কুলের খ্রীষ্টান শিক্ষয়িত্রীর কাজে আমি বাধা

দিয়েছিলাম। তার কারণ, ভিন্ন সমাজ থেকে এসে তিনি আমাদের সমাজের ক্ষতি করছিলেন। তরলা আমাদের সমাজের মেয়ে, আমরা ওঁকে সমাজের বাইরে যেতে দেবনা—সমাজের মধ্যেই ধরে রাখব। ওঁর মনের অবস্থা ভেবে সাময়িক ঔদ্ধত্য আমাদের সহ্য করতেই হবে ওঁরই মুখ চেয়ে। ওঁর জন্যেই আমরা ওঁকে সহ্য করব।

শাস্ত্রী মহাশয় এখন গাঢ়স্বরে বলিলেন: তোমার আসল কথা এতক্ষণে বুঝতে পেরেছি মা! সহিষ্ণুতা ও ধীর বুদ্ধিতে তুমি আমার মত প্রবীণকেও হারিয়ে দিলে।

ডাঃ রায় এতক্ষণ নিবিষ্টমনে ইহাঁদের কথোপকথন শুনিতেছিলেন। তিনিও সানন্দে বলিয়া উঠিলেন: আপনার কথা আমরা দূর থেকেই শুনেছিলাম, শোনা কথা থেকে মনে এমনি একটা ধারণা জেগেছিল যে, নামের মতই বুঝি আপনার প্রকৃতিও উগ্র। কিন্তু আজকের বৈঠকে বিরোধী দলের প্রতি আপনি যে রকম সহানুভূতি দেখালেন, যে অকাট্য যুক্তি দিয়ে অবস্থাটা বুঝিয়ে দিলেন, তাতে ঐ ধারণার জন্যে সত্যিই এখন লজ্জা পাচ্ছি। আমার মনে হয়, আমাদের দেশের 'হামবড়া হ্যায়' দলের বাতিকগ্রস্ত নেতাদেরও আপনার কাছে শিক্ষা করবার অনেক কিছু আছে।

মৃদু হাসিয়া চণ্ডীও সঙ্গে সঙ্গে কথাটার উত্তর দিল: আমাকে এত বাড়িয়ে লজ্জা দেবেন না প্রতাপবাবু, আমি এইটুকু বুঝি যে বিরোধের মূলে যদি যুক্তি থাকে—তাতে রাগ করবার কথাই আসেনা, বরং আনন্দই হয়। কিন্তু দম্ভ আর অন্যায় নিয়ে বিরোধীপক্ষ যদি আস্ফালন করেন, উপলক্ষ তার তুচ্ছ হোলেও সেটা সহ্য করা যায় না; তেমন কিছু ঘটলে হয়ত আপনিই আশ্চর্য্য হবেন—নামের মত আমার স্বভাবকেও উগ্র হোতে দেখে!

এই গভীর উক্তিটির অর্থ মনে মনেই প্রতাপবাবু বোধ হয় উপলব্ধি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, কিন্তু তৎপূর্বেই বাপুলী মহাশয় বলিয়া উঠিলেন:

আশ্চর্য এই যে, এ সব বিষয়ে কর্তার সঙ্গে বৌমার মতের এতটুকু অমিল নেই! প্রথম দেখার দিনেই তিনি ওঁকে চিনতে পেরেছিলেন, তাই ওঁর বিরুদ্ধে নালিশ শুনে বিচার করতে গিয়ে খুসি হোয়ে কুলবধূর মর্যাদা দিয়েছিলেন। এমন ঘটনা সচরাচর দেখা যায় না।

আত্মপ্রশংসা শুনিয়া চণ্ডী মুখখানি ঈষৎ নত করিল। গোবিন্দনারায়ণ অপাঙ্গে পত্নীর দিকে একবার চাহিয়াই পরক্ষণে তাঁহার হাতের গ্রন্থে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিল। শাস্ত্রী মহাশয়, রাজীব ও নবাগত ডাক্তার রায়ের মুখগুলি আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল; শ্রদ্ধায় দৃষ্টিতে চণ্ডীর দিকে চাহিয়া—এই মনস্বিনী নারীর সান্নিধ্যে আসিবার জন্য প্রত্যেকেরই অন্তরে বুঝি নূতন করিয়া একটা সম্ভ্রমবোধ জাগ্রত হইল।

এই সময় গৌরীকে হলে প্রবেশ করিতে দেখিয়া চণ্ডী তাড়াতাড়ি তাহার কেদারা ছাড়িয়া উঠিয়া সহর্ষে কহিল: এসো গৌরীদি, আমরা এখানে সবাই তোমার জন্যে উদগ্রীব হোয়ে প্রতীক্ষা করছি।

গোবিন্দনারায়ণ, ডাক্তার রায় ও রাজীব সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল, শাস্ত্রী মহাশয় এবং বাপুলীকেও উঠিবার জন্য উদ্যত দেখিয়া চণ্ডীই সবিনয়ে বাধা দিয়া বলিল: ও কি করছেন—বসুন, বসুন, গৌরীদি আপনাদের মেয়ের মতই যে! আমরাই ওঁকে অভ্যর্থনা করছি।

গৌরী সহাস্যে বলিল: আমাকে অভ্যর্থনা করবার কিছু নেই—যখন দয়া করে আপনাদের প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ডেকে নিয়েছেন।

অতঃপর চণ্ডী গৌরীকে পরিচিত করিয়া দিল সকলের সঙ্গে—যদিও পাঠাগারের সভায় কাহারও কাহারও সহিত পূর্বেই তাহার পরিচয় হইয়াছিল। গৌরী সসম্ভ্রমে শাস্ত্রী মহাশয় ও বাপুলীকে হেঁট হইয়া প্রণাম করিল, অপর সকলকে যুক্তকরে নমস্কার জানাইল। শিষ্টাচার বিনিময়ের পর বৈঠকের কাজ আরম্ভ হইল। নকুল নামে এই মহলের পরিচারক গৌরীর সুটকেসটি যথাস্থানে রাখিয়া চলিয়া গেল।

শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেনঃ অনেকখানি পথ আসতে হোয়েছে মা, গাড়ীতে এলেও শ্রান্তি স্বাভাবিক, কাজেই একটু—

মৃদু হাসিয়া গৌরী কহিলঃ আমরা হচ্ছি চণ্ডীর পাঠশালার মেয়ে, প্রত্যেকেই এক একটি চামুণ্ডা বিশেষ! আমাদের দেহে শ্রান্তি নেই শাস্ত্রী মশাই! আসতে দেরি হোয়ে গেছে, তাই ধূলপায়েই বসতে হয়েছে; এটা অবিধিও নয়—ধূলপায়ে দেবদর্শনের ব্যবস্থা আপনারাই দিয়েছেন, আর এও ত জনদেবতার কাজ—দেবালয়। কাজ ত আগে হয়ে যাক, তারপর সব হবে।

বাপুলী বলিলেনঃ হ্যাঁ, মা-চণ্ডীর সখীর মতই কথা বটে!

ইহার পর প্রায় একটি ঘণ্টা ধরিয়া কাজের কথা হইল। প্রচলিত ধারায় অন্যান্য সভার মত বক্তৃতা, বাকবিতণ্ডা ও প্রস্তাব লেখালিখি নয়—একেবারে সঙ্গে সঙ্গে কাজের ব্যবস্থা চালু করার জন্যই এই বৈঠক। বিভিন্ন অঞ্চলে জমিদারী কাছারীর তৈরী বাড়ীগুলিতে পাঠাগার, পাঠশালা ও চিকিৎসালয় স্থাপিত করায় সুবিধা অসুবিধা সম্বন্ধে আলোচনা এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার প্রতীকার করাই এই বৈঠকের উদ্দেশ্য। ইতিমধ্যে যে কেন্দ্র-গুলিতে কাজ চালু হইয়াছে, তাহাদের অবস্থা যাঁহারা হাতে কলমে কাজ করিতেছেন, তাঁহাদের নিকট হইতে সংগ্রহ করা হইয়াছে। অধিকাংশস্থলেই যুগ্ম সম্পাদকদ্বয় স্বচক্ষে অবস্থা পরিদর্শন করিয়াছেন বা সংশ্লিষ্ট আছেন। আলোচনা-সূত্রে জানা গেল, মোটের উপর কাজ আশাপ্রদ হইয়াছে, অঞ্চলবাসীদের পক্ষ হইতে বিশেষভাবে সাড়া পাওয়া গিয়াছে। কোন কোন অঞ্চলে মেয়েদের পাঠশালা মেয়েদের দ্বারাই চালাইবার প্রয়োজন দেখা দিয়াছে। গ্রামাঞ্চলের মেয়েদের মধ্যে এমন শিক্ষা কাহারও নাই, যিনি নিজের বাড়ীর বা পাড়ার মেয়েদের শিক্ষার ভার লইতে পারেন। এরূপ কেন্দ্রগুলিতে অভিজ্ঞ শিক্ষয়িত্রী নিয়োগ করিতে হইবে। চিকিৎসা-লয়গুলিতে মেয়েদিগকে সেবার কাজ শিখাইবার জন্য সেবাকার্যে নিপুণা

নার্সের প্রয়োজন আছে। এই ভাবে অভাব ও অসুবিধাগুলি জ্ঞাত হইয়া বৈঠকেই যথাযোগ্য প্রতীকারের ব্যবস্থা হইয়া গেল। স্থির হইল, ডাক্তার রায় কলিকাতা হইতে এমন কতকগুলি ধাত্রীকে পছন্দ করিয়া আনিবেন, যাঁহারা অন্তত একটি বৎসর পল্লী-অঞ্চলে থাকিয়া প্রত্যেক পল্লী পরিদর্শন করিবেন এবং পল্লী-অঞ্চলে যে সকল মেয়ের মেধা ও সেবাশুশ্রূষা শিক্ষায় আগ্রহ আছে তাঁহাদিগকে হাতে কলমে শিক্ষা দিয়া সেবাকার্যে পটিয়সী করিয়া তুলিতে পারিবেন। এইভাবে প্রাথমিক শিক্ষাদানের উপযুক্ত কতিপয় শিক্ষয়িত্রী সংগ্রহের ব্যবস্থাও হইল। নূতন গৃহ নির্মাণ এবং রাজীবের নির্দেশমত গ্রন্থ ও চিকিৎসালয়ের জন্ম ঔষধ-পত্র সরবরাহের বন্দোবস্তও হইয়া গেল।

অন্যান্য কেন্দ্র সম্পর্কে যথাযথ ব্যবস্থার পর চণ্ডী গৌরীকে জিজ্ঞাসা করিল: এখন তোমাদের কেন্দ্রের খবর বল। ওখানকার বৃত্তান্ত তোমার কাছে শুনে তারপর ব্যবস্থা করা হবে বলেই তোমাকে আনা হয়েছে।

গৌরী মুখখানা একটু গম্ভীর করিয়া বলিল: এসব দিক দিয়ে আমার কেন্দ্রের খবর খুব ভালো। চণ্ডী বিদ্যাপীঠে আমাদের যে ভাবে কাজ চলেছে, তাতে আমাদের কেন্দ্রই আগে বুড়ি ছোঁবে—এ কথা আমি জোর করে বলতে পারি। ওখানে এমন তিনটি শিক্ষয়িত্রী আমরা পেয়েছি, যাঁরা পড়াশোনায় যেমন পাকা, সেবা শুশ্রূষায় আর শিল্প-কলাতেও তেমনি তাঁদের অভিজ্ঞতা আছে। এর ফলে দশ বারো বছরের মেয়েরাও লেখাপড়ার সঙ্গে সেলাই, বোনা আর সেবা-শুশ্রূষার কাজ শিখেছে। তারপর, চণ্ডীদেবীর উপাখ্যান ও-অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে মেয়েদের মধ্যে চণ্ডী বিদ্যাপীঠে ভর্তি হবার এমনি একটা আগ্রহ জাগিয়েছে—যার জন্যে শিগগীর বড় বড় গোটা কতক ঘর তৈরী করে না দিলেই নয়। ভর্তি হোতে এলে, জায়গা নেই বললেও তারা শোনেনা, বারণ মানে না; বলে—

বেঞ্চি না থাকে, আমরা মেঝেয় বসে পড়বো।—এই হলো মেয়েদের দিকের কথা।

এই বৃত্তান্ত শুনিয়া সকলেই উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। চণ্ডী অর্থপূর্ণ স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে বাপুলীর দিকে চাহিতেই তিনি প্রসন্নমুখে বলিলেনঃ কালই আমি মিস্ত্রী নিয়ে শ্যামাপুরে হাজীর হচ্ছি। মা-চণ্ডীর বিদ্যাপীঠ যারা মন্ত্রবলে গড়েছিল, তারা অসাধ্যসাধন করবার আর একটা সুযোগ পাবে, আর তাতে উপরি পাওনাও তাদের যথেষ্ট থাকবে; কাজেই কোন চিন্তা নেই।

চণ্ডী বলিলঃ আপনি যখন সে দিনের কথা মনে করে ভারটি নিলেন কাকাবাবু, আমি তাহলে নিশ্চিন্ত হলাম। এখন গৌরীদি, ওদিককার খবর বল। ওখানকার কাছারী বাড়ীতে পুরুষদের জন্যে যে-সব ব্যবস্থা—

গৌরী এখানে বাধা দিয়া মুখখানা আরও গম্ভীর করিয়া কহিলঃ ও-দিককার খবর বলতে ভয় করে, পাছে সব শুনে তুমি রণচণ্ডী হয়ে ওঠ!

পরিহাসের ভঙ্গিতে চণ্ডী জিজ্ঞাসা করিলঃ অসুর হোয়ে আবার কে ওখানে এলেন যে এ কথা বললে?

গৌরী কহিলঃ সে হিসেব তুমিই কর—আমি বলেই খালাস। তুমি ত জানো, শ্যামাপুরের কাছারী সারা গ্রামের চার আনা জুড়ে থাকলেও বাইরের লোকের কোন সুযোগ সুবিধাই সেখানে নেই। সেই নিয়ে ওখানকার নায়েবের সঙ্গে তোমাকে কি সাধারণ ঝগড়া করতে হয়েছিল! এক খাজনা দিতে যাওয়া ছাড়া কেউ ওখানে ঢুকতেই পারে না। অতবড় দীঘি, চার দিকে ঝিল—কারুর সাধ্য নেই জল স্পর্শ করে। নায়েব মশাই কাউকেই ওখানে আমল দিতে চান না। ওঁর যেখানে যত সব আত্মীয়-স্বজন আছে, ঘরগুলোতে তারাই বসবাস করে। আমি চেষ্টা করে গ্রাম থেকে বেছে বেছে কর্মী ছোকরাদের যোগাড় করলাম, কাজের কথা শুনে তাদের কি উৎসাহ! কিন্তু উনি কেবলই

দিনের পর দিন ওদের ফেরাতে লাগলেন একটা না একটা ওজর তুলে। শেষ কালে সেদিন জানিয়ে দিলেন—ওসব ওখানে হবে না।

গৌরীর বার্তা শুনিতে শুনিতে চণ্ডীর মুখভঙ্গিরও পরিবর্তন হইতেছিল। কথা শেষ হইলে মুখখানি কঠিন করিয়া বিকৃতকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল: নায়েব মশাই এ কথা বলেছেন? সদর থেকে হুকুম পেয়েও? কাকাবাবু, শুনছেন আপনার নায়েব সাতকড়ি সামন্তর আস্পর্ধার কথা?

বাপুলী গম্ভীর ভাবে বলিলেন: একই হুকুম সব কাছারীতেই গেছে, সবাই মেনে নিয়েছে—যদিও স্বার্থের দিক দিয়ে তাদের বিস্তর অসুবিধা হয়েছে, তা সত্ত্বেও। কিন্তু উনি হুকুম মানলেন না কেন? আর ও কথাই বা বললেন কোন্ অধিকারে?

গৌরী বলিল: অধিকারটা নাকি মহকুমা হাকিমের কাছ থেকেই আদায় করেছেন, আর সেই জন্যেই—

কথাটা শুনিয়া সকলেই অবাক হইয়া গৌরীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। কিন্তু সেই দৃষ্টিপাতের মধ্যে চণ্ডীর প্রদীপ্ত চক্ষু দুইটির অস্বাভাবিক দীপ্তি বুঝি গৌরীর চক্ষুতেও ধাঁধা লাগাইয়া দিল, সঙ্গে সঙ্গে তাহার মুখের কথা বন্ধ হইয়া গেল। চণ্ডীই পরক্ষণে জিজ্ঞাসা করিল: আমাদের ষ্টেটের কর্মচারীর সঙ্গে মহকুমা হাকিমের কি সম্বন্ধ যে তিনি তাকে হুকুম দিতে আসেন? আর আমাদের হুকুম ঠেলে সেই লোক হাকিমের হুকুম মানতেই বা যায় কোন্ এক্তিয়ারে?

প্রশ্নটা দৃপ্ত কণ্ঠে গৌরীকে করিয়াই চণ্ডী তাহার জ্বলন্ত দৃষ্টি বাপুলীর মুখে নিবদ্ধ করিল। বাপুলীও তৎক্ষণাৎ গৌরীকে জিজ্ঞাসা করিলেন: হাকিমের হুকুম পেয়েই নায়েব কি ও কথা বলেছে মা? কথাটা স্পষ্ট করে বল দেখি, যা যা শুনেছ?

গৌরী বলিতে লাগিল: ছেলেদের মুখের উপর ঐ কথা বলতেই তারা ওঁকে ধরে বসে, জানতে চায়—এখানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলা হবে না

কেন? তখন তিনি বলেন—'কথাটা হাকিমের কানে গেছে, তিনি হুকুম করেছেন—ওসব সমিতি ফমিতি করা চলবে না। শেষে কি হাকিমের হুকুম অমান্য করে আমি শুদ্ধ ফ্যাঁসাদে পড়ব?'

চণ্ডী ক্রমশঃই অসহিষ্ণু হইয়া উঠিতেছিল। সকলেই অবাক বিস্ময়ে লক্ষ্য করিতেছিল যে সেই ধীর স্থির শান্ত সহনশীলা নারীর আকৃতি ও প্রকৃতি এই সাধারণ খবরটিকে উপলক্ষ করিয়া পলকে কি আশ্চর্য রূপে বদলাইয়া গিয়াছে! তাহার কণ্ঠের সেই সুমিষ্ট স্বরও কতখানি উগ্র ও বিকৃত হইয়া উঠিয়াছে! দুঃসহ ক্রোধে সে যেন আপনাকে সম্বরণ করিতে পারিতেছে না, এমনি তার অবস্থা।

বাপুলী জিজ্ঞাসা করিলেনঃ হাকিম থাকেন সদরে, ও গ্রামের বাসীন্দা নন যে আমাদের প্রতিষ্ঠান খোলবার খবর পেয়েছেন। তা ছাড়াও, শুনছি, কোন কাজ ওখানে আরম্ভই হয়নি। আমি ত ভেবে পাচ্ছি না—এ অবস্থায় তাঁর কাছ থেকে আপত্তি আসবেই বা কেন?

গৌরী কহিলঃ আসল ব্যাপারটাও আমি জেনেছি। আগেই বলেছি, নায়েব মশায়ের ইচ্ছা নয় যে, ওঁর কাছারী বাড়ীতে ও সব হয়—তাহলে সবদিক দিয়েই ওঁর ক্ষতি। এখন হয়েছে কি, ওঁর এক শ্যালক ওখানে সপরিবার থাকেন। তিনি আবার হাকিমের সেরেস্তায় চাকরী করেন। পাছে ওঁকে উঠে যেতে হয়, এই জন্যে তিনিই ব্যাপারটা হাকিমকে জানিয়েছেন—তাতেই এই কাণ্ড হোয়েছে।

বাপুলী একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেনঃ এখন ব্যাপারটা বুঝতে পারা যাচ্ছে।

বাপুলী মহাশয়ের মুখের দিকে চাহিয়া ওষ্ঠাধর কুঞ্চিত করিয়া চণ্ডী বলিলঃ আপনি নিশ্চয়ই এই বুঝেছেন, ঐ সুবিধাবাদী মানুষটি—যিনি আমাদের কাছারীর বাড়ীতে অবৈধভাবে থাকেন, আর হাকিমের সেরেস্তায় চাকরী করেন—তাঁর কারসাজিতেই এই কাণ্ড ঘটেছে! কিন্তু

আমি এখনো বুঝতে পারছিনা, একজন পদস্থ সরকারী কর্মচারীর মুখ দিয়ে এরকম অন্যায় হুমকি বার হলো কি করে? আমরা নিশ্চয়ই মধ্য যুগে বাস করছি না, আর কাজীর শাসনও এখন চালু নেই!

বাপুলী মুখখানার এক অদ্ভুত ভঙ্গি করিয়া কহিলেন: মুস্কিল হোয়েছে কি জানো মা, বিলেত থেকে এমন এক একটা আই, সি, এস, মাঝে মাঝে জেলাকে জ্বালাতে আসে যে, তাদের আহম্মুকী দেখলে পিত্তি পর্যন্ত জ্বলে যায়। ছেলে মানুষের মতন এমন সব অনাসৃষ্টি কাণ্ড বাধিয়ে বসে যে, কহতব্য নয়। সেই ছড়া আছেনা—রাজার নন্দিনী প্যারী, যা করে তা শোভা পায়···এও হোয়েছে তাই!

চোখের দৃষ্টি রুক্ষ করিয়া গলায় জোর দিয়া চণ্ডী বলিল: তা ব'লে এই অন্যায় মুখ বুজে সইতে হবে—এর কোন প্রতিকার নেই? এই যে মহকুমা হাকিমটা তার অধীনস্থ এক কর্মচারীর কথা শুনে এত বড় বে-আইনী কাজ করেছে, আমরা তা শুনে চুপ করে থাকব? না কাকাবাবু, এ অন্যায় আমি সহ্য করতে পারবনা,এর প্রতিকার আমাকে করতেই হবে।

সকলেই স্তব্ধ বিস্ময়ে চণ্ডীর মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন, কাহারও মুখ দিয়া একটি কথাও বাহির হইল না। মুগ্ধ বিস্ময়ে তাঁহারা ভাবিতে থাকেন—প্রবল প্রতাপ বৃটিশ সরকারের রাজত্বের স্তম্ভস্বরূপ যে আই, সি, এস পদবীধারা পদস্থ রাজপুরুষ—এক একটা জেলা বা মহকুমার জবরদস্ত শাসক, দণ্ডমুণ্ডের কর্তা—বড় বড় ভূস্বামী, খেতাবধারী রাজন্যসমাজও যাঁহাদের প্রসাদ ও প্রসন্নতা লাভ করিলে বর্তাইয়া যান, সেই দুর্ধর্ষ এক আই, সি, এস হাকিমের প্রতি এই তেজস্বিনী তরুণীর একি দুঃসাহসিক নির্ভীক উক্তি!

কয়েক মিনিট নিঃশব্দে কাটিলে গৌরীই আস্তে আস্তে কহিল: আরও একটু কথা আছে; শুধু কর্মচারীর স্বার্থের দিকে চেয়েই হাকিম' ও হুকুম দেননি, এ ব্যাপারে তাঁর নিজের স্বার্থও অল্পবিস্তর আছে।

আবার সকলে বিস্ময়াপন্ন হইয়া গৌরীর মুখের দিকে চাহিল। চণ্ডীর দুই চক্ষুও সহসা বিস্ফারিত হইয়া উঠিল—কোন গূঢ় কথার তাৎপর্য উপলব্ধি করিতে হইলে স্মৃতিপথে সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাতেরও সার্থকতা আছে। চণ্ডীর মুখ ও ভঙ্গি দেখিয়া গৌরীও বুঝিল, পাঠাগারের সভায় সংক্ষেপে যে অশুভ আভাস সেদিন সে দিয়া গিয়াছিল, চণ্ডীর মাথার মধ্যে তাহাই এখন জট পাকাইতেছে। তথাপি কথাটা বৈঠকে ব্যক্ত করা বিধেয় ভাবিয়াই গৌরী বলিলঃ হাকিম সাহেব য়্যাদ্দিন জমি তৈরী করছিলেন। তাঁর বোন খৃষ্টকুমারী এখন হোয়েছেন সূর্পনখা; দাদাকে এই বলে তাতিয়েছেন—'একটা নেটিভের মেয়ে আমাকে সবার সামনে অপমান করলে, টেক্কা দিয়ে স্কুল খুলে আমাদের স্কুল বন্ধ করে দিলে, বোনের এ অপমান তুমি সহ্য করবে দাদা?' এই হলো গোড়ার কথা। যখন সে সব হাঙ্গামা হয়, খৃষ্টকুমারীর দাদা তখন সরকারের খরচে বিলেতে আই, সি, এস পড়ছিলেন। সিডিউল্ড্ কাস্টের গ্রাজুয়েট ছেলে, তায় খৃষ্টধর্মে ব্যাপটাইজড্ হোয়েছে, তাঁর খোঁটার জোর ত সোজা নয়! আই, সি, এস পাশ করতেই সেখান থেকে তালিম দিয়ে বাঙলা দেশের সাবডিভিশানগুলো দুরস্ত করতে তাঁকে পাঠানো হয়। তারপর—পড়্ ত পড়্ আমাদেরই ঘাড়ে; বোনের কথা শুনেই সাহেব একেবারে ক্ষেপে ওঠেন; এতবড় আস্পর্ধা একটা বাঙালী মেয়ের—রাজার জাতের মেয়েকে অপমান করে! বিশেষ, সে যখন তাঁর মত এক আই-সি-এসের সিষ্টার! এই নিয়েই এখন তুলকালাম কাণ্ড আরম্ভ হোয়েছে—কেন মিশনারী স্কুল বন্ধ হলো, আর চণ্ডী বিদ্যাপীঠ জেঁকে বসল—কর তার তদন্ত। শুনতে পাচ্ছি—গোয়েন্দা লাগানো হয়েছে, পুলিশ থানা থেকে পুরোনো ফাইল তলব করে সদরে নিয়ে গেছেন। এর ওপর সবার সেরা খবর হোচ্ছে—পরশু রবিবার হাকিম সাহেব তাঁর সিষ্টারকে নিয়ে তদারক করতে আসছেন। শ্যামাপুরের কাছারী বাড়ীতেই তাঁদের ওঠবার, সম্বর্ধনার ও

খানা-পিনার আয়োজন হচ্ছে খুব ধুমধাম করে। সেখানেই হাকিম সাহেব দরবার করবেন। গ্রামের সব মাতব্বর ব্যক্তি, বিদ্যাপীঠের শিক্ষয়িত্রী, আর মিশনারী স্কুলের পুরোনো ছাত্রীদের থানা থেকে হাকিমের হুকুম জানানো হোয়েছে দরবারে হাজির হবার জন্যে। কাছারীর নায়েব মশাই এর পাণ্ডা হোয়েছেন, তিনি এখন আনন্দে আর উৎসাহে ফেটে পড়বার মত হোয়ে কাছারীবাড়ী সাজাতে লেগে গেছেন। এই হোচ্ছে আমার আসল খবর, এখন মাথা ঠাণ্ডা করে ভেবে ঠিক কর, এ অবস্থায় কি আমাদের কর্তব্য !

কিছুক্ষণ সকলেই স্তব্ধভাবে নিরুত্তরে বসিয়া রহিলেন, একটু পরে গোবিন্দনারায়ণের মুখ দিয়া একটি কথা শুধু বাহির হইল: তাই ত! এমন একটা বিশ্রী অবস্থা দেখা দিল—একেবারেই যেটা অপ্রত্যাশিত !

কথাটা বুঝি চণ্ডীর চিন্তাজাল ছিন্ন করিয়া দিল; অপাঙ্গে স্বামীর উদ্বিগ্ন মুখের দিকে চাহিয়া আপন মনেই সে বলিয়া উঠিল: সংসারে এমনি করেই কত অপ্রত্যাশিত ব্যাপার এসে হঠাৎ নূতন সমস্যার সৃষ্টি করে। আমি খালি ভাবছি ঐ নায়েবটার কথা ! সরকারের মাইনেকরা একটা পদস্থ চাকরের চাপরাস দেখে তার মাথা এমনি গুলিয়ে গেছে যে, আসল মালিকের কোন পরোয়াই করলে না—অথচ এই মালিকের উপর তার অদ্ভুত ভয় ও ভক্তি বিয়ের আগেও আমি দেখিছি। এখন বেশ বুঝতে পারছি, আমার জন্যেই এটা হয়েছে।

বাপুলি বিপন্নের মত হইয়া তাড়াতাড়ি বলিলেন: একথা কেন বলছ মা? ওর স্পর্ধার জন্য তুমি নিজেকে—

বাপুলীর কথায় বাধা দিয়া চণ্ডী দৃঢ়স্বরে বলিল: আমাকে ভুল বুঝবেন না কাকাবাবু, আমি যা বলেছি তার পিছনে যুক্তি আছে। ও লোকটা জানে, আমি গরীবের মেয়ে, তার পর আমার বিদ্যার কথা শুনেছে—যেটা ঐ শ্রেণীর লোকের কাছে বুজরুকি ছাড়া কিছু নয়। আর

এ খবরও নিশ্চয় রেখেছে ও—আসল মালিক শয্যাশায়ী, ওঠবার ক্ষমতা নেই ; আর আমি স্বামী আর শিক্ষা নিয়েই ব্যস্ত, তার ওপর হাকিমের কোপে পড়েছি। তাই ওর এ আস্পর্ধা হোয়েছে। জানে—পিছনে আছে এমন এক মস্ত সহায়, জমিদার-মালিকও যাদের ভয় করে, আমাদের সাধ্য কি ওর কোন ক্ষতি করি! এই এখন অবস্থা কাকাবাবু! তাহলে বলুন, আমি কি অন্যায় বলেছি? আমার জন্যেই ও লোকটা এতখানি বেড়ে ওঠেনি? বিয়ের আগে থেকেই আমার উপরে ওর রাগের অন্ত নেই।

বাপুলীর সাধ্য হইল না যে জোর গলায় কথাটার প্রতিবাদ করেন ; একদিক দিয়া চণ্ডীর যুক্তি অকাট্য। মনে পড়িয়া গেল, চণ্ডী যখন কুমারী—তাহার দৌরাত্ম্য ও অশিষ্টতার বিরুদ্ধে শ্যামাপুর কাছারীর এই নায়েবই জমিদার সরকারে নালিশ তুলিয়াছিল। সেই নালিশের বিচার করিতে গিয়া জমিদার যে তাহাকে কূলবধূর মর্য্যাদা দিবেন, ইহা কি সেদিন সে কল্পনা করিতে পারিয়াছিল, না—এই নায়েবের মত বিরোধীদল এই অঘটন ঘটনায় সন্তুষ্ট হইয়াছিল? সুতরাং বাশুলী স্টেটের মালিক হরিনারায়ণ বাবুর কূলবধূ হইলেও শ্যামাপুর কাছারীর নায়েবের পক্ষে সেও শ্যামাপুর গ্রামবাসী নিরীহ গৃহস্থ করালী কবিরাজের কন্যা রূপেই চিহ্নিতা! সেই পূর্ব-পরিচিতা কন্যাটিকে সে কি সহজে সর্বসমক্ষে শ্রদ্ধা সম্মান প্রদর্শন করিতে পারে? এই চিন্তার মধ্যেই একটি সূত্র পাইয়া বাপুলী স্নিগ্ধ স্বরে বলিলেন: যুক্তি ছাড়া তুমি যে কথা বল না, সে আমার জানা আছে মা! কিন্তু এখানে শুধু ঐটিই বড় কথা নয় ; হাকিমের কথাটা ভাবতে হবে বৈকি। হাকিম সুবোদের সঙ্গে দহরম মহরম রাখবার জন্যে বড় বড় জমিদারদের উমেদারীর কথা তো স্টেটের কারুর অজানা নেই মা, কাজেই নায়েব যদি হাকিমের নামে ঢলে পড়ে, ওকে বেশী দোষ দেওয়াও যায় না।

বাপুলীর শেষের কথাগুলি যেন চাবুকের মত চণ্ডীর পীঠে পড়িয়া জ্বালা ধরাইয়া দিল। জ্বলন্ত দৃষ্টি এই শ্রদ্ধাভাজনের মুখে নিবদ্ধ করিয়া সে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে প্রতিবাদের ভঙ্গিতে বলিল: আপনার একথা সমর্থন করতে হলে এই নজীরে এর পর জমিদারী চালানোই আমার পক্ষে দুরূহ হয়ে দাঁড়াবে কাকাবাবু। এই নায়েবের মত আর সব মহালের নায়েব যদি হাকিমের মুখ চেয়ে আপনাদের হুকুম অগ্রাহ্য করতে থাকে, কি উপায় তখন হবে? না' কাকাবাবু, আমি কখনই এতবড় অন্যায় আর আস্পর্ধা সহ্য করে এ দায়িত্ব নিতে পারব না।

অত্যন্ত সহজ ও শান্ত কণ্ঠেই বাপুলী বলিলেন: বেশত মা, তুমি এক্ষেত্রে কি করতে চাও তাই এখন বলো; ওখানকার অবস্থাটা যেভাবে দাঁড়িয়েছে, সেটা ভালো করে বুঝে দেখলে—

বাপুলীর কথায় বাধা দিয়াই অসহিষ্ণুভাবে চণ্ডী বলিল: এখানে বোঝাবুঝির কিছু নেই কাকাবাবু, সহজবুদ্ধিতে আমি এইটুকুই জেনেছি, হাকিমের ঐ হুমকী অন্যায়ের মুখোস ছাড়া কিছু নয়। ভয় দেখিয়ে ওরা এইভাবেই সম্মান আদায় করে—নিজেদের প্রতিষ্ঠা অক্ষুণ্ণ রাখে। এটা ওদের মধ্যে রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। কেউ এতে বাধা দেয়না এইটিই হচ্ছে আশ্চর্য! আর যে সব কর্মচারী বাইরের হুমকীর ভয়ে আসল মনিবকে ভুলে অন্যায়কারীর কাছে এত সহজে আত্মসমর্পণ করে—তারা অমানুষ, বিশ্বাসঘাতক, তাদের অন্যায়ের মার্জনা নেই।

বিস্ফারিত নেত্রে চণ্ডীর দিকে চাহিয়া বাপুলী বলিলেন: তুমি বড্ডো উত্তেজিত হয়েছ মা, তোমার কথায় হাকিমকেও তাহলে অন্যায়কারী বলে—

তেমনই তেজোদৃপ্ত স্বরে চণ্ডী বলিল: আপনি অত কুণ্ঠিত হোয়ে কথাটা বলছেন কেন কাকাবাবু? হ্যাঁ—আমিও স্পষ্ট করেই আপনার হাকিমকে অন্যায়কারী বলেছি এবং প্রয়োজন হোলে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে

মুখের উপরে ঐ কথা বলতে প্রস্তুত আছি। ভয় করে কোন দিনই যেন তাঁকে সম্মান করতে না হয়—যতবড় উঁচু পদেই তিনি বসে থাকুন, আর দণ্ড দেবার যত ক্ষমতা নিয়েই তিনি আস্ফালন করুন। আমি কিন্তু তাঁকে অন্যায়কারী জেনেই ক্ষুদ্র, অতিক্ষুদ্র ভাবব! আমি জানি, তাঁকে ভয় করলে তাঁর চোখেও ক্ষুদ্র আমাকে হতে হবে।

চণ্ডীর জ্বলন্ত দুটি চক্ষুর অগ্নিজ্বালায় বুঝি বাপুলীর দীর্ঘায়ত চক্ষুর গোল গোল তারা দুটিও সহসা প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল, কণ্ঠস্বরেও উত্তাপের কিছুটা আভাস পাওয়া গেল; দৃপ্তস্বরে তিনি বলিলেন: এর পর আর কথা নেই মা! তোমার মুখে আজ নতুন কথা শুনলাম, শুধু শোনা নয়, তার তাপ এত বেশী যে, বৃদ্ধ বয়সের রক্তও গরম হোয়ে উঠেছে। আমি তোমার কথা না মেনে পারছিনা মা; ভারি খাঁটি কথা তুমি বলেছ—অন্যায় যেই করুক, আর যত ক্ষমতাই তার থাকুক, তাকে ক্ষুদ্র ভেবে শক্ত হতে হবে। শক্ত হবার মত শক্তি তোমারও আছে মা! বেশ, যা ব্যবস্থা করবার তুমি কর—আমার পূর্ণ সমর্থন তুমি পাবে।

স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে বাপুলীর দিকে চাহিয়া চণ্ডী বলিল: এই ত আমার কাকাবাবুর কথা!

পরক্ষণে সভাপতিকে লক্ষ্য করিয়া চণ্ডী বলিল: পণ্ডিত মশাই, তাহলে এখন আমি প্রস্তাব করছি—শ্যামাপুর কাছারীর সংলগ্ন বাড়ীগুলিতে আগামী পরশু রবিবার পূর্ব্বাহ্ণেই প্রতিষ্ঠানের পরিকল্পিত পাঠাগার, পাঠশালা ও চিকিৎসালয়—এই তিনটি বিভাগের উদ্বোধন করা হোক। আর, প্রতিষ্ঠান যদি এ কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করবার ভার আমাকে দিতে ইচ্ছা করেন, আমি তাহলে আনন্দের সঙ্গেই এ ভার নিতে প্রস্তুত আছি।

প্রস্তাবটি সমর্থন করিতে উঠিল রাজীব। প্রস্তাব সম্পর্কে বিদ্যাভারতীর মানসিক দৃঢ়তার প্রশংসা করিয়া সে বলিল: আমি সানন্দে এই প্রস্তাবের সমর্থন করছি এবং সবিনয়ে বিদ্যাভারতীকে জানাচ্ছি, প্রতিষ্ঠানের কর্মীরূপে

ওদিনের অনুষ্ঠানে যোগ দেবার জন্যে যদি আমাকে ডাকা হয়, তাহলে নিজেকে ধন্য মনে করব।

অতঃপর ডাক্তার রায় উঠিয়া এই প্রস্তাব সম্পর্কে বৈঠকে বিদ্যাভারতীর সৎসাহস ও নির্ভীক প্রচেষ্টার প্রশস্তিবাদের পর বলিলেন: আজিকার বৈঠকে আমরা নিশ্চয়ই সর্বসম্মতিক্রমে বিদ্যাভারতীর এই গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবটি গ্রহণ করছি।

সকলেই সমস্বরে ডাক্তার রায়ের উক্তির অনুমোদন করিলে সভাপতি বলিলেন: বিদ্যাভারতীর প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে এবং সম্পূর্ণরূপেই এই বৈঠকে গ্রহণ করা হলো।

গৌরী এই সময় সহাস্যে বলিল: আমার কথাটাই তাহলে ফলে গেল।

শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন: হ্যাঁ মা—ঠিক বলেছ তুমি। গোড়াতেই তুমি বলেছিলে, সব শুনলে ওঁকে রণচণ্ডী হোতে হবে; তা যে-ব্যাপার দেখছি—মা আমার রণচণ্ডী হোয়েই বাপের বাড়ীর দেশে চললেন।

চণ্ডী সহাস্যে বলিল: সে কথা পরে। মাঝে এখনো প্রায় ৪২ ঘণ্টা সময় আছে। এখন আপনারা হাতমুখ ধুয়ে নিন, খাবার ব্যবস্থা আমরা করি। এসো গৌরীদি, আমরা রান্নাবাড়ীতে যাই—সকলের সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দিই।

সকলকে মধ্যাহ্ন ভোজনের জন্য প্রস্তুত হইতে বলিয়া এবং অভ্যাগতগণকে আপ্যায়িত করিবার ভার স্বামীর উপর অর্পণ করিয়া চণ্ডী গৌরীকে লইয়া ভিতর মহলে চলিয়া গেল। পরক্ষণে নকুল, সহদেব ও ভৈরব নামে ভৃত্যত্রয় হাতমুখ ধুইবার সুবাসিত শীতল জল ও কতকগুলি নূতন তোয়ালে লইয়া আমন্ত্রিতদের পরিচর্য্যায় প্রবৃত্ত হইল।

একত্রিশ

মধ্যাহ্ন-ভোজনের পর অভ্যাগতদের প্রস্থানকালে চণ্ডী বাপুলী মহাশয়কে একান্তে ডাকিয়া বলিল : আপনাকে বলা নিষ্প্রয়োজন হলেও স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি কাকা বাবু, শ্যামাপুর কাছারীর নায়েব সম্পর্কে ঐ সব কথা আপাততঃ বাবাকে জানানো হবে না। এ বাড়ীতে এসে অবধি বাপের বাড়ী যাইনি, সেই থেকে স্কুলটিও দেখা হয় নি, গৌরীদি নিতে এসেছেন, এই জন্যই যাচ্ছি ; এই সব কথাই ওঁকে বলা হয়েছে।

বাপুলী জিজ্ঞাসা করিলেন : তাহ'লে বাপের বাড়ী যাবার কথা এরই মধ্যে কর্তা বাবুকে বলা হয়ে গেছে মা ?

চণ্ডী উত্তর করিল : হ্যাঁ—কাকা বাবু। বুঝছেন ত কাজ কত বেশী, আর সময় কি রকম কম। তাই তাড়াতাড়ি করতে হচ্ছে সব। আপনাদের খেতে বসিয়ে ওরই ফাঁকে গৌরীকে বাবার ঘরে নিয়ে যাই ; বিয়ের সময় বাবা ওঁকে দেখে ছিলেন, ওঁরই হাতে বিদ্যাপীঠের ভার দিয়ে আসি যখন। গৌরীদিকে পেয়ে বাবাও খুব খুসি—এতক্ষণে গৌরীদি যা বলবার সব বলেছেন নিশ্চয়ই ; বাবাও অমত করবেন না মনে হচ্ছে।

বাপুলী সহাস্যে বলিলেন : তোমার কথা অমান্য করবার সাধ্য কি ওঁর আছে মা, তবে তোমাকে ছেড়ে এখন থাকা ওঁর পক্ষে অসম্ভব এই ভেবে যদি না ছাড়তে চান। আমার ত জানতে কিছু বাকি নেই মা !

চণ্ডী বলিল : একটা দিনের ছুটি নিয়ে যাচ্ছি যে কাকা বাবু ! কেমন জমিদারের বাড়ীর বৌ আমি—ঘড়ি-ঘাড় ব্যবস্থা আমারো কোষ্ঠীর লিখন যে ! ওস্তাদের মারের মতন প্রথম ঘা দিয়ে যদি বাজিমাৎ না করতে পারি, তাহলে বৃথাই বাশুলীর গাঙ্গুলী-বাড়ীর বৌ হয়ে এসেছি।

বাপুলী চণ্ডীর মুখের দিকে চাহিয়া তাহার তেজোদৃপ্ত কথাগুলি শুনিতেছিলেন। কথার পর মৃদু হাসিয়া বলিলেন : তোমার মনের

উত্তেজনা চেপে রাখলেও তার আভা চোখ-মুখ দিয়ে ফুটে বেরুচ্ছে যে মা! আমার নজরেই যখন ধরা পড়ছে, কর্তার সঙ্গে কথা বলবার সময় তিনি কিন্তু সন্দেহ করবেন মা, তা বলে রাখছি। আমি বেশ বুঝতে পারছি, শ্যামাপুরের ফয়সালা না-করা পর্যন্ত তুমি শান্তি পাচ্ছ না।

চণ্ডীর মুখেও হাসির একটু ক্ষীণ রেখা ফুটিয়া উঠিল; হাসিমুখেই সে বলিলঃ বাহিরে যুদ্ধের উদ্যোগ-পর্ব যখন চলে কাকা বাবু, সেই সময়েই ত মনের মধ্যে যুদ্ধ সুরু হয়ে যায়—যুদ্ধক্ষেত্রে তার করবারও কিছু থাকে না তখন। বেশ, আপনার কথা আমার মনে থাকবে কাকা বাবু, সতর্ক হয়েই বাবার সঙ্গে কথা বলব। আপনাকে আর আটকে রাখব না—আপনার ঘাড়েও ত কাজ কম চাপাইনি!

'হ্যাঁ মা, তুমি নিশ্চিন্ত থাক—সে সব ঠিক আছে'—বলিয়া বাপুলী চলিয়া গেলেন।

শ্বশুরের ঘরে প্রবেশ করিয়াই চণ্ডী সবিস্ময়ে দেখিল, শুধু গৌরী নহে, তরলাও তাহার পাশে বসিয়া আরাম-কেদারায় অবস্থিতি অবস্থায় অর্ধশায়িত হরিনারায়ণের সহিত আলাপ করিতেছে এবং একটু দূরে মাধুরী দেবী একখানি সোফায় বসিয়া কর্তার সখের শালের টুপিতে জরির কারুকার্য করিতে করিতে ইঁহাদের সংলাপ শুনিতেছেন; আর, মৃণালিনী তাঁহার পাশে বসিয়া নিবিষ্টমনে পিসিমাকে সাহায্য করিতেছে—জরির সূতাগুলির পাক খুলিয়া দিয়া। চণ্ডী প্রবেশ করিতেই কক্ষ মধ্যে যেন একটা নিঃশব্দ চাঞ্চল্য অনুভূত হইল। গৃহস্বামী সোজা হইয়া বসিলেন, গৃহিণী একটি বার চাহিয়াই হাতের কাজের দিকে দৃষ্টি গভীর ভাবে নিবদ্ধ করিলেন, মৃণালিনী তরলার দিকে চাহিয়া ভ্রূভঙ্গি করিল, তরলা হাতযোড় করিয়া নীরবে নমস্কার করিল এবং গৌরী মুখ টিপিয়া হাসিয়া চণ্ডীকে বলিলঃ এতক্ষণে বুঝি ছুটি হলো?

তরলার নমস্কারের উত্তরে সহাস্যে ডান হাতখানি তুলিয়া আশীর্বাদের

মত একটা বিশিষ্ট ভঙ্গি করিল চণ্ডী। পরক্ষণে গৌরীর দিকে চাহিয়া সে বলিল: ছুটি হয়েছে অনেকক্ষণ; তবে এমন চাকরীও থাকে, কামাই-ছুটির বালাই যেখানে নেই—কাজ সারা নিয়ে কথা।

হরিনারায়ণ হাসিয়া বলিলেন: কথায় আমার বৌমার সঙ্গে পেরে ওঠবার যো-টি নেই গৌরী-মা!

মৃণালিনী মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল: তার ওপরে পিসে মশায়ের মতন ঝুনো কথাবিদ্‌কে বৌদি যখন উকিল পেয়েছেন!

গৌরীর ইঙ্গিতে তাহার পাশের আসনে বসিতে বসিতে চণ্ডী বলিল: কিন্তু হাকিমকে তোমরাই উকিল বানিয়ে ছেড়েছ, সে কথা ভুলে যেও না ঠাকুরঝি!

মুখখানা শক্ত করিয়া মৃণালিনী জিজ্ঞাসা করিল: তার মানে?

চণ্ডী বলিল: এ সব কথার মানে জিজ্ঞাসা করতে নেই বুঝে নিতে হয়।

মৃণালিনী মুখখানা ভার করিয়া এবং চণ্ডীর দিকে খর দৃষ্টিতে চাহিয়া একটা মৃদু হুঙ্কার তুলিল: হুঁ!

হরিনারায়ণ সহাস্যে বলিলেন: এই ত মৃণাল। ইটটি নিজেই ছুঁড়লে আগে, আর পাটকেলটির ঘা সইতে পারলে না বাছা! আরে ওর মানে ত পড়েই রয়েছে। বৌমার নামে নালিশ যখন তুলেছিলে ভাই-বোনে—হাকিম বলে পিসে মশাইকে মানতেই হবে! হাকিম শেষে খোদ আসামীকেই ওকালতি করতে দেখে এজলাস ছেড়ে নেমে এসে উকিলের পেশাই নিয়েছে। ঐ দেখ, তোমার পিসিমা তাই তাড়াতাড়ি উকিলের মাথার মাপ নিয়ে সামলা বানাতে বসে গেছেন।

কথাটা শুনিয়াই মাধুরী দেবীর দুই নেত্রমণি একসঙ্গে জ্বলিয়া উঠিল; চকিতের মত একবার সে দৃষ্টি হরিনারায়ণের মুখে ফেলিয়াই পরক্ষণে কণ্ঠস্বর সহজ ও স্বাভাবিক করিয়া বলিলেন: আমার এ সামলা উকিলের জন্যে নয়—আসামীর জন্যে।

হরিনারায়ণ হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। পরক্ষণে সহাস্যে বলিলেন: সর্বনাশ! উকিলকে তুমি আবার আসামী বানাবার ফিকিরে আছ নাকি?

মাধুরী দেবী গম্ভীর মুখে হাতের কাজে আরও গভীর ভাবে মন নিবিষ্ট করিলেন; কোন উত্তর দিলেন না। হরিনারায়ণও বুঝিলেন, কৌতুক কথারও একটা নির্দিষ্ট সীমা আছে। তিনি অতঃপর চণ্ডীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন: তরলা মা'র সঙ্গে এতক্ষণ ওঁদের সমিতির সম্বন্ধে কথা হচ্ছিল বৌমা, তুমি বোধ হয় শুনেছ, ওঁরা—

চণ্ডী বলিল: হাঁ বাবা, ওঁদের সমিতির বিজ্ঞাপন দেখেছি।

তরলা বলিল: বিজ্ঞাপন আপনার কাছে সাধারণ ভাবে পাঠানো হয়েছিল, আজ আমি বেরিয়েছি নিজে নিমন্ত্রণ করব বলে। এখান থেকেই আপনার কাছে—

চণ্ডী বলিল: এখানেই যখন দেখা হলো, আর আপনার কষ্ট করবার প্রয়োজন হবে না। আমি আপনাদের নিমন্ত্রণ শ্রদ্ধার সঙ্গেই নিলাম এবং ওঁকেও বলবো।

তরলা প্রত্যাশা করে নাই যে, চণ্ডীর নিকট হতে এরূপ উত্তর পাইবে অর্থাৎ তরলার কাজে সে শ্রদ্ধা জানাইবে। পুলকিত হইয়া তরলা জিজ্ঞাসা করিল: তাহলে ও-দিন আপনারা যাচ্ছেন ত?

চণ্ডী বলিল: আপনি নিমন্ত্রণ করেছেন, আমরা গ্রহণ করেছি। এর পরের প্রসংগ পরে—এখন তাই নিয়ে আলোচনার কোন সার্থকতা আছে কি?

হরিনারায়ণ বলিলেন: তরলা মা আমাকে ধরেছেন ও-দিন ওঁদের সভার উদ্বোধন আমাকেই করতে হবে। আমি ওঁকে আমার শরীরের অবস্থা জানিয়ে তোমার কথাই বলেছি মা—বৌমা'র মত যদি আদায় করতে পারো, আমার আপত্তি নেই!

তরলা বলিল: ওঁর উপরে আমার দাবী আছে বলেই আমি এই আবদার করেছি। সেবার আমি এখানকার মেয়ে-স্কুলের পরীক্ষায় প্রথম হলে উনি এক সভা করে আমাকে সোনার পদক পুরস্কার দিয়েছিলেন। এখন আমি এ অঞ্চলের মেয়েদের উন্নতির জন্যে সভা করছি, সে সভা উনি উদ্বোধন করবেন—এই অনুমতি আমি নিতে এসেছি। ওঁর অনুমতি পেলেই আমরা নিমন্ত্রণ-পত্র ছাপতে দেব। আপনার বৌমার ওজরে আমাকে ফেরালে চলবে না জেঠা বাবু!

হরিনারায়ণ অম্লান বদনে বলিলেন: আমি ত আগেই বলেছি তরলা মা, আমার দেহের উপরে নিজের কোন কর্তৃত্বই নেই! দেহরক্ষার ব্যবস্থাগুলোর সব ভারই নিয়েছেন বৌমা। এমন কি, শুনলে তুমি অবাক হবে, কথাবার্তার ব্যাপারেও আমাকে ওঁর দেওয়া গণ্ডীর মধ্যেই থাকতে হয়। কাজেই আমার যাওয়া-না-যাওয়ার ব্যবস্থা ওঁরই হাতে।

তরলা ক্ষণকাল নীরবে কি ভাবিল, তাহার পর দুই চক্ষুর ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিল: বৌমা'র হাতে আপনার স্টেটের ভার দিয়েছেন এ কথা আমরা শুনেছিলাম; কিন্তু উনি যে আপনার দেহেরও পাহারাওলা হয়েছেন, এ খবর জানা ছিল না। এখন আবেদনটা আপনার সামনেই ওঁর কাছে করলে চলবে, না—লোকের আড়ালে ওঁর এজলাসে গিয়েই—

তরলাকে কথাটা শেষ করিবার অবসর না দিয়াই চণ্ডী তাড়াতাড়ি উত্তর দিল: আপনার নিমন্ত্রণ যেমন শ্রদ্ধার সঙ্গে নিয়েছি, আবেদনটির উত্তরেও তেমনি সবিনয়ে জানাচ্ছি—কোন সভা-সমিতিতে যোগ দেওয়া ত অনেক দূরের কথা, এই ঘর থেকে উঠে বাইরের বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ানো ওঁর পক্ষে নিষিদ্ধ। আপনি নিজে ত বদ্যির মেয়ে, শ্বশুরও নাম-করা বদ্যি—আপনিই বিবেচনা করে বলুন, আমার কথাটা সঙ্গত কি না!

তরলা গম্ভীর মুখে বলিল: মাপ করবেন—বাবা বদ্যি, শ্বশুর বদ্যি বলে আমাকেও যে ওঁদের পেশা নিয়ে বিদ্যে চটকাতে হবে, এ ধারণা আমার নেই। আপনি জেঠা বাবুর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে যে রকম ভয় দেখালেন, বাইরে থেকে আমরা তাই ভেবেছিলাম বটে, কিন্তু আজ কাছে এসে ওঁর সঙ্গে কথা বলে ভাবি—ওঁর চেয়ে সুস্থ বুঝি আমরাও নই!

চণ্ডী হাসিয়া বলিল: সেই জন্যেই ত বদ্যির চোখ নিয়ে ওঁকে দেখতে বলি, যে কথা শুনেই আপনি চটে গেলেন। বাইরে থেকে ওঁকে সুস্থ রেখেছে ওঁর বলিষ্ঠ ও সুস্থ মন, এ কথা ভুলে যাচ্ছেন কেন? এমন বৃদ্ধ অনেক দেখা যায়—বয়স অনেক হয়েছে, চুল-দাড়ি পেকে গেছে, কিন্তু ভিতরটা তারুণ্যে ভরা। আবার এমন তরুণও অনেক দেখতে পাবেন, বয়েসে তরুণ হলেও মন তার বুড়িয়ে গেছে, তরুণ হয়েও তা'রা বৃদ্ধ। আপনার জেঠা বাবুর সুস্থ ও বলিষ্ঠ মনের ছাপ দেখেছেন ওঁর দেহে; আসলে কিন্তু স্বাস্থ্য একবারে ভেঙে পড়েছে—ওঁর এখনো বিশ্রামের প্রয়োজন আছে।

চণ্ডীর যুক্তিপূর্ণ কথাগুলি উপলব্ধি করিবার কোন লক্ষণ দেখা গেল না তরলার আচরণ ও মুখভঙ্গিতে। বরং সে বিরক্ত হইয়াছে, ইহাই বুঝিতে পারা গেল। চণ্ডীর কথার উত্তরে বিদ্রূপের সুরেই সে বলিল: পাহারাওয়ালারা অতি মাত্রায় সাবধানী হয়, এ ত জানা কথাই। আপনি যখন ওঁর স্বাস্থ্যের রক্ষক হয়েছেন, তখন ত সাবধানী হবেনই।

চণ্ডী তেমনই সহাস্যে বলিল: আপনি আমার উপর বৃথা রাগ করছেন। আমি কিন্তু স্বচ্ছন্দে বলতে পারি, আপনার বাবা যদি দয়া করে এসে ওঁকে পরীক্ষা করেন, সভায় যাওয়া সম্বন্ধে আমার মতেরই সমর্থন করবেন তিনি।

মুখখানা কঠিন করিয়া তরলা বলিল: আপনি কি আমাকে এতই কাণ্ডজ্ঞানহীন ভেবেছেন যে, আমার বাবাকে ডেকে এনে ওঁর স্বাস্থ্য

পরীক্ষা করে তবে আপনার কথার সত্য-মিথ্যা যাচাই করতে হবে ?

চণ্ডী বলিল : তাহ'লে ত আমি যে কথা বলেছি, তার উপরে আর কথা বলাই আপনার উচিত নয়।

তরলা বলিল : বেশ, আমি আপনার কথাই মেনে নিচ্ছি—একান্ত আগ্রহ সত্ত্বেও আমি জেঠা বাবুকে আমাদের সভার উদ্বোধকরূপে পাবার প্রত্যাশা ত্যাগ করছি।

হরিনারায়ণ বলিলেন : আমি তোমাদের সভার সাফল্য কামনা করছি। আর, আগে থেকেই এই আশীর্বাদ করছি—তোমাদের ধর্মে মতি হোক ; প্রগতি বলতে তোমরাও যেন মেয়েদের উন্নতিই বোঝ—সেইটিই হোক তোমাদের সমিতির লক্ষ্য।

তরলা বলিল : আপনার আশীর্বাদ সম্বন্ধে আমার একটা কথা জিজ্ঞাসা করবার আছে জেঠা বাবু ! যদি অভয় দেন ত বলি।

হরিনারায়ণ বলিলেন : স্বচ্ছন্দে তুমি বল মা, এখানে যখন চণ্ডী মা আছেন, তোমার কথা যত শক্তই হোক, তার ব্যাখ্যা করাও শক্ত হবে না। বল তুমি।

তরলা বলিল : এই যে আপনি বললেন জেঠা বাবু—তোমাদের ধর্মে মতি হোক, এটা কি শুধু কথার একটা মাত্রা নয়, এর কি কোন সার্থকতা আছে এই ধর্ম কথাটাকে আমাদের জীবনে টেনে এনে ?

হরিনারায়ণ বলিলেন : প্রশ্নটা কিন্তু শুনেই কানে লাগছে মা ! তুমি কি ধর্মকে শুধু কথার একটা মাত্রা বলেই মনে করতে চাও—আর কিছু নয় ?

তরলা বলিল : না জেঠা বাবু। আপনিই বলুন না, ধর্মকে আমাদের জীবনে টেনে আনার মানেটা কি ?

হরিনারায়ণ চণ্ডীর দিকে চাহিয়া বলিলেন : তুমি কি মনে কর বৌমা ? তরলা মা যে কথা বললেন, তার কোন মানে নেই ?

সহজ কণ্ঠে চণ্ডী বলিল, উনি যা বললেন, তার মানে খুব সোজা—ধর্মকে আমাদের কাজের মধ্যে টেনে আনা মানেই আমাদের কাজকে বরণীয় করা। ধর্ম বলতে আমরা বুঝি ঈশ্বরকে। আমাদের নিশ্বাস-প্রশ্বাস যেমন স্বাভাবিক, ঈশ্বরানুভূতিকেও তেমনি স্বাভাবিক করে নিতে পারি আমরা ধর্মকে আমাদের জীবনে টেনে এনে।

হর্ষোৎফুল্ল মুখে হরিনারায়ণ বাবু বলিলেনঃ শুনলে ত তরলা মা, তোমার ঐ বাঁকা কথার কেমন সোজা জবাব দিলেন চণ্ডী মা!

হরিনারায়ণ লক্ষ্য করিলেন, তরলার চোখে যেন তীব্র দৃষ্টির এক ঝলক বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গেই সে ভ্রূ দু'টি কুঁচকাইয়া বলিয়া উঠিলঃ কিন্তু আমি যদি ধর্মকে ঈশ্বর বলে স্বীকার না করি?

কথাটা শুনিয়া চণ্ডীর চোখেও একটা রহস্যময় দৃষ্টি ফুটিয়া উঠিল, ঠোঁটের কোণেও চাপা হাসির চিহ্ন দেখা গেল। পরক্ষণে মুখখানি প্রফুল্ল করিয়া চণ্ডী বলিলঃ ঈশ্বর বলে না মানেন, সত্য বলে মানবেন ত?

সত্য বলে?

হ্যাঁ—সত্যকে ত না মেনে পারবেন না। যদি বলি—ধর্ম হচ্ছে সত্য—মানবেন?

তরলা প্রশ্ন করিলঃ সত্য কি?

চণ্ডী বলিলঃ সত্য হচ্ছে ঘটনা—আমাদের দৈনন্দিন জীবনে যা ঘটছে।

চোখের দৃষ্টি তীব্রতর করিয়া তরলা কহিলঃ আমি ধর্ম-কর্ম শাস্ত্র-ম কিছুই মানি না, মানি কেবল বাহিরের দুটো চোখকে আর আমার অন্তরকে।

মৃদু হাসিয়া চণ্ডী বলিলঃ কিন্তু বাহিরের ঐ দু'টো চোখে যা দেখবেন, অন্তরের মধ্যেও জানবেন যে, সেখানে আর একটা চোখ লুকিয়ে আছে। বাইরে-ভিতরে যেখানেই তাকাবেন ঘটনারূপী সত্য নজরে

পড়বেই। আমরা ওকেই ঈশ্বরের প্রকাশ বলে আনন্দ পাই! আপনি যে দিক দিয়েই যান, সত্যকে স্বীকার করতেই হবে; আর ঈশ্বর হচ্ছেন সেই সত্যের স্বরূপ।

হরিনারায়ণ বাবু একটু গম্ভীর হইয়া বলিলেন: আচ্ছা তরলা মা, ঈশ্বর, ধর্ম, শাস্ত্র—এ সবের উপরে অবিশ্বাসের যে আভাস পেলাম তোমার কথায়, সে কি সত্যি? তোমার মনও কি এ কথা বলে? না—চণ্ডী মা'র উপর রাগ করে এই সব কথা বললে? আর একটা কথা, মেয়েদের উন্নতির জন্যে সমিতি খুলেছ, সভা করছ, তাহলে কি এই শিক্ষাই ওদের দেবে—ওরা যাতে বিশ্বাস করে ঈশ্বর, ধর্ম, শাস্ত্র সব মিছে?

তরলা মুখখানা অন্ধকার করিয়া বসিয়া রহিল, হরিনারায়ণ বাবুর কথার উত্তর দিল না। একটু পরে চণ্ডী সহাস্যে বলিল: সেই যে একটা কথা আছে, চোরের উপর রাগ করে ভুঁয়ে ভাত খাওয়া—ওঁরও হয়েছে তাই। ওঁর স্বামীকে জব্দ করবার জন্যে উনি ইদানীং এমনি হয়েছেন। নৈলে ওঁর সঙ্গে ত কথা বলেছি, মিশিছি আগেও—এ ধরণের কথা কোন দিন ত শুনিনি ওঁর মুখে। কিন্তু একটা কথা উনি ভুলে যাচ্ছেন, বিশ্বাস জিনিসটা সহজেই জন্মায়—জন্মের সঙ্গেই জন্মায়; আর অবিশ্বাসকে গড়ে তুলতে হয়। কাজেই, সহজাত বিশ্বাসকে মন থেকে মুছে ফেলে, অবিশ্বাসকে সেখানে ফুটিয়ে তোলা বড় চাড্ডিখানি কথা নয়—সভা করে বক্তৃতা দিয়েও তা হয় না। আমার একটা অনুরোধ আপনার কাছে—আপনি মেয়েদের কানে যে মন্ত্রই দিন—তাদের স্বাধীন করুন, স্বাবলম্বী করুন, সমাজের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলুন, যা আপনার অভিরুচি করুন, তাতে কিছু আসে যাবে না, কিন্তু ঈশ্বর নেই, ধর্ম মিথ্যে, শাস্ত্র বাজে—আপনার নিজের মন-গড়া বা এক শ্রেণীর অনাচারী নীতিদ্রোহী সর্বনাশা দলের রচা কথা মুখস্ত করে মেয়েদের মধ্যে প্রচার করবেন না। হয়ত আপনার এই অপপ্রচার

পাগলের প্রলাপ বলে আমাদের দেশের মেয়েরা উপেক্ষা করবে, তবুও মেয়ে হয়ে আপনি মেয়েদের দশের চোখে ছোট করবেন না।

হরিনারায়ণ বাবু সহর্ষে বলিলেন: বা! বা! খাসা কথা বলেছেন আমার বৌমা! তরলা মা, কথাগুলো মন দিয়ে শুনলে ত? সত্য বলছি, আমিও তোমাকে মা, এই কথাই বলছি—তোমার কাছে ঠিক এই অনুরোধই করছি।

নিষ্পলক দৃষ্টিতে চণ্ডীর মুখের দিকে একই ভাবে তাকাইয়া তরলা কথাগুলি শুনিতেছিল। চণ্ডীর কথার পর হরিনারায়ণ বাবু তাঁহার কথা বলিতে থাকিলে কটমট দৃষ্টিতে আর একবার চণ্ডীর দিকে চাহিয়া পরক্ষণে মুখখানা হরিনারায়ণের মুখের দিকে ফিরাইয়া তরলা একটু বিকৃত স্বরেই ব'লল: দেখুন জেঠা বাবু, আপনার স্বাস্থ্য পাহারা দেবার ভার বৌমা'র উপর দিয়েছেন ব'লে তা থেকে এটা বোঝায় না যে, বাঙালীর মেয়েদের মনগুলোর উপরেও উনি চৌকি দেবেন। একটু আগে উনি যেমন বললেন—মনের চোখ আছে; আমিও তেমনি বলতে চাই—মন সবারই স্বাধীন, পচা পুরানো সনাতনকে বাতিল করে নতুনকে মেনে নেবার অধিকারও তার আছে। কাজেই, আমাকে আগে থেকেই ও-ভাবে সাবধান করে দেওয়ার কোন সার্থকতা নেই! আর আপনিও জেঠা বাবু, মৃণা দিদির কথাটি যে অতি সত্য, সেটা জানিয়ে দিলেন আপনার বৌমা'র হয়ে ওকালতী করে!

তরলার এই বক্রোক্তি কক্ষের সকলকেই সচকিত ও বিরক্ত করিয়াছে এইরূপ আভাস পাওয়া গেল। মাধুরী দেবী এতক্ষণ নীরবে একই ভাবে হাতের টুপিটির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া কাজ করিতেছিলেন; তিনিও এতক্ষণে মুখ তুলিয়া তীব্র কটাক্ষে এই প্রগতিবাদিনী মেয়েটিকে দেখিয়া লইলেন। হরিনারায়ণও যে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়াছেন, তাঁহার মুখভঙ্গিই তাহা ব্যক্ত করিতেছিল। চণ্ডীর মুখের হাসিও যেন মুখের মধ্যেই মিলাইয়া

গেল ; সেই নিরস মুখেই একটা দৃঢ়তা প্রকাশ করিয়া এবং চোখের দৃষ্টিতে প্রশ্ন ভরিয়া চণ্ডী বলিল : মেয়েদের পক্ষ থেকে তাদের মঙ্গলের জন্যে আমি এই অনুরোধ করেছি বলে আপনি কি রাগ করেই ও-কথা বললেন—না, ঐগুলো করাই আপনার মনের জেদ ?

তরলাও মুখখানা কঠিনতর করিয়া উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল : আমার বলা ত হয়ে গেছে—আমি এখন উঠছি। আর, যাবার আগে আবার বলে যাচ্ছি—মনে রাখবেন, মেয়েদের মনগুলো আপনাদের সম্পত্তি নয় যে, পাহারাওলার মতন চৌকি দেবেন।

কথার সঙ্গে সঙ্গে তরলা উঠিয়া দাঁড়াইল। সঙ্গে সঙ্গে মাধুরী দেবীও কোলের উপর হাতের বস্তুগুলি রাখিয়া ডান হাতের তর্জনীটি তুলিয়া দৃঢ় স্বরে বলিলেন : একটু দাঁড়াও। তোমার কথা ত মনে রাখতে বললে, এখন আমাদের কথাগুলোও মুখস্ত করতে করতে যাও—শুধু চৌকি দেওয়াই পাহারাদারের কাজ নয়, অন্যায় দেখলেই ঘাড় ধরে হিড়-হিড় করে টেনে এনে হাতে হাতকড়া পরিয়ে হাজত-ঘরে পোরাও তার কাজ। যাও ; আমার বলা হয়ে গেছে।

মাধুরী দেবীও যে হঠাৎ উত্তেজিত হইয়া এই দুর্বিনীতা মেয়েটিকে এ ভাবে কঠোর আঘাত দিবেন, কেহ তা ধারণাও করে নাই। স্তব্ধ ভাবে প্রত্যেকেই তাঁহার দৃপ্ত মুখখানার দিকে চাহিয়া রহিলেন। তরলার পক্ষেও ইহা একেবারেই অপ্রত্যাশিত। মাধুরী দেবীর প্রত্যেক কথাটি যেন বর্শা-ফলকের মত তাহার অঙ্গে বিদ্ধ হইয়া একটা অসহ্য জ্বালা ধরাইয়া দিল। কিন্তু তথাপি সে বিহ্বল হইয়া পরাজয় স্বীকার করিতে চাহিল না—জ্বালাময়ী দৃষ্টিতে মাধুরী দেবীর মুখের পানে আর একবার চাহিয়া নীরবে নিরুত্তরে, এমন কি—কোনরূপ অভিবাদনের অভিনয় না করিয়াই সবেগে বাহির হইয়া গেল। এইভাবে তাহার সদম্ভ অপসৃতিই যেন আসন্ন একটা বিদ্রোহের আভাস সূচিত করিল।

কিছুক্ষণ সকলেই স্তব্ধ ভাবে বসিয়া রহিলেন। একটু পরে মাধুরী দেবী বলিলেন: এই জেঠা মেয়েটার রোগ বৌমা কিন্তু আগেই ধরেছেন। স্বামীর ওপরে ওর যত কিছু রাগ এখন সমাজের ওপরে ঝাড়তে চায়।

পরক্ষণে স্বামীর দিকে অপাঙ্গে চাহিয়া মাধুরী দেবী বলিলেন: আর তুমিও ত দিব্যি মানুষ, বৌমা'র ওপরে নিজের ঝক্কি চাপিয়ে নিজে তফাতে বসে মজা দেখছিলে!

মুখ টিপিয়া হাসিয়া হরিনারায়ণ বলিলেন: তোমার বৌমা'র ক্ষমতা ত আমার জানতে বাকি নেই, এখন—

মাধুরী দেবী স্বামীর মুখের কথাটি কাড়িয়া লইয়া বলিলেন: ওর ক্ষমতা কতখানি, সেটা জানবার জন্যে বৌমা'র সঙ্গে তর্ক বাধিয়ে দিয়ে দিব্যি নিশ্চিন্ত ছিলে? তোমার এ স্বভাব ত আমার জানতে বাকি নেই।

হরিনারায়ণ বাবু প্রসঙ্গটি পরিত্যাগ করিবার অভিপ্রায়ে চণ্ডীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন: তোমার গৌরীদি'র সঙ্গে এতক্ষণ আলাপ করে ভারি খুসি হয়েছি বৌমা! বিয়ের পরদিন অবিশ্যি দেখেছিলাম, কিন্তু সে আর কতক্ষণের জন্যে। তারপর বিদ্যাপীঠ সম্পর্কে ওঁর কৃতিত্বের কথা ভালো করেই জেনেছিলাম। দেখা করবার খুব ইচ্ছাও ছিল, লাইব্রেরীওলাদের সভায় উনি এসেছিলেনও—কিন্তু ওখান থেকেই সরাসরি চলে যাওয়ায় ভারি দুঃখ হয়েছিল—

চণ্ডী সবিনয়ে বলিল: সে কথা ত আপনাকে বলেছিলাম বাবা, স্কুলের জরুরী কাজের জন্যে ওঁকে সেদিন আটকে রাখা সম্ভব হয়নি।

হরিনারায়ণ বলিলেন: যাক্, আজ উনি এখানে আসায় আমার সে দুঃখ যেমন নেই, তেমনি এসেই উনি ক্ষণিকের আনন্দ দিয়ে আর এক গভীর বিষাদের যে আভাসও দিয়েছেন, আমার আধখানা মন তারই ভাবনায় ভরে রয়েছে। সেই যে কথা একটা আছে না—বেনো জল পুকুরে ঢুকে তার নিজস্ব জল পর্যন্ত টেনে নিয়ে গেলো। আমারো এখন

হয়েছে তাই! তুমি মা এসেছ আমার বৌমাকে নিয়ে যেতে। অবিশ্যি, এতে আমার আপত্তি করবার কিছুই নেই; কিন্তু এ-বাড়ীর সবাই জানে—বৌমাকে ছেড়ে সুস্থ-স্বচ্ছন্দ ভাবে দিনযাপন করা আমার পক্ষে আর কিছুতেই সম্ভব নয়!

চণ্ডী ও গৌরী দু'জনেই হাসিমুখে কথাগুলি শুনিতেছিল, শেষের দিকে চণ্ডীর মুখের হাসি মুখেই মিলাইয়া গিয়া মুখখানিকে যেন অন্ধকার করিয়া দিল। গৌরী বলিল: আমি সব শুনেছি বাবু, চণ্ডীকে ছেড়ে আপনার পক্ষে থাকা যেমন কষ্টকর, চণ্ডীরও ঠিক সেই অবস্থা, ওর মন-প্রাণ সমস্ত এই বাড়ী জুড়ে রয়েছে। আর, আমিও ত দুটি দিনের জন্যে ওকে চেয়েছি, তাও ওরই কাজে, ওরই স্কুলের জন্যে। এই দু' দিনের ছুটি আপনাকে হাসিমুখে মঞ্জুর করতেই হবে।

হরিনারায়ণ বলিলেন: তোমার ও-কথা মা, সত্যিই বুকে বাজে! বিয়ের পর বৌমাকে এনে আমরা নিজেদের স্বার্থই সিদ্ধি করে এসেছি; বৌমারও যে বাপের বাড়ী আছে, বাপ-মা ভাই-বোন সব আছেন—তাঁদের প্রতি শুধু বৌমার নয়, আমাদেরও কর্তব্য আছে—সে সব জেনেও মুখ বুজিয়ে থাকতে হয়েছিল মা! আজ আমার বৌমার নাম সমস্ত পরগণায় ছড়িয়ে পড়েছে, সেই বৌমা আমার যাবেন বাপের বাড়ী—এ কি 'ওঠ ছুঁড়ী তোর বে' মা?—যে, দু'-এক দিনের কড়ার ব'লে যেমন-তেমন ক'রে গেলেই হলো—লোকে জানবে না যে, হরিনারায়ণ গাঙ্গুলীর পুত্রবধূ চলেছেন; বিয়ের পর ঘর-বসত করতে এসেছিলেন, তারপর এই প্রথম ফিরে চলেছেন বাপের বাড়ীতে!

কথাটা শুনিয়া গৌরী ও চণ্ডী দু'জনেরই বুকের ভিতরটা যেন ঝাঁৎ করিয়া দুলিয়া উঠিল। বৃদ্ধের অনুভব-শক্তির সঙ্গে আসন্ন সম্ভাবনার এই অদ্ভুত সাদৃশ্যে উভয়েই যুগপৎ বিস্ময়াপন্ন হইয়া ভাবিল—ইনি যদিও অনবগত যে, ইঁহার অজ্ঞাতেই কুলবধূর এই ভাবে আকস্মিক যাত্রার

পিছনে অতি সংগোপনে এক সামরিক আয়োজন চলিয়াছে এবং তাহার বিচিত্র কাহিনী সমগ্র জেলাবাসীর অন্তরে চাঞ্চল্যের কিরূপ শিহরণ তুলিবে—তথাপি তাঁহার অন্তরেও কি স্বাভাবিক ভাবেই এই আড়ম্বরময় কৌলিক খানদানির কথাই জাগ্রত হইতেছিল? বৃদ্ধের এই চিন্তাই কি নেপথ্যে চিন্তার অতীত এক সাংগ্রামিক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে রূপ পরিগ্রহ করিতেছিল? এ প্রশ্নের উত্তর কে দিবে?

সহসা মনে মনে কি ভাবিয়া হরিনারায়ণ মাধুরী দেবীর দিকে চাহিয়া ব্যগ্র ভাবে বলিলেন: তরলা এসে বাজে কথা তুলে অনেকটা সময় আমার নষ্ট করে গেলেন। তুমি এখন সামলা ছেড়ে বৌমার যাবার ব্যবস্থা করে ফেল। শুনলাম, কালই শ্যামাপুরে গিয়ে না পৌছিলে ওঁদের কাজের শুভক্ষণটি নাকি পাবেন না।

মাধুরী বলিলেন: আমার ব্যবস্থা ঠিক আছে, তুমি ওদিককার তোড়-জোড় যা করবার বাপুলী মশাইকে ডেকে বরং বলে দাও। বৌমা ত আর নিজের যাবার আয়োজন নিজে করবেন না!

গৌরী বলিল: দেখুন, আপনাদের ও-সব খানদানি ব্যাপার এখন নাই বা করলেন! শুন্‌লেন ত, স্কুলের কাজে তাড়াতাড়ি যেতে হচ্ছে, ও-সব না হয় পরে—

মাধুরী দেবী বলিলেন: সে কি হয় মা? স্কুলের কাজে গেলেও আমরা বুঝবো, বৌমা বাপের বাড়ীতেই যাচ্ছেন, আর এই ওঁর প্রথম যাওয়া। কাজেই নেম-কর্ম আমাকে করতে হবে বৈ কি মা! তবে একটা কথা বলি, বৌমার তুমি যখন বোনেরই মত দরদী, তোমার সামনেই বলছি—এখন বৌমাকে যেন আটকে রেখ না মা, এর পর ধীরে-সুস্থে গিয়ে না হয় দশ দিন থাকবেন। কিন্তু এখানে কি রকম শিরে-সংক্রান্তি অবস্থা—এইমাত্র ত শুনলে মা? বৌমা এ-বাড়ীতে প্রথম যখন আসেন—নিজের মুখেই বলছি মা, অবুঝ ছেলের পক্ষে নিয়ে ওঁকে খাটো করতে চেয়েছিলাম।

তার ফলও হাতে-হাতে পেয়েছি। কিন্তু মা, ছেলের মুখ চেয়ে সম্প্রতি নিজের হাতে যে গাছ পুতেছিলাম, সেই গাছে দেখছি বিষের ফল ধরেছে। এখন শাশুড়ী বৌকে কোমর বেঁধে দাঁড়াতে হবে ঐ বিষ থেকে এই সংসার, এই গ্রাম, এই সমাজকে রক্ষা করবার জন্যে। এক দিন ছেলের পক্ষ নিয়ে বৌমার সঙ্গে বোঝা-পড়া করতে চেয়েছিলাম, আজ বৌমাকে নিয়ে সেই অবুঝ ছেলেকে ঐ বিষ-কন্যার ছোঁয়াচ থেকে বাঁচাতে হবে ; সেই জন্যেই বাপের বাড়ীর মায়া কাটিয়ে বৌমাকে তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে মা !

চণ্ডীর সমগ্র অন্তর ব্যাপ্ত করিয়া অপূর্ব্ব এক পুলক-প্রবাহ যেন বহিয়া গেল। তাহার মনে হইল, শ্বশুরের সহিত বোঝা-পড়া শেষ করিয়া সর্বসমক্ষে অভিনবরূপে স্বামীর সুপ্রকাশের দিন যে আনন্দ তাহাকে অভিসিঞ্চিত করিয়াছিল, আজ সেই পরম পূজনীয় শ্বশুরের সমক্ষে এ বাড়ীর গৃহিণীর মুখে অপ্রত্যাশিত ভাবে তাঁহার অন্তর্নিহিত এই দরদ ভরা অভিব্যক্তিও তাহাকে সেইরূপ আনন্দে অভিভূত করিল। সঙ্গে সঙ্গে চণ্ডীর পদনখরপ্রান্ত হইতে সীমন্তের সিন্দুর-রঞ্জিত কেশমূল পর্যন্ত আনন্দে কণ্টকিত হইয়া উঠিল ; পরক্ষণে সে তাহার অঞ্চলটি গলায় দিয়া মাধুরীর পদতলে হেঁট হইয়া বসিয়া ভাবার্দ্র কণ্ঠে বলিল : মা ! আজ অতি শুভক্ষণে আমার পক্ষে রাত্রি প্রভাত হয়েছিল ; আজ বুঝছি—শ্বশুরবাড়ী আসা আমার সার্থক হয়েছে, আমি আজ আমার মাকে ফিরে পেয়েছি। এখন আমি এক মায়ের পায়ে গড় করে আর এক মায়ের কাছে মুখ উঁচু করে যেতে পারবার মত শক্তি পেয়েছি। আমার জীবন আজ ধন্য, সাধনাও পূর্ণ হলো মা !

উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কথাগুলি বলিতে বলিতে সে মাধুরী দেবীর পদতলে মাথাটি নত করিতেই তিনিও পাগলিনীর মত ব্যাকুল ভাবে উঠিয়া দুই হাতে বধূকে তুলিয়া বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিলেন।

বাইশ

শ্যামাপুর মহালটি বাশুলী স্টেটের অন্তর্ভুক্ত একটি বৃহৎ ও সমৃদ্ধ তালুক। সাতকড়ি সামন্ত নামে বিষয়-বুদ্ধি-সম্পন্ন এক বিচক্ষণ ব্যক্তি দীর্ঘকাল ধরিয়া তহশীলদাররূপে এখানে বাহাল আছে। ফটিক পাল ও শীতল রায় নামে দুই জন মুহুরী, তিন জন পিয়াদা এবং পাইক, খিতমৎদার, ভৃত্যাদি লইয়া অতিরিক্ত আরও সাত-আট ব্যক্তি তহশীলদার নায়েবের অধীনে এখানে কাজ করিয়া থাকে। বিস্তীর্ণ কাছারী বাড়ীতেই তাহারা বসবাস করে এবং স্টেটের ব্যয়ে তাহাদের আহারাদি নির্বাহ হয়। বাশুলী স্টেটের অন্যান্য কাছারীগুলির মত এখানেও বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড, দীর্ঘিকা, ঝিল, বাসোপযোগী বড় বড় বাড়ী দর্শনীয় বস্তুরূপে বাশুলীর ভূস্বামীদের উদ্দেশে বহু বর্ষ ধরিয়া প্রজাদের সম্ভ্রম আকর্ষণ করিয়া আসিতেছে।

যে-সকল গুণ থাকিলে মফঃস্বলের তহশীলদারগণ সদরে অবস্থিত জমিদার-প্রভুর মনোরঞ্জন করিয়া বাহাল-তবিয়তে খোসমেজাজে ও পরম সুখ-শান্তিতে এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলবাসী আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার উপর প্রভুত্ব করিতে পারে, সেই গুণগুলির প্রত্যেকটিকে ভূষণস্বরূপ করিয়া সুকৌশলী সাতকড়ি সামন্ত হরিনারায়ণ গাঙ্গুলীর মত দুর্ধর্ষ ভূস্বামীর একান্ত বিশ্বস্ত কর্মচারীরূপে চিহ্নিত হইতে পারিয়াছিল। ফলে, প্রজামহলের অবিদিত ছিল না যে, সাতকড়ি সামন্তের অজ্ঞাতে সদরে খোদ জমিদার হুজুরের সেরেস্তায় কোন দরখাস্ত দাখিল করিলেই তাহা 'ঘোড়া ডিঙ্গাইয়া ঘাস খাওয়ার' পর্যায়ে পড়িবে এবং সামন্তের কূটনীতির প্যাঁচে তাহা ত বানচাল হইবেই, সেই সঙ্গে দুঃসাহসী দরখাস্তকারীর দুর্গতির অন্ত থাকিবে না। সদর সেরেস্তার আমলাদের সহিত সাতকড়ি সামন্তের এরূপ ঘনিষ্ঠ দহরম-মহরম যে, সেখানে তাহার বিরুদ্ধে নালিশ করিয়া কেহই এ পর্যন্ত সাফল্য-

লাভ করিতে পারে নাই। হয়, দরখাস্তগুলি আশ্চর্য ভাবে অদৃশ্য হইয়া যায়, নয় ত, নালিশের সঙ্গে সঙ্গে তাহার নকল সামন্তের হাতে আসিয়া তাহাকে সতর্ক করিয়া দেয়; তখন কুটনীতি ও প্রতিপত্তির প্রভাবে অভিযোগ মিথ্যা প্রতিপন্ন করা তাহার পক্ষে কঠিন হইয়া উঠে না। এরূপ অবস্থায় তালুকের প্রজাবর্গ সাতকড়ি সামন্তকেই তাহাদের ক্ষমতাশালী ভূস্বামী ভাবিয়া সর্বতোভাবে তাহার তুষ্টিবিধানে সচেষ্ট থাকিত। সাতকড়িও জমিদারের মত প্রচণ্ড দাপটে এই বিস্তীর্ণ তালুকটির উপর তাহার প্রভুত্বের শকট চালাইয়া সকলকে অবাক করিয়া দিত। আবার, অন্ধভাবে সামন্তের তোষামোদে অভ্যস্ত—এই তালুকের মধ্যেই এমন বহু ব্যক্তির সন্ধান মিলিবে। সামন্ত যে কূটনীতিতে পরিপক্ক—এ-কথা আগেই বলা হইয়াছে। সে বুঝিয়াছিল, বিস্তীর্ণ একটা অঞ্চলের উপর প্রভুত্ব বজায় রাখিতে হইলে ভেদনীতিকে সেখানে অস্ত্ররূপে গ্রহণ করিতে হয়। কাজেই সামন্ত বাছিয়া বাছিয়া সকল শ্রেণী হইতেই এমন কতকগুলি ক্ষমতাশালী ব্যক্তিকে মুঠার মধ্যে আনিয়াছিল, সমাজে যাহাদের শক্রর অভাব নাই। নায়েব মহাশয়ের সাহায্য পাইবার আশায় তাহারা একেবারে বর্তাইয়া যায়; নায়েব মহাশয়ও তাহাদিগকে অভয় দিয়া দলভুক্ত করিয়া লয়। অথচ, এই ঘনিষ্ঠতার কথা তাহারা যাহাতে ব্যক্ত না করে, সে সম্বন্ধেও তাহাদের প্রতি কড়া নির্দেশ থাকে। এই ভাবে সাতকড়ি সামন্ত তালুকের একটি বৃহৎ অংশকে এমন ভাবে তাহার দলভুক্ত করিয়া ফেলে যে, তাহার বিরুদ্ধে কোন কথা বা আন্দোলন উঠিলে ইহারাই সর্বাগ্রে তাহার প্রতিরোধ করিতে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া যায়। নায়েবের অজ্ঞাতে এই তালুক হইতে কোন দরখাস্ত সদরে দাখিল হইলে, তাহার পরেই নায়েবের অনুকূলে অধিক সংখ্যক লোকের স্বাক্ষরযুক্ত দরখাস্ত সদর সেরেস্তায় উপনীত হইয়া পূর্বের দরখাস্তকে বরখাস্ত করিতে কর্তৃপক্ষকে বাধ্য করে। সংখ্যাগরিষ্ঠ দলকে অগ্রাহ্য করিতে তাঁহারাও কুণ্ঠিত হন—যখন দেখা যায় যে,

তালুকের অধিকাংশ লোকই নায়েব সাতকড়ি সামন্তের পক্ষপাতী ও গুণানুরাগী।

এ-হেন প্রতিপত্তিশালী সুকৌশলী নায়েব সাতকড়ি সামন্তের প্রবল প্রতাপে বাধা দিয়া অপ্রত্যাশিত ভাবে বিপর্যয় উপস্থিত করে সর্বপ্রথমে শ্যামাপুরের অন্যতম সম্রান্ত প্রজা কবিরাজ করালী চট্টোপাধ্যায়ের কুমারী কন্যা চণ্ডী। সমগ্র তালুকের প্রজাবর্গ যে-নায়েব মহাশয়ের রক্তচক্ষু দেখিয়া সভয়ে শিহরিয়া উঠে, এই বালিকাই তাহার চক্ষুর উপরে তর্জনী তুলিয়া বলিষ্ঠ কণ্ঠে জানাইয়া দেয়—এ আপনার অন্যায়, মানুষ কখন মানুষের অন্যায় সহ্য করিতে পারে না।

চণ্ডী তখন পাঞ্জাব হইতে শ্যামাপুরে পিত্রালয়ে ফিরিয়া আসিয়াছে। কতকগুলি ব্যাপারে এই অঞ্চলে অন্যায় ও অনাচার দেখিয়া চণ্ডীর চিত্ত বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠে এবং তাহার প্রকৃতিসিদ্ধ সাহসিকতায় সে প্রতিকারে বদ্ধপরিকর হয়। প্রথমেই সে পল্লীবাসিনী নিম্নশ্রেণীর অবীরাদের উপার্জনের বাধা সরাইয়া দেয় বহিরাগত ফিরিওয়ালাদের চালানী ব্যাপার বন্ধ করিয়া। ইহারা বড়-বড় ঝাঁকায় ভরিয়া বাহিরের ভেজাল খাবার ও আনাজ-পত্রাদি আনিয়া পল্লী মধ্যে ফিরি করিয়া ব্যাপার চালাইতে আরম্ভ করায়, এই অঞ্চলবাসিনী নিম্নশ্রেণীর নারীদের বেসাতি বন্ধ হইবার উপক্রম ঘটে। পল্লীজাত অল্প-স্বল্প টাটকা তরি-তরকারী সংগ্রহ করিয়া বাড়ী-বাড়ী যোগান দিয়া কোন রকমে ইহাদের জীবিকা নির্বাহ হইত। বাহিরের পুরুষ ফিরিওয়ালাদের প্রাদুর্ভাব ঘটায় ইহারা বিপন্ন হইয়া পড়িলে চণ্ডী ইহাদের পক্ষ সমর্থন করে। প্রথমে সে ফিরিওয়ালাদিগকে ভালো করিয়া মিষ্ট কথায় বুঝাইয়া বলে যে, তাহারা গ্রামাঞ্চলে ফিরি না করিয়া গঞ্জে বা হাটে বসিয়া তাহাদের মালপত্র বিক্রয়ের ব্যবস্থা যেন করে। কিন্তু সেই যুক্তি তাহারা উপেক্ষা করায় তাহার যে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়, তাহাতে নানা ভাবে নাস্তানাবুদ হইবার পর

শ্যামাপুরের ত্রিসীমায় ঝাঁকা লইয়া প্রবেশ করিতে আর তাহাদের সাধ্যে কুলায় নাই।

ইহার পরেই চণ্ডীর দৃষ্টি পড়ে শ্যামাপুরের মিশনারী বালিকা-বিদ্যালয়টির উপরে। পল্লীর শিশুদের মুখে যীশুর গুণকীর্তন-প্রসঙ্গে হিন্দুর দেবদেবীদের উদ্দেশে রচিত কুৎসিত ছড়া শুনিয়াই সে শিহরিয়া উঠে এবং জানিতে পারে যে, স্থানীয় বালিকা-বিদ্যালটিই উহার উৎসস্বরূপ। চণ্ডী জানিতে পারিল, চর্চ মিশন সোসাইটি বালিকাদের বিনা ব্যয়ে শিক্ষা দিবার জন্য শ্যামাপুরে বিদ্যালয় নির্মাণ করাইয়া মিস্ খৃষ্টকুমারী নাম্নী ধর্মান্তরিতা এক খৃষ্টান শিক্ষয়িত্রীর উপর ইহার পরিচালন ভার অর্পণ করিয়াছেন। বাঙলা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে উক্ত খৃষ্টান সোসাইটির অর্থপুষ্ট বিদ্যালয়গুলি হইতে পল্লী-বালিকাদের মধ্যে শিক্ষার আলোকপাত হইয়া থাকে। অবশ্য সোসাইটির কর্তৃপক্ষগণ শিক্ষয়িত্রীদিগকে এরূপ নির্দেশ দেন নাই যে, শিক্ষা বলিতে কেবল মাত্র বাইবেলই পড়ানো হইবে এবং যীশুর গুণকীর্তনের সঙ্গে হিন্দুর দেবদেবীদের কাহিনী বিকৃত করিয়া নানারূপ ছড়া বাঁধিয়া ছাত্রীদিগকে কণ্ঠস্থ করিতে দিবে। সকল শিক্ষয়িত্রীর প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি ত আর একই রকমের নহে ; বিশেষতঃ লক্ষ্য করা গিয়াছে যে, নিম্নশ্রেণীর লোক দুঃখ-কষ্ট পাইয়া বা নিপীড়িত হইয়া অন্য ধর্ম অবলম্বন করিলে সাধারণতঃ পূর্বধর্মের প্রতি অতিমাত্রায় বিদ্বেষী হইয়া থাকে এবং ইহারাই কোন সূত্র পাইলেই পরিত্যক্ত ধর্মের কুৎসা রটাইয়া পরম তৃপ্তি পায়। স্থলবিশেষে প্রভুস্থানীয় কর্তৃপক্ষের মনোরঞ্জনের অভিপ্রায়েও ইহাদিগকে এতটা হঠকারী হইতে দেখা যায়। শ্যামাপুর মিশনারী বালিকা-বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী মিস্ খৃষ্টকুমারী এই শ্রেণীর এক শিক্ষয়িত্রী।

খৃষ্টকুমারী দক্ষিণ-বাঙলার কাকদ্বীপ অঞ্চলের এক বাগ্‌দীর কন্যা। পিতার নাম মুচিরাম সিংহ। ইহার পূর্বপুরুষ নাকি বর্গীর হাঙ্গামার সময় নবাবের পক্ষে লড়াই করিয়া সিংহ উপাধি পাইয়াছিল। তদবধি এই

বংশের সকলেই নবাব-দত্ত উপাধিকে কৌলিক পদবী করিয়া দক্ষিণ অঞ্চলের জমিদার-সরকারে পাইক-লাঠিয়ালরূপে কুল-পুরুষের পেশার অনুসরণে দুধের সাধ ঘোলে মিটাইয়া আসিয়াছে। মুচিরামের পিতাই প্রথমে পৈতৃক পেশার মোহ কাটাইয়া মাছের ব্যবসায় সুরু করে। মাথা ঘুরাইয়া জাল ফেলিতে এবং জলাশয়ের ডোল মধ্যে লুক্কায়িত মৎসকুল পাকড়াও করিতে তাহার নাকি জুড়ি ছিল না। মুচিরাম মাথা ঘুরাইয়া জালে মাছ ধরার পরিবর্তে মাছ ধরিবার দেশীয় যন্ত্রপাতি নির্মাণের কাজে লাগিয়া পড়ে। তাহার হাতের তৈয়ারী ঘুণি, পোলো, আটল, ঝাঁঝরি প্রভৃতি বাজারে খুব আদৃত হয়। এই ব্যবসায়ে পয়সার মুখ দেখিয়া মুচিরাম মাতৃহীন শিশু পুত্র-কন্যাকে স্থানীয় মিশনারী বিদ্যালয়ে ভর্তি করিয়া দেয়। ছেলের নাম হরিরাম, আর মেয়েটির ভালো নাম ক্ষীরোদা হইলেও ক্ষীরি নামেই সে পরিচিত হইয়া উঠে। হরি যখন দশ বছরে পড়িয়াছে, এবং ক্ষীরির বয়স চলিয়াছে মাত্র সাত বছর, সেই সময়ে সহসা মুচিরাম সর্পদষ্ট হইয়া মারা পড়ে; ছেলে-মেয়েকে খৃষ্টানী স্কুলে পড়িতে দেওয়ায় মুচিরামের আত্মীয়-স্বজন ও স্বজাতীয় প্রতিবেশীরা তাহার প্রতি প্রসন্ন ছিল না। পিতৃহীন পুত্র-কন্যাকে কেহই আশ্রয় দিতে বা তাহাদের অভিভাবকত্ব স্বীকার করিতে সম্মত না হওয়ায় মিশনারী বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ তাহাদের ভার গ্রহণ করেন। ইহার পর পিতৃহীন ভ্রাতা-ভগিনীকে চর্চ মিশন সোসাইটির অপর এক কেন্দ্রে পাঠান হয়। সেখানকার পাদরী পরিচালক মরিনো সাহেব ভ্রাতা-ভগিনীকে খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করিয়া সোসাইটি কর্তৃক ব্যাপ্টাইজড্ শরণার্থী দলের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লন। তখন হইতে হরিরাম 'হেরিস' এবং ক্ষীরোদা 'খৃষ্টকুমারী' নামে পরিচিত হয়। ফলে, সোসাইটির রেজিষ্টারী খাতায় এবং স্কুলে এই নামই চালু হইয়া যায়। তখন হইতে ইহাদের খাওয়া-পরা ও পড়া-শোনা সম্বন্ধে কোন চিন্তার কারণ ঘটে না—নির্ভাবনায় ও নিরুদ্বেগে পল্লীর

নিকৃষ্ট পরিবেশে জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত বাগ্‌দী-নন্দন-নন্দিনীর জীবনের গতি মিশনারীদের নিয়মনিষ্ঠ আদর্শে স্বতন্ত্র পথ অবলম্বন করে। কিছু কাল পরে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে খৃষ্টকুমারীকে খৃষ্টধর্ম-প্রচারিকার পদে মিশন কর্তৃপক্ষ যেমন মনোনীত করেন, তেমনি বি-এ পাশ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই বিশেষ ভাবে সুপারিশ করিয়া হেরিসকে আই, সি, এস পরীক্ষা দিবার জন্য বিলাতে পাঠাইয়া দেন। চর্চ মিশন সোসাইটির সুপারিশের জোরে হেরিস ওরফে এইচ সিন্‌হা সাহেবের পক্ষে কার্যারম্ভের সূচনাতেই প্রেসিডেন্সী বিভাগের মহকুমায় হাকিম হইয়া আসা দুরূহ হয় নাই। প্রচারিকার কার্যে দক্ষতা প্রদর্শনের ফলে খৃষ্টকুমারীও প্রেসিডেন্সী বিভাগের অন্তর্গত শ্যামাপুরের মিশনারী বালিকা-বিদ্যালয়ে হেডমিষ্ট্রেস হইয়া আসে। তাহার দপদপায় শুধু বালিকা-বিদ্যালয়টি নহে—সমগ্র অঞ্চলটি যেন ত্রস্ত হইয়া উঠে। সে যে অত্যন্ত প্রতিপত্তিশালী খৃষ্টান সোসাইটির মেয়ে, পদস্থ রাজপুরুষদের সঙ্গে তাহার বিশেষ দহরম-মহরম, তাহার ভ্রাতাও যে শীঘ্রই জেলার হাকিম হইয়া আসিতেছে—এ সব কথা খুব জাঁক করিয়া সে স্কুলের দাসী, চাপরাসী, অধীনস্থ শিক্ষয়িত্রী ও ছাত্রীবর্গ হইতে আরম্ভ করিয়া এ অঞ্চলের সংশ্লিষ্ট মহলের মধ্যে সগর্বে প্রচার করিয়া বিশেষ আত্মপ্রসাদ অনুভব করিত। বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের অধ্যয়নেও অনেক পরিবর্তন ঘটাইল। মাষ্টারী করিবার আগে সে খৃষ্টধর্ম প্রচার করিয়া বেড়াইত—শিক্ষার ব্যাপারেও তাহা প্রতিপন্ন করিল; ফলে, পাঠ্যপুস্তক পড়ানো ব্যাপারটাই গৌণ হইয়া দাঁড়াইল এবং প্রাধান্য পাইল খৃষ্টধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব বিশেষ ভাবে প্রচার করা। পল্লী-অঞ্চলের মেয়েরা এ-সব ব্যাপারে প্রতিবাদের কথা ভাবিতেই পারে না—নবাগতা মেমদিদি তাহাদের দৃষ্টিতে কোন এক মহিমান্বিতা মানবী—সহসা সামনাসামনি হইলেই তাহাদের সর্বাঙ্গ কাঁপিয়া উঠে; অম্লান বদনে তাহারা তোতা পাখীর মত শিখানো কথা কণ্ঠস্থ করে। অভিভাবকগণও গ্রাহ্য করেন না—কন্যাদের মুখে স্বধর্মের নিন্দা এবং পরধর্ম সম্পর্কে

অহেতুক প্রশস্তি শুনিয়াও নীরব থাকেন। বিনা বেতনে মিশনারীরা পল্লী-বালিকাদের মধ্যে শিক্ষা বিতরণ করেন—যীশুখৃষ্টের জন্মদিন উপলক্ষে কত লোভনীয় দ্রব্য উপহার দেন ; প্রতি বর্ষে পুরস্কার দিবার কি ঘটা—ফেল করিলেও মেয়েরা দুঃখে ফুলকোমুখা হইয়া ফিরিয়া আসে না, তাহাদেরও কিছু-না-কিছু মনোহর খেলনা দিয়া খুসী করা হয় ; এ অবস্থায় যদিই তাহারা খৃষ্টধর্মের কথা শুনায় বা আমাদের ধর্মের নিন্দাই করে—তাহাতে কি এমন আসিয়া যাইবে ? কিন্তু তাহাদের এই ভুল চোখে আঙ্গুল দিয়া ভাঙ্গিয়া দিবার জন্য সত্যই যে এক দিন একটি মেয়ে এ গ্রামে আসিবে এবং তাহার দাপটে সারা গ্রামখানি শিহরিয়া উঠিবে, এ-কথা কেহ কি স্বপ্নেও ভাবিয়াছিল ?

আগেই বলা হইয়াছে, চণ্ডী এক সুযোগ্য সহকর্মিনীর সাহায্য পাইয়াছিল, তাহার নাম গৌরী। ক্রমে সে সুকৌশলে বিভিন্ন শ্রেণীর কতকগুলি স্বাস্থ্যবতী বলিষ্ঠা মেয়েকে তাহার দলভুক্ত করিয়া লয়—তাহারা চণ্ডীর একান্ত বাধ্য ও অনুরক্ত হইয়া উঠে। গ্রামের বারোয়ারী তলাটি ইদানীং ক্রিয়াকলাপের অভাবে জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল ; তাহার পিছনেও অনেকখানি জমি দীর্ঘকাল ধরিয়া ‘পতিত জমিরূপে’ বাতিল হইয়া থাকে। জঙ্গলময় এই বিস্তীর্ণ অঞ্চল লইয়া চণ্ডী তাহার পরিকল্পিত কর্মক্ষেত্র রচনায় আত্মনিয়োগ করিল। সহায় হইল তাহার সহচরী গৌরী এবং গুটি পনেরো বালিকা। ইহাদের মধ্যে চাষী-মজুরদের ঘরের মেয়েই বেশী ছিল। এক দিন গ্রামের সকলে অবাক-বিস্ময়ে দেখিল—কুঠার, কোদাল, কাটারি, কাস্তে লইয়া এক মেয়ে-পল্টন জঙ্গল পরিষ্কার করিতে লাগিয়া গিয়াছে। সোঁদাল, বাবলা, খিরিস প্রভৃতি শাখা-প্রশাখা-যুক্ত বড় বড় আগাছাগুলি ছিন্নমূল হইয়া দূর-দাড় শব্দে ভূপতিত হইতেছে, সঙ্গে সঙ্গে মাটি খুঁড়িয়া তাহাদের শিকড় পর্যন্ত তুলিয়া ফেলিয়া জমিকে সমতল করিবার অপরূপ পাট চলিয়াছে। কি উদ্দেশ্যে বহু দিনের এই পোড়ো জমির জঙ্গল ভাঙিয়া

পরিষ্কার করা হইতেছে, সে কথা চণ্ডী প্রকাশ করে নাই; এখন অনু-সন্ধিৎসু মহল হইতে এই সম্পর্কে নানারূপ প্রশ্ন উঠিল। চণ্ডী সহজ ভাবে জানাইল: গ্রামের ভালোর জন্যেই এ জঙ্গল ভাঙা হচ্ছে—অন্ধকার ঘুচে আলো ফুটবে, সাপ-খোপের ভয় থাকবে না, আর গ্রামের মেয়েদের একটা আস্তানা হবে।...গ্রামের লোক বুঝিল, মেয়েদের লইয়া এই পণ্ড-শ্রমের আসল মতলব হইতেছে তাহাদের একটা খেলা-ঘরের ব্যবস্থা করা। এই মেয়েটা যে ছেলেদের মতন বে-পরোয়া হইয়া সব কাজে আগাইয়া যাইতে চায়, সে পরিচয় আগেই তাহারা পাইয়াছিল। কিন্তু গ্রামের একাংশে যে বিস্তীর্ণ ভূভাগটি গ্রামবাসীদের পক্ষে বিভীষিকাস্বরূপ হইয়াও বহু বৎসর যাবৎ এই ভাবে পড়িয়া আছে, এই মেয়েটি যে দলবল লইয়া কোমর বাঁধিয়া তাহার রূপান্তর ঘটাইতে আগাইয়া আসিবে, ইহা কেহ ধারণা করিতেও পারে নাই। বিশেষতঃ, শ্যামাপুর গ্রামের সৃষ্টিকাল হইতেই এই পতিত জমির ব্যাপারে কাহাকেও বন্দোবস্ত করিতে দেখা যায় নাই। ইহার মালিকান-স্বত্ব সম্বন্ধে গোলমাল থাকায় মামলা-মকদ্দমার ভয়ে এই জমি কেহ ক্রয় করিতে বা জমা-বন্দোবস্ত করিতে সাহস পায় নাই। গ্রামবাসীদের মতে ইহা ইজমালী জমি—এই ভূভাগের চারি পাশে যাহাদের জমি আছে, তাহাদের কিছু-না-কিছু অংশ ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট আছে। পক্ষান্তরে, জমিদার সেরেস্তার চিঠায় এই সমগ্র জমিই 'জঙ্গল বুড়ী-বন্দ' নামে চিহ্নিত ও নির্দিষ্ট থাকায় জমিদার সরকার ইহার মালিকান-স্বত্বের ষোল আনাই দাবী করেন এবং রাস্তার দিকে এই জমির কিছুটা সমতল অংশে পূর্বে যখন বারোয়ারী উৎসব হইত, তজ্জন্য তৎকালে গ্রাম-বাসিগণ জমিদার সরকারের মঞ্জুরী লইয়া জমিদারের পূর্ণ স্বত্বাধিকার স্বীকার করিয়াছিলেন। সেই জন্য বিস্মিত গ্রামবাসিদের পক্ষ হইতে পুনরায় প্রশ্ন উঠিল চণ্ডীর উদ্দেশে: জঙ্গল ভাঙ্গার মঞ্জুরী পেয়েছ?

চণ্ডী বলিল: মঞ্জুরী!

মুখের ভঙ্গি বিকৃত করিয়া গ্রাম্য মাতব্বর জানাইয়া দিলেনঃ এ হচ্ছে জমিদারের জমি, এখানকার নায়েব মহাশয়ের সঙ্গে বন্দোবস্ত না করে এতে হাত দিলেই কিন্তু ফ্যাঁসাদে পড়তে হবে।

অবজ্ঞায় ঠোঁট দু'টি উলটাইয়া চণ্ডী বলিল ঃ জঙ্গল ভেঙ্গে জমি লাগাচ্ছি গ্রামের কাজে—এই যথেষ্ট, এর জন্যে আবার বন্দোবস্ত করব কি! আমাদের কাজ দেখলে আর উদ্দেশ্য শুনলে খুসি হয়েই জমিদার জমি ছেড়ে দেবেন।

এই ধরণের কথা শুনিতে—বিশেষত কোন মেয়ের মুখে—গ্রামের মাতব্বর ব্যক্তিরাও অভ্যস্ত ছিলেন না, তাঁহারা বিস্ময়াপন্ন অবস্থায় ইহার পরিণাম প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

জঙ্গলের একটি বৃহৎ অংশকে পরিষ্কৃত করিয়া সেই স্থানটিকে অভিনব ব্যবস্থায় চণ্ডী একটি চমৎকার আশ্রম করিয়া ফেলিল। এই স্থানটির এক দিকে বহু শাখা-প্রশাখাযুক্ত সুবৃহৎ একটি নিম গাছ ছিল। সেই গাছের নিচে সর্বাগ্রে চণ্ডী তাহার নূতন পাঠশালা বসাইল। নিম গাছের প্রকাণ্ড কাণ্ডের সামনের দিকের কিছুটা ছাল ছাড়াইয়া তাহার উপর কালো রঙ উপর্য্যুপরি কয়েক বার লাগাইয়া লিখিবার বোর্ডে পরিণত করিল। তাহার পর পরিষ্কৃত স্থানটি মাটি ও গোময়ের প্রলেপ দিয়া এমন ঝকঝকে ও পরিচ্ছন্ন করিয়া লইল যে, দেখিবামাত্র মনে হয় যেন কোন গৃহস্থ বাড়ীর অন্দরমহলের বর্ধিষ্ণু উঠান। জঙ্গলের গাছ-পালা বাঁশ-কঞ্চি দিয়া বিস্তীর্ণ স্থানটিকে সুদৃঢ় ভাবে ঘিরিয়া দ্বারপথে আগল লাগাইল—গরু-বাছুর এবং বাহিরের লোক-জন যাহাতে অনায়াসে আসিয়া পড়া-শোনায় ব্যাঘাত ঘটাইতে না পারে। সঙ্গিনীরূপে যে মেয়েগুলি চণ্ডীকে সাহায্য করিতেছিল, তাহাদের অধিকাংশই নিরক্ষর। ইহাদিগকে লইয়াই চণ্ডী তাহার পাঠশালার কাজ আরম্ভ করিল

এবং শিক্ষাদান ব্যাপারে গৌরী হইল তাহার সহকারিণী। নিম গাছের কাণ্ডকে কালো বোর্ড করিয়া এবং তাহাতে খড়ি দিয়া এক-একটি অক্ষর লিখিয়া এমন এক অভিনব প্রণালীতে চণ্ডী তাহার নিরক্ষর ছাত্রীদিগকে অক্ষর পরিচয় করাইতে লাগিল যে, ছাত্রীরা তাহার মধ্যে চিত্তাকর্ষক গল্পের আস্বাদ পাইয়া বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হইয়া পড়িল। পরদিন হইতেই কৌতূহলী বালিকারা অনাহূত ভাবে আসিয়া পাঠশালার উঠানে বিছানো চাটায়ের উপর বসিয়া গেল চণ্ডীদি'র গল্প শুনিতে। যাহাদের অক্ষর পরিচয় হইয়া গিয়াছে, বানান শিখিয়াছে, কিম্বা যাহারা লেখা-পড়ায় আরো অগ্রসর হইয়াছে, তাহাদের পড়ার প্রণালীও গল্পকে আশ্রয় করিয়া চলিতে থাকায়—বড়দের পড়ানোও ছোটরা সাগ্রহে শুনিয়া যেমন আনন্দ পায়, ছোটদের পড়াইবার সময় বড়রাও তেমনই সানন্দে উৎকর্ণ হইয়া থাকে। বর্ণ-পরিচয় হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বিতীয় ভাগ, পদ্যপাঠ, কথামালা, বোধোদয়, ভূগোল, ইতিহাস, অঙ্ক—যাহা কিছু পড়ানো হয়, প্রতিটি এমন মিষ্ট গল্পের মাধ্যমে যে, বালিকারা ভাবে তাহারা গল্প শুনিতেছে; অথচ তাহার মধ্যে তাহাদের শিক্ষনীয় কথাগুলি অন্তরের রন্ধ্রে-রন্ধ্রে বসিয়া ধীরে-ধীরে অগ্রসর হইতেছে। প্রথম দিনেই গাছতলায় বসানো চণ্ডীর এই পাঠশালার কথা পাড়ার মেয়েদের মধ্যে প্রচারিত হইয়া তাহাদিগকে প্রলুব্ধ করিয়া তুলিল এবং পাকা বাড়ীর ভিতরে নানা রকম জাঁক-জমকের সঙ্গে চালিত মিশনারী বিদ্যালয়ের ছাত্রীপূর্ণ বেঞ্চিগুলির মধ্যে ফাঁক পড়িতে লাগিল দ্বিতীয় দিন হইতেই।

তৃতীয় দিনে যথা সময় চণ্ডীর পাঠশালা বসিয়াছে, এমন সময় জমিদারী কাছারীর নায়েব সাতকড়ি সামন্তের হুকুম বহন করিয়া আনিল তাহার অন্তরঙ্গ অনুচর রাখাল বক্সী। কৌতূহলী লোক জন যাহাতে মানুষ-প্রমাণ উঁচু বেড়া দিয়া ঘেরা আঙ্গিনায় অনায়াসে ঢুকিয়া পড়া-শোনায় বিঘ্ন

ঘটাইতে না পারে, তজ্জন্য প্রবেশ-দ্বারের জাফরি দেওয়া আগল বা দরজাটি বন্ধ করিয়া পড়ার কাজ চালানো হইয়া থাকে। বেড়ার বাহিরে দাঁড়াইয়া ভিতরটি যেমন দেখা যায়, পড়া শুনিতেও অসুবিধা হয় না। পাড়ার অনেকেই বাহিরে দাঁড়াইয়া চণ্ডীর এই আশ্চর্য্য রকমের পড়া শুনিয়া থাকে এবং শুনিতে শুনিতে শ্রোতারা মুগ্ধ না হইয়া পারে না। রাখাল বক্সী দম্ভ ভরে আসিয়া দেখিল, সাত-আট জন লোক এই ভাবে সাগ্রহে পড়া শুনিতেছে। চণ্ডী তখন গাছের কাণ্ডে নির্ম্মিত কালো বোর্ডে সাদা খড়িতে খুব বড় করিয়া 'ই' লিখিয়া এই অক্ষরটিকে এইভাবে বুঝাইতেছিল:

'অ' আর 'আ' তোমরা চিনেছ। ঐ দু'টো অক্ষর থেকে কত কি বড় বড় শব্দ হোয়েছে—কত দেশ,কত জাত, কত রাজা, কত বীরপুরুষের নাম, তার গল্প তোমরা শুনেছ দু'দিনে। কাজেই স্বরবর্ণের ঐ দু'টি অক্ষরের সঙ্গে তোমাদের এমনি চেনা-শোনা হয়েছে যে, কিছুতেই ভুলতে পারবে না। কেমন? আচ্ছা, এখন স্বরবর্ণের তৃতীয় অক্ষর 'ই'কে এনেছি তোমাদের সামনে। এর চেহারাটি দেখছ ত? এখন শোন—এই হ্রস্ব ই অক্ষরটি থেকে কত কি হতে পারে—দেবতা, দৈত্য, মানুষ, পশু, দেশ, বস্তু আরো কত কি! তোমরা স্বর্গের রাজা ইন্দ্র দেবতার নাম শুনেছ নিশ্চয়ই; সেই ইন্দ্রের নাম বলতে বা লিখতে হোলেই এই ইকারটিকে চাই। তোমাদের বাড়ীতে লক্ষীপূজো হয়—সকাল-সন্ধ্যায় মেয়েরা ঘরে ঘরে ধূনো-গঙ্গাজল দিয়ে মা-লক্ষ্মীকে মনে মনে গড় করে; কেন না—মা-লক্ষ্মীর দয়া না হোলে সংসারে সুখ-শান্তি হয় না। সেই লক্ষ্মী-দেবীর আর একটি ভালো নাম—ইন্দিরা। ইন্দ্রের মত ইন্দিরা লিখতেও এই ইকারটি চাই। আকাশের চাঁদকে তোমরা চেনো, চাঁদ দেখতে ভালোবাস। সেই চাঁদের আর এক নাম ইন্দু। আর এই ইন্দু বলতে বা লিখতে হোলেই এই ইকারটি এসে পড়ে। তোমরা রাবণ রাজার নাম জানো নিশ্চয়ই, তাঁর এক ছেলে

ছিল; সে মেঘের আড়ালে লড়াই করে স্বর্গের রাজা ইন্দ্রকেও হারিয়ে দিয়েছিল। সেই থেকে তার নাম হয় ইন্দ্রজিৎ। এই ইকার থেকেই ইন্দ্রজিৎ হয়। ভারতবর্ষে আর এক মস্ত রাজা ছিলেন। পুরীর জগন্নাথের কথা তোমরা শুনেছো, এই রাজা তাঁকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁর নাম ছিল—ইন্দ্রদ্যুম্ন। এই শক্ত নামটিও পেয়েছে এই ইকার থেকে। অর্জুনের এক বীর ছেলের নামও ছিল ইরাবান। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে তিনি ভীষণ বীরত্ব দেখিয়ে নিহত হয়েছিলেন। এই ইকার থেকেই হয়েছে ঐ বীর ইরাবানের নাম। এখন এক দৈত্যের গল্প বলি শোন; তার নাম ছিল ইল্বল। এমনি সে দুষ্টু আর মায়াবী ছিল যে, মিছিমিছি নিরীহ মানুষদের বধ করে আনন্দ পেত। সে করত কি, তার বাতাপী নামে এক বোনকে ভেড়া করে তাকে কেটে রেঁধে অতিথিদের খেতে দিত। তার পর মন্ত্র পড়ে 'বাতাপী বাতাপী' বলে ডাকতো। বোনটির ঐ নাম ছিল। সে তখন মায়া-বিদ্যার জোরে যারা যারা মায়া-ভেড়ার মাংস খেয়েছিল, তাদের পেট ফুঁড়ে বেরিয়ে আসত। বেচারী অতিথিরা যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে মরত, আর ভাই-বোনে তাই দেখে আনন্দে নাচতে থাকৃত। এর পর হলো কি, অগস্ত্য মুনি এক দিন এলেন ইল্বল দৈত্যের সেই মায়া অতিথিশালায়। সেদিন তিনি একাই অতিথি; কাজেই ভেড়ার সমস্ত মাংস একলাই খেয়ে ফেললেন। ইল্বল ত দেখেই অবাক! অগস্ত্য বললেন—খেয়ে বড়ই তুষ্ট হয়েছি। ইল্বল দৈত্য তখন মন্ত্র পড়ে ডাকতে লাগল—'বাতাপী, বাতাপী!' অগস্ত্য মুনিও নিজের পেটে হাত বুলাতে বুলাতে বলতে থাকেন—'বাতাপী —বাতাপী।' ইল্বল দেখল—বাতাপী ত এই অতিথির ভুঁড়ি ভেদ করে বেরিয়ে এলো না! সে আবার ডাকতে লাগল। অগস্ত্য তখন হাসতে হাসতে বললেন—কেন আর ডাকাডাকি করছ বাপু, বাতাপী আর আসবে না—আমি তাকে খেয়ে হজম করে ফেলেছি যে! আমাকে ত চেন না,

আমিই যে অগস্ত্য মুনি!' ইল্বল তখন কাঁপতে কাঁপতে তাঁর পায়ের তলায় পড়ে প্রিয় বোনটিকে ফিরিয়ে দেবার জন্যে কাকুতি-মিনতি করতে লাগল। কিন্তু অগস্ত্য ঠাকুর হাসতে হাসতে বললেন—'তা হয় না ইল্বল, পাপের শাস্তি আছেই। পরের ক্ষতি করলে নিজের ক্ষতিও একদিন হবেই।' কেমন গল্প বল দেখি! ইল্বলের এই গল্প শুনে শুধু খুসি হোলে চলবে না, এই সঙ্গে ইল্বলের ইকারটিকে মনের মধ্যে গেঁথে রাখা চাই। এর পর বলছি শোন, ইকার থেকে কোন কোন দেশ, জাতি, আর কি কি জন্তু হোয়েছে।

ঠিক এই সময় দরজার আগলের অপর পার্শ্ব হইতে জাফরির ফাঁকে স্থূল গুম্ফযুক্ত কৃষ্ণবর্ণ কর্কশ মুখখানা রাখিয়া রাখাল বক্সী রুক্ষ স্বরে বলিল: থামেন গো দিদি-ঠাকরোণ, থামেন। নায়েব মশাই আপনারে নিতি পেঠিয়েছেন—চলেন।

গাছের কাছে দাঁড়াইয়া চণ্ডী চাটায়ের উপরে উপবিষ্টা বালিকাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বর্ণ পরিচয় সম্পর্কে গল্প বলিতেছিল। আর, গৌরী ছোট ছোট বালিকাদের শ্লেটে ইকার অক্ষরটি লিখিয়া দিয়া গাছের বোর্ডে লেখা অক্ষর, চণ্ডীর কথা ও ইহাদের শ্লেটে লেখা অক্ষরের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করিতেছিল। আগন্তকের কথায় চণ্ডীর মুখের কথা বন্ধ হইয়া গেল, বালিকারাও চমকিত হইয়া আগলের অপর পার্শ্বে বক্রভঙ্গিতে দণ্ডায়মান লোকটির দিকে চাহিয়া রহিল।

দৃঢ় স্বরে চণ্ডী জিজ্ঞাসা করিল: কি বলছ তুমি? দেখতে পাচ্ছ না এখানে আমি পড়াচ্ছি—তোমার নায়েব মশায়ের কাছে যাবার এখন ফুরসদ ত আমার নেই।

রাখাল বক্সী বলিল: এজ্ঞে, ফুরসদ আপনারে করতিই হবে দি-ঠাকরোণ! ভাবেন ত, হুকুমটা দ্যাছেন কেডা!

হুকুমের কথায় চণ্ডীর মুখখানা আরক্ত হইয়া উঠিল এবং আপনাকে

শক্ত করিয়া দৃঢ় স্বরে কহিল: তোমার নায়েব মশাইকে বল গে তাঁর হুকুমের কোন তোয়াক্কা আমি রাখি না।

প্রবল প্রতাপশালী নায়েব মশাইটিকে উদ্দেশ করিয়া এই ধরণের কথা বলিতে শুনিয়া বক্সী প্রথমে বিস্ময়াপন্ন হইল, তাহার পর প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপের ভঙ্গিতে বলিল: কিন্তু আমারে যে হুকুম দ্যালেন গো দি-ঠাকরোণ—আপনকারে লিয়ে যাবার তরে। ছেলেমানসী করবেন না—চলেন।

চণ্ডী এবার জ্বলন্ত দৃষ্টিতে বক্সীর দিকে চাহিয়া তীক্ষ্ণ স্বরে বলিল: পড়ার সময় মিছিমিছি গোল কোর না বলছি! তোমার নায়েব মশাইকে বল গে—লাট সাহেব এসে ডাকলেও পড়ানো ফেলে রেখে আমি যেতাম না! তাঁর দরকার থাকে এখানে আসবেন।

কথাটা শেষ করিয়াই চণ্ডী তাহার ছাত্রীদের দিকে মনোযোগ দিল। রাখাল বক্সী গজ-গজ করিতে করিতে ফিরিয়া চলিল: এ! তবু যদি ম্যাম সাহেবের পাকা ইস্‌কুল হোত গো! জঙ্গল ভেঙে খেলা-ঘর বানালে—তাও সরকারের জমীনে। হুঁ—এরেই কয় পরের ধনে পোদ্দারী চালানো।

সাতকড়ি সামন্ত সে সময় সেরেস্তার কাজকর্ম সারিয়া চণ্ডীর প্রতীক্ষা করিতেছিল। এই মেয়েটার বিরুদ্ধে অনেক নালিশই তাহার সেরেস্তায় আসিয়া জমা হইয়াছে, কিন্তু সে তাহাতে বিশেষ মনোযোগ দেয় নাই এই ভাবিয়া যে, এখানে কোন পক্ষেই প্রাপ্তির কোন আশা নাই। অভিযুক্তা মেয়েটির পিতা করালী চট্টোপাধ্যায় গ্রামের এক জন বিশিষ্ট কবিরাজ; গৃহস্থ হইলেও তিনি এ অঞ্চলে সবার শ্রদ্ধেয়। স্বয়ং সাতকড়িও তাঁহার কাছে কৃতজ্ঞ—যেহেতু, কয়েক মাস পূর্বে তাহার স্ত্রী সূতিকা রোগে মৃতকল্প অবস্থায় উপনীত হইলে, এই করালী কবিরাজের চিকিৎসার গুণেই কোনও রকমে রক্ষা পাইয়াছিলেন। সুতরাং এ-হেন হিতকারী ব্যক্তির কন্যার প্রতি কঠিন ব্যবহার করিতে তাহার চক্ষু-লজ্জায় বাধিতেছিল।

কিন্তু তাহা হইলেও সরকারী সম্পত্তির স্বত্বহানির ব্যাপারে সেই কন্যাকে ঘনিষ্ঠ ভাবে লিপ্ত দেখিয়া সাতকড়ির পক্ষে নীরব থাকা ত সম্ভবপর নহে। এই অঞ্চলের কোন ব্যক্তি এ পর্যন্ত যে জঙ্গলবুড়ী বন্দটির মধ্যে প্রবেশ করিয়া কোন বৃক্ষের গায়ে কাটারির একটা কোপও বসাইতে সাহস করে নাই, করালী কবিরাজের কন্যাটি কি না মেয়ে-বোম্বেটের মত দল বাঁধিয়া সেই জঙ্গল ভাঙ্গিয়া তছনছ করিয়াছে, পাঠশালা বসাইবার ফন্দী করিয়া স্বত্ব কায়েম করিতে চাহিয়াছে! সেই জন্যই সাতকড়ি তাহাকে কাছারী-বাড়ীতে আনিয়া ভয় মৈত্রী দেখাইয়া নিরস্ত করিবার সিদ্ধান্ত আঁটিয়াছিল। কিন্তু তাহার অনুচর বক্সী আসিয়া যাহা বলিল, তাহাতে সাতকড়ি সামন্তের ক্রোধানল উদ্দীপিত হইবারই কথা। তৎক্ষণাৎ সেরেস্তার মধ্যে একটা সাজ-সাজ রব পড়িয়া গেল। অল্পক্ষণ পরেই সাতকড়ি তাহার অধীনস্থ দুই মুহুরী ফটিক পাল ও শীতল রায়, অনুচর রাখাল বক্সী এবং দুই জন যষ্টিধারী পাইক লইয়া অকুস্থল অভিমুখে বীরদর্পে অগ্রসর হইল।

চণ্ডী তখন ইকারের অন্তর্গত ইট, ইদারা, ইমারৎ, ইঞ্জিন প্রভৃতির গল্প বলিতেছিল। অভিযাত্রী দলটির আবির্ভাবে পুনরায় পাঠে বিঘ্ন ঘটায় চণ্ডীর মুখে বিরক্তির চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল। রাখাল বক্সীর কথায় ছাত্রীরা কৌতুক বোধ করিয়াছিল, কিন্তু এখন এই প্রবল দলটিকে দেখিয়া তাহারা ত্রস্ত হইয়া উঠিল। সাতকড়ি সামন্তের প্রতাপ তাহাদের অবিদিত ছিল না।

সাতকড়িই সর্বাগ্রে আগলের কাছে আসিয়া ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল: আগলটা দেখছি শিকল দিয়ে বাঁধা রয়েছে; খুলে দেবে, না ভাঙতে হবে?

সাতকড়ির কথায় চণ্ডী ফিরিয়া দাঁড়াইল এবং ক্ষণকাল এই উদ্ধত প্রৌঢ় মানুষটির বিকৃত মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া পরক্ষণে প্রচ্ছন্ন শ্লেষের সুরে বলিল: আপনি যে ভাঙতে খুবই পটু, আর এই

উদ্দেশ্য নিয়েই এসেছেন, আপনার মুখের কথা এবং সঙ্গের দলটি দেখেই তা বুঝিছি। কিন্তু মেয়েদের এই পড়ার আস্তানার প্রতি আপনার এ আক্রোশ কেন, সেইটিই বুঝতে পারিনি!

চণ্ডীর কথা শুনিয়া সাতকড়ি স্তব্ধ হইয়া গেল, কিছুক্ষণ তাহার মুখ দিয়া কোন কথাই বাহির হইল না। তাহার পরে মনে মনে কি ভাবিয়া সে বলিল: ও-সব বোঝবার আগে আমার কথার জবাব দাও তুমি। লাটের কিস্তীর পরে আমি যেই দেশে গেছি, সেই ফুরসদে তুমি সরকারী জমির জঙ্গল ভেঙে এ সব কাণ্ড করেছ কোন্ অধিকারে?

চণ্ডী উত্তর করিল: প্রয়োজনের অনুরোধে। আর আপনি যে বললেন, আপনার অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে এ কাজ করেছি, ও-কথা ঠিক নয়। আপনার থাকা-না-থাকার সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই আমার মনে ওঠেনি। আমি এখানে এসে এখানকার অবস্থা দেখে জেনেছিলাম যে, এ জমি আমাকে নিতে হবে; তাই নিয়েছি। আপনি থাকলেও নিতাম।

এই বয়সের কোন মেয়ের মুখে এই ধরণের কথা সাতকড়ি সামন্ত তার জীবনে কোন দিন শুনে নাই। এই কথার ভারে সে নিজের কথার খেই বুঝি হারাইয়া ফেলিল। কষ্টে আত্মসম্বরণ করিয়া সে বলিল: কার সঙ্গে তুমি কথা বলছ জানো? কবিরাজ মশাইকে আমরা শ্রদ্ধা করি, তাঁর খাতিরে তোমার বেয়াদপি সহ্য করেছি। কিন্তু সহ্য করবারও একটা সীমা আছে, এ কথা ভুলে যেও না।

চণ্ডীও সঙ্গে সঙ্গে দৃঢ় হইয়া বলিল: দেখুন, আমার বাবার প্রসঙ্গ এখানে আনবার কোন প্রয়োজন নেই, আমি নিজের দায়িত্বেই এ সব করেছি। আমার বাবার মুখ চেয়ে না-ই বা সহ্য করলেন আপনি। আপনার যা ইচ্ছা তাই করুন।

দুই চক্ষু পাকাইয়া চণ্ডীর দিকে চাহিয়া সাতকড়ি বলিল: মেয়ে-মুখে খুব লম্বা লম্বা কথা শোনাচ্ছ যে! কত ধানে কত চাল সে খবর ত রাখো

না! জানো, জমিদারের বিনা হুকুমে এ জঙ্গল ভেঙে তুমি কি গর্হিত কাজ করেছ?

শান্ত কণ্ঠে চণ্ডী উত্তর করিল: আমি যা ভালো বুঝিছি তাই করেছি। দীর্ঘকাল ধরে যে সব জমি পড়ে থাকে, বন-জঙ্গল হয়ে সাধারণের স্বাস্থ্যহানি করে, সে সব জমি সাধারণের কাজে লাগাবার জন্যে দখল করা অবিশ্যি দুঃসাহসের কাজ, কিন্তু আপনি যে বললেন—গর্হিত, তা নয়।

বিদ্রূপের সুরে সাতকড়ি বলিল: তুমি কি আমাকে আইন শেখাচ্ছ?

গম্ভীর মুখে চণ্ডী উত্তর দিল: আইন আপনার ঠিক মত জানা থাকলে 'যুদ্ধং দেহি' বলে এ ভাবে এখানে ছুটে আসতেন না। আপনার সেরেস্তার কাগজ-পত্র খুঁজলে দেখতে পাবেন, আপনার সরকারই এই জমিকে 'জঙ্গলবুড়ী' বন্দ বলে স্বীকার করেছেন।

চণ্ডীর মুখের এ কথা যেন জোঁকের মুখে নুণের মত পড়িল—বিস্ময়ের সুরে সামন্ত জিজ্ঞাসা করিল: তুমি জানো—কাকে জঙ্গলবুড়ী বন্দ বলে?

মৃদু হাসিয়া চণ্ডী বলিল: আপনি কি ভেবেছেন, আমি জাহাজে চড়ে বিলেত থেকে এসেছি? জঙ্গল ভাঙতে গেছি তার খবর না নিয়েই? অনেকদিন ধরে পোড়ো বুনো জমি নিজের খরচে পরিষ্কার করে নেবার জন্যে আপনাদের সেরেস্তা থেকেই ইস্তাহার বেরিয়েছিল। কিন্তু এ জমি ইজমালি—পরে গোল বাধবে এই ভয়ে কেউ বন্দোবস্ত করতে এগোয়নি। জঙ্গলবুড়ী জমির ব্যাপারেই ও-ভাবে ইস্তাহার জারি হয়ে থাকে।

সাতকড়ি অসহিষ্ণু হইয়া বলিল: তুমি তাহ'লে কি সাহসে এ জমি ভাঙতে গেলে শুনি?

চণ্ডী বলিল: আমি ত নিজের স্বার্থের জন্যে কিছু করিনি, কাজেই জমি যারই হোক, যখন জানা গেছে জঙ্গলবুড়ী, তখন জঙ্গল ভেঙে

পাঠশালা বসালে কেউ আপত্তি করবে না—অবিশ্যি, শিক্ষা-সংস্কৃতির পক্ষে যদি তার কিছু মাত্র পরিচয় থাকে।

কথাটা বলিয়াই চণ্ডী তাহার সুতীক্ষ্ণ বক্রদৃষ্টি এমন ভাবে সাতকড়ির মুখে নিবদ্ধ করিল যে, যাহাকে উদ্দেশ করিয়া চণ্ডীর এই কথা, তাহার তীক্ষ্ণ কটাক্ষই যেন স্পষ্ট করিয়া সেই লোকটিকেই দেখাইয়া দিল।

চণ্ডীর এই প্রচ্ছন্ন শ্লেষপূর্ণ কথার আঘাতটি সামলাইয়া লইতে সাতকড়ির কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইল। সে এবার বিতর্কের পথ বন্ধ করিবার অভিপ্রায়ে বিক্ষোচিত ভঙ্গিতে বলিল: এখন কথা হচ্ছে, নিজের স্বার্থেই কর, আর পরের স্বার্থেরই দোহাই দাও, আসলে এটা বোঝা যাচ্ছে—জমিদার-সরকারে কোন বন্দোবস্ত না করে, এখানকার সেরেস্তা থেকেও কোন মঞ্জুরী না নিয়ে, জঙ্গলবুড়ী বন্দ হোলেও এতে হাত দেবার কোন এক্তিয়ার তোমার নেই। ভেবো না যে, ভয়ে পড়ে বেড়া বেঁধে আগলে শিকলি এঁটে রাখলেই রেহাই পাবে।

সাতকড়ির মুখে এ কথা শুনিবা মাত্র চণ্ডী নীরবে ক্ষিপ্র বেগে আগলের কাছে আগাইয়া গিয়া আঁচলে-বাঁধা চাবি দিয়া ক্ষুদ্র তালাটি খুলিয়া শিকলের বাঁধন হইতে তাহাকে মুক্ত করিয়া দিল; তাহার পর আগলটি এক পাশে ঠেলিয়া পথমুক্ত করিয়া দৃঢ়স্বরে বলিল: মানুষের ভয়ে এ ভাবে আগল বেঁধে রাখা হয়নি, গরু-বাছুরের উপদ্রবের জন্যেই আগল দেওয়া হয়েছিল। এখন ত খুলে দিলাম, আপনি কি করতে চান তাই বলুন।

সাতকড়িও সঙ্গে সঙ্গে তাহার ইচ্ছাটা বলিয়া ফেলিল: আমি লোক দিয়ে সমস্ত বেড়া ভেঙে দেব, এখানে পাঠশালা বসাতে দেব না।

সহজ কণ্ঠে চণ্ডী বলিল: বেড়া ভেঙে দেওয়া মানেই বাড়ী ভেঙে দেওয়া। চার দিকে বেড়া দিয়ে বাড়ীর মত করেই আমি এখানে মেয়েদের পাঠশালা বসিয়েছি। এখানে সেঁধিয়ে জোর করে কিছু

করতে যাওয়া মানেই অন্যের আস্তানায় অনধিকার প্রবেশ করা বোঝায়।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সমগ্র অঙ্গনটি ভালো করিয়া দেখিয়া পরক্ষণে অগ্নিবর্ষী দৃষ্টিতে চণ্ডীর দিকে চাহিয়া সাতকড়ি এবার তর্জন করিয়া উঠিল: কি, এ তোমার আস্তানা? ও! জমিটা চোস্ত করে গোবর দিয়ে নিকিয়ে নেওয়া হয়েছে বটে! দাঁড়াও, আমি এখনি এই উঠোন চষে সরষে বুনে তবে ছাড়ব। এই—ভিতরে আয় তোরা।

এক নিশ্বাসে কথাগুলি বলিয়াই তিনি পিছনে চাহিয়া পাইকদের আহ্বান করিয়া ভিতরে ঢুকিতে গেলেন। কিন্তু তৎপূর্বেই চণ্ডী বিদ্যুদ্বেগে দ্বারপথ রুদ্ধ করিয়া দৃঢ় স্বরে বলিল: এই আগলটা খুলে দিয়েছি বলেই কি আপনি ভেবে নিলেন, আমি ভয় পেয়ে আপনাকে ভিতরে প্রবেশ করবারও অনুমতি দিয়েছি? জানেন—পাঠশালার ভিতরে জেলার কলেক্টরও জোর করে ঢুকতে পারেন না? ও-চেষ্টা করবেন না সামন্ত মশাই!

নায়েব সাতকড়ি সামন্তর বৃহৎ মুখখানা তখন ফুলিয়া বুলডগের মুখের মতন ভীষণ হইয়া উঠিয়াছে। ইতিমধ্যে বাহিরে গ্রামের বহু লোক সমবেত হওয়ায় কাছারীর পুরাতন পাইকদ্বয় লাঠি লইয়া মহা সমস্যায় পড়িয়া গিয়াছে। নায়েব উত্তেজিত হইয়া সাধারণ বুদ্ধি হারাইলেও অশিক্ষিত ও অন্ত্যজ ব্যক্তি হইয়াও তাহারা ব্যাপারটির গুরুত্ব বুঝিয়াছিল—পাড়ারই সম্ভ্রান্ত বাড়ীর একটি মেয়ের সামনে গিয়া কেমন করিয়া তাহারা লাঠি হাঁকরাইবে?

পাইকদ্বয়কে যথাস্থানে দাঁড়াইয়া ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া সাতকড়ি পুনরায় তর্জন করিয়া তাহাদিগকে ডাকিল: দুলে, পাঁজা, তোরা এগিয়ে আয়; ফটিক, শীতল, কাছারীর সবাইকে নিয়ে ভিতরে এসো; দেখি—এই ডেঁপো মেয়েটা কি ক'রে আমাদের ঠেকায়।

শান্ত কণ্ঠে চণ্ডী সাতকড়িকে লক্ষ্য করিয়া কহিল : চেঁচাবেন না, মনে রাখবেন—মাতালের মতন অনর্থক হাঁক-ডাক করাটাই পুরুষের পৌরুষ নয়। সোজা কথায় আমি বলছি—আমার নাক দিয়ে যতক্ষণ নিশ্বাস পড়বে—আপনাদের দলের এক প্রাণীও এর মধ্যে সেঁধুতে পারবে না।

কথার সঙ্গে সঙ্গেই চণ্ডী দুই হাত প্রসারিত করিয়া মুক্ত দ্বারপথ আগুলিয়া দাঁড়াইল। তাহার মাথায় দীর্ঘ কেশরাজি এই সময় আলুলায়িত হইয়া উভয় গণ্ডের পাশ দিয়া পৃষ্ঠদেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, নিটোল বলিষ্ঠ দেহ ধীর স্থির অবিচলিত—মনে হইতেছিল যেন দক্ষ শিল্পীর হাতে নির্মিত এক অপরূপ মর্মর মূর্তি; পূরন্ত মুখ ও আয়ত দুই চক্ষু দিয়া যেন একটা দিব্য জ্যোতিঃ নিঃসৃত হইতেছে।

চণ্ডীর এই অপরূপ মূর্তির দিকে চাহিয়া সাতকড়ি সামন্তও মুহূর্তের জন্য বুঝি স্তম্ভিত হইল। কিছু পূর্বেই সে বুঝিয়াছিল, তাহার মুখের সামনে দাঁড়াইয়া ইহার আগে কোন গ্রাম্য নারী ত দূরের কথা দুরন্ত পুরুষ পর্যন্ত এ ভাবে কথা কহিতে সাহস করে নাই। কিন্তু এই মেয়েটি যেন কথার সঙ্গে সঙ্গে চাবুক হাঁকাইয়া তাহাকে শাসাইতেছে—এমনই তাহার স্পর্ধা! আর—এখন তাহাকে দৃপ্ত ভঙ্গিতে এ ভাবে দরজা আগলাইয়া দাঁড়াইতে দেখিয়া তাহার মনে হইল যে, এমন বলিষ্ঠ ও তেজোদৃপ্ত নারীমূর্তি তাহার জীবন পথে এই প্রথম আসিয়া দেখা দিল। সামন্ত ক্ষণকাল নিস্তব্ধ ভাবে নিষ্পলক দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া পরক্ষণে সহসা যেন সর্বশক্তি কণ্ঠে আনিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল : তুমি যদি এখানে বাধা দাও, তাহ'লে আমার লোক জন বেড়া ভেঙ্গে এর মধ্যে ঢুকবে—ভালো চাও ত পথ ছাড়ো।

চণ্ডীও নির্ভীক কণ্ঠে বলিল : এটা পথ নয় পাঠশালা—আমরা এখানে পড়া-শোনা করি; পথে দাঁড়িয়ে অনেকেই পড়া শোনেন, কিন্তু কেউ জোর করে এখানে সেঁধুতে চাননি। আর বেড়া ভাঙবার যে কথা

বললেন—ওখানেও সেই একই কথা। আমাদের মাথাগুলো না ভেঙ্গে বেড়া ভাঙতে পারবেন না।

বেড়ার কথায়—বাঁশ-বাঁকারি, সেওড়া ও রাঙচিত্র গাছের ডাল-পালা দিয়া কাতার দড়িতে মজবুত করিয়া বাঁধা বেড়াগুলির দিকে সামন্তর দৃষ্টি পড়িতেই দেখিল—কোমরে আঁচল শক্ত করিয়া বাঁধিয়া এক দল মেয়ে বেড়ার গায়ে ইতিমধ্যেই আর এক সারি বেড়ার মত শ্রেণীবদ্ধভাবে দাঁড়াইয়াছে। ইহার পর সাতকড়ি সামন্তের মুখে আর কথা যোগাইল না। ইতিমধ্যে গ্রামের বহু ব্যক্তি অকুস্থলে আসিয়া ব্যাপারটি লক্ষ্য করিতেছিল—তন্মধ্যে সাতকড়ির অন্তরঙ্গ-স্থানীয় কয়েক ব্যক্তি নিকটে আসিয়া তাহাকে নিরস্ত হইতে অনুরোধ করিতে লাগিল। নিষ্ফল ক্রোধ কথায় ফুটাইয়া সাতকড়ি শাসাইতে লাগিল: দাঁড়াও, এখনি আমি থানায় জানাচ্ছি, আর সদরে হুজুরকেও লিখছি, তখন বুঝবে এর ফল কি হয়—তোমার দোষে তোমার বাবা পর্যন্ত মুস্কিলে পড়বে।

মৃদু হাসিয়া চণ্ডী বলিল: আমার বাবাকে আবার টানছেন কেন? থানায় ত জানাচ্ছেন, আর আপনার হুজুরকেও লিখছেন—বেশ ত, তাঁরা এসে যদি বলেন যে আমিই দোষ করেছি—একলা আমিই শাস্তি নেব। এখন দয়া করে বাড়ী যান দেখি—আমরা নিশ্চিন্ত হয়ে কাজ করি।

ক্রুদ্ধ দৃষ্টি পরিপূর্ণ ভাবে চণ্ডীর বিহসিত মুখের উপর আর একবার নিবদ্ধ করিয়া সাতকড়ি সামন্ত নীরবেই স্থান ত্যাগ করিয়া পথের দিকে পা বাড়াইল। কাছারীর কর্মচারী এবং গ্রামের লোক জন তাঁহার অনুসরণ করিল।

সেদিন যখন গাছতলার পাঠশালায় জমিদারী কাছারীর নায়েব সাতকড়ি সামন্তের সহিত চণ্ডীর এই ভাবে বাক্-বিতণ্ডা চলিতেছিল, সেই সময় মিশন স্কুলের হেড মিষ্ট্রেস্ খৃষ্টকুমারী এক কাণ্ড বাধাইয়া বসিল।

স্কুলে প্রথম শ্রেণীর ঘরে প্রবেশ করিতেই তাহার নজরে পড়িল যে, ক্লাসের অনেকগুলি বেঞ্চি ছাত্রীহীন অবস্থায় তাহাকে যেন ব্যঙ্গ করিতেছে। হাতের বাইবেলখানা সজোরে টেবিলের উপর ঠুকিয়া ক্রুদ্ধ কণ্ঠে সে বলিয়া উঠিল : হুঁ ! আজ দেখছি অর্ধেকেরও বেশী মেয়ে য়্যাবসেণ্ট। পরক্ষণে টেবিলের উপর রক্ষিত ঘণ্টাটি ঘুরাইতেই পরিচারিকা শ্যামলী ছুটিয়া আসিয়া করযোড়ে দাঁড়াইল। খৃষ্টকুমারী গম্ভীর হইয়া বলিল : শ্যামলী, কাল ক্লাসের তিনখানা বেঞ্চি খালি ছিল, আজ দেখছি সাতখানায় কেউ নেই!

শ্যামলী সবিনয়ে নিবেদন করিল : ও-ঘরেও আজ অনেক মেয়ে আসেনি।

খৃষ্টকুমারী তর্জন করিয়া উঠিল : আসেনি! আর তুমি চুপ করে ঘুমুচ্ছিলে? খবর পর্যন্ত আমাকে দেওয়া দরকার মনে করনি!

শ্যামলী বলিল : খবর দেব বলেই ত···

খৃষ্টকুমারী ঝঙ্কার দিয়া বলিল : থামো। তর্ক করে আর দোষ বাড়িয়ো না। কাল যে-সব মেয়ে য়্যাবসেণ্ট ছিল—আসেনি, তাদের বাড়ী গিয়ে খবর নিতে বলেছিলাম ; গিয়েছিলে?

মুখখানা ফুলাইয়া শ্যামলী বলিল : অ-মা যাইনি আবার! তা তারা যে আর এ ইস্কুলে আসবে না বললে। ··

কণ্ঠের স্বর আরও উচ্চ ও প্রখর করিয়া হেড মিষ্ট্রেস্ বলিল : আসবে না! আস্পর্ধা ত তাহলে কম নয়! তুমি ধরে আনলে না কেন?

শ্যামলী বিস্ময়ের ভঙ্গিতে বলিল : আপনি রাগ করে এ কি বলছেন মেম-মা? তারা কি আমাদের বাকিদার প্রজা যে, ধরে আনব?

খৃষ্টকুমারীও ঘাবড়াইবার মত মেয়ে নহেন, তেমনি জোর-গলায় বলিলেন : তার চেয়েও বেশী। বিনি পয়সায় আমরা এত কাল ওদের পড়িয়েছি, সভ্য করেছি, কুসংস্কার সব দূর করে দিয়েছি, ওদের ওপরে আমাদের দাবি আছে, অধিকার আছে ; আসবে না বললেই হলো আর কি!

শ্যামলী বিপন্নের মত হইয়া বলিল: ওরা যে এখন উলটো বলছে মেম-মা! বলছে—মেয়েগুলো সব গোল্লায় যেতে বসেছে, বাড়ী এসে খালি খালি 'প্রভু প্রভু' করে—ঠাকুর-দেবতা মানতে চায় না। তাই নাকি এই স্কুলে আর পড়াবে না!

মুখখানা বিকৃত করিয়া খৃষ্টকুমারী বলিল: কোন্ চুলোয় পড়তে পাঠাবে শুনি? ইস্কুল আর কোথায় এ অঞ্চলে আছে যে—পড়াবে? মুরদ যত সব ত জানা আছে! তা' য়্যাদ্দিন বাদে এ-কথা উঠল যে?

শ্যামলী ইহার কারণটি এবার অসঙ্কোচে প্রকাশ করিয়া দিল: করালী কবরেজের এক মেয়ে এসেছে হালে, সেই ত ঘোঁট পাকাচ্ছে গো!

খৃষ্টকুমারী তৎক্ষণাৎ মেয়েদের হাজিরা বহিখানি খুলিয়া একটা স্থান দেখিয়া ঘাড় নাড়িতে-নাড়িতে বলিল: ইয়েস, ইয়েস; ঐ বাড়ীর মেয়েগুলোর নামের গায়েই প্রথমে অনুপস্থিতির দাগ পড়েছে বটে!

শ্যামলী এবার কথাটা বুঝিয়া বলিল: আজ আরও সাতটা বাড়ী থেকে একটি মেয়েও আসেনি।

কুপিত কণ্ঠে খৃষ্টকুমারী বলিল: বদমাইসি, বেয়াদপি! কি বললে, করালী কবরেজের মেয়ে?

মুখখানা মচকাইয়া শ্যামলী বলিল: মেয়ে ত নয়—যেন মানোয়ারী জাহাজ, মারমুখী হয়েই আছেন! পশ্চিমের কোন দেশে থাকত, হালে এসে সারা গেরামকে যেন 'তোল মাটি ঘোল' করে তুলেছে! ঐ ধিঙ্গি মেয়েটাই ত যত নষ্টের গোড়া গো মেম-মা!

আবেগের সুরে হেড মিষ্ট্রেস্ বলিয়া উঠিল: বিদ্রোহ করেছে—বিদ্রোহ! আচ্ছা, আমিও দেখে নেব ঐ মেয়েটাকে, এমন শিক্ষা দেব যে···

শ্যামলী বলিল: শুনলে গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে গো মেম-মা, ভয়ে

কেউ সেঁধুত না ঐ জঙ্গলবুড়ীর ডাঙ্গায়, সেই বন-বাদাড় সব সাফ করে পড়বার ঠাঁই করেছে। আর ছুঁড়ীগুলোকে যেন গুণ করেছে গো—সবাই সেইখানে ভিড়েছে গো মেম-মা!

অসহিষ্ণু ভাবে খৃষ্টকুমারী বলিল: থাক্, আর বলতে হবে না। আমি সব বুঝতে পেরেছি—কালই আমি এর বিহিত করছি।

পরদিন পূর্ববৎ চণ্ডী তাহার পাঠশালায় বোর্ডের উপর 'ঈ' লিখিয়া এই স্বরবর্ণটির সহিত ছাত্রীদের পরিচয় করাইয়া দিতেছে, এমন সময় খৃষ্ট-কুমারীকে সেদিকে আসিতে দেখা গেল। নিকষ কালো চেহারা, লম্বা ধরণের মুখখানা যেন দম্ভে ভরা, বয়স পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর; চওড়া কালো ফুল পাড়ের সাদা সাড়ী কুঁচাইয়া পরিয়াছে, ফুলহাতা ব্লাউজ ক্রুস ও পিনের সঙ্গে টাইট করিয়া সাড়ীর সহিত আঁটা; পায়ে হিলওয়ালা জুতা, চোখে চশমা। স্কুলের উড়িয়া বেহারা ঝালর দেওয়া একটি ছাতি ধরিয়া তাহার পিছু-পিছু আসিতেছে। একটু তফাতে স্কুলের পরিচারিকা শ্যামলী ও সোহাগী—তাহাদের মুখে চাপা-হাসি।

বেড়ার ফাঁক দিয়া খৃষ্টকুমারীকে দেখিতে পাইয়া কতকগুলি ছাত্রীর মুখ ভয়ে কালো হইয়া গেল; সঙ্গে সঙ্গে গুঞ্জন উঠিল—মেমদি, মেমদি! ইতিমধ্যে মেমদি দরজার কাছে আসিয়া সবলে রুদ্ধ আগলে একটা ধাক্কা দিল এবং তাহাতে দ্বার উন্মুক্ত হইল না দেখিয়া রুক্ষ স্বরে বলিল: ও! ভয়ে আগল বন্ধ করা হয়েছে।...কথার সঙ্গে সঙ্গে আর একটা ধাক্কা দিয়া আপন মনেই জিজ্ঞাসা করিল: খুলবে এটা?

ততক্ষণে চণ্ডী আগলের অপর পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, সেখান হইতে সহাস্যে শান্ত কণ্ঠে কথাটার উত্তর দিল: "আপনি যখন মহিলা, তার উপর শিক্ষয়িত্রী—খুলতে হবে বৈ কি।...বলিতে বলিতেই সে চাবি খুলিয়া শিকলের বেড় টানিয়া আগলটি উন্মুক্ত করিয়া এক ধারে সরাইয়া দিল। খৃষ্টকুমারী গম্ভীর মুখে বলিল: মস্ত বাড়ী, তার আবার দরজা—তাও বন্ধ!

চণ্ডী হাসিয়া বলিল: কাণা পুতের নামও পদ্মলোচন হয়ে থাকে, আর মা-বাপেই রাখে; ইট-পাথরের ইমারত না হলে কি দরজা রাখতে নেই! কিন্তু আপনাকে বসাব কোথায় বলুন ত! আমরা ত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পড়াই, আর দরকার পড়লে এই চাটায়ে বসি। এসেছেন যখন, এইখানেই বসা ছাড়া উপায় নেই।

চণ্ডীর কথায় সৌজন্যের অভাব ছিল না; কিন্তু খৃষ্টকুমারী সেদিক দিয়াই গেলো না, চণ্ডীকে উপেক্ষা করিয়া চঞ্চল দৃষ্টি স্থানটির চারি দিকে ছড়াইয়া তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলিল: বসতে এখানে আসিনি।...প্রসারিত দৃষ্টিপথে এই সময় অতি-পরিচিতা এবং একান্ত প্রভাবাধীনা দুইটি ছাত্রী পড়িবা মাত্র মুখভঙ্গি এবং কণ্ঠস্বর একেবারে বদলাইয়া চিৎকার করিয়া ডাকিল: শোভা, অনীতা—উঠে আয় বলছি,—ইস্কুল পালিয়ে এখানে আসা হয়েছে গোল্লায় যাবে বলে!

মেম দিদিকে দেখিয়াই ইহাদের বুকের রক্ত বুঝি ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছিল, মুখ নিচু করিয়া মনে-মনে তাহারা ঠাকুরকে ডাকিতেছিল। আহ্বান শুনিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিয়া দাঁড়াইল—এমনই মেমদি'র প্রচণ্ড প্রতাপ! কিন্তু মেমদি'র আক্রোশ তখন মাত্রা ছাপাইয়া গিয়াছে, শিষ্টাচার ও স্থান-কাল ভুলিয়া নিজেই ছুটিয়া গিয়া সেই মেয়ে দুইটির হাত দুইখানি উভয় হস্তে চাপিয়া ধরিয়া হিড়-হিড় করিয়া টানিতে টানিতে দ্বারের দিকে লইয়া চলিল। আহত কণ্ঠে শোভা ও অনীতার তখন কি কান্না! নীরবে স্থির ভাবে চণ্ডী এতক্ষণ দাঁড়াইয়াছিল। এই সময় ক্ষিপ্রপদে খৃষ্টকুমারীকে অতিক্রম করিয়া দ্বারপথে দাঁড়াইয়া সে শান্ত কণ্ঠেই বলিল: এ কি করছেন? কোন চেতন পদার্থকে এমন নির্মম ভাবে কোন মেয়ে যে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে যেতে পারে, এ কিন্তু জানা ছিল না। দেখতে পাচ্ছেন না এদের অবস্থা—ছেড়ে দিন।

মুখখানা বিকৃত করিয়া কর্কশ স্বরে খৃষ্টকুমারী বলিল: এদের এখন

হয়েছে কি, ইস্কুলে আগে নিয়ে যাই, তার পরে দেখবেখ'ন—কাকে বলে শাস্তি! সব ক'টা মেয়েকেই এমনি করে টেনে-হিঁচড়েই নিয়ে যাব। শ্যামলী, সোহাগী, এ দু'টোকে ধর ত, আমি এবার ওদের দেখি।

সহজ কণ্ঠে চণ্ডী জিজ্ঞাসা করিল: ও! আপনি তাহলে ছেলে-ধরার মতন এখানে এসেছেন মেয়েগুলোকে ধরে নিয়ে যাবেন বলে? এ দুটোকে স্কুলের দাসীদের হাতে দিয়ে, আবার ওদেরও ধরবেন? আচ্ছা, আমাদের আপনি ঠাওরেছেন কি বলুন ত?

গৌরী ইতিমধ্যে চণ্ডীর পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, সে এই সময় বিদ্রূপের সুরে বলিল: সে আর বুঝতে পারনি! শোভা আর অনীতাকে যেমন তক্তা মনে করে বিনা দরদে টেনে নিয়ে চলেছেন, আমাদেরও ভেবেছেন এমনি কিছু—আমাদের প্রাণ নেই, মন নেই, অচল, অসাড় কোন পদার্থ যেন আমরা!

ইহার মধ্যেই পরিচারিকা শ্যামলী ও সোহাগী নিকটে আসিয়াছে দেখিয়া খৃষ্টকুমারী শোভা ও অনীতাকে তাহাদের হাতে সমর্পণ করিবার উদ্দেশ্যে চণ্ডীকে লক্ষ্য করিয়া তিক্ত স্বরে বলিল: পথ ছেড়ে দাও তুমি—তোমাদের মতন ইতর মেয়েদের সঙ্গে কথা বলতেও আমার মর্যাদায় বাধে।

কথার সঙ্গে ক্রুদ্ধ ভাবটি ব্যক্ত করিবার উদ্দেশে বালিকা দুইটিকে সবলে আর একবার ঝাঁকুনী দিল। তাহারা বরাবরই কাঁদিতেছিল, এখন তাহার সুর আরও চড়িয়া গেল। চণ্ডীর দুই চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল। কিন্তু মুখের কথায় মনের জ্বালার কোন আভাস না দিয়া প্রচ্ছন্ন শ্লেষের সুরেই সে বলিল: ও ত ঠিক হলো না মেমদি, আপনার হাতের ঝাঁকুনি খেয়ে ছুঁড়ি দুটো যে কেঁদেই খুন হলো! ওর চেয়ে এক কাজ করুন—দু'হাতে ও দু'টোর মাথা জোরে জোরে ঠুকে দিন না, শেষ হয়ে যাক। দাঁড়ান, আমি তার সন্ধান আপনাকে দেখিয়ে দিচ্ছি।

কথাগুলি বলিতে বলিতেই চণ্ডী ঝাঁ করিয়া ঘুরিয়া একেবারে মেমদি'র পিছনে গিয়া তাহার উভয় বাহুমূল যুযুৎসুর কায়দায় চাপিয়া ধরিল। খৃষ্টকুমারী প্রথমে থতমত খাইয়া গেল, পরক্ষণে তাহার মনে হইল যেন এক জোড়া সাঁড়াসির কঠিন বেষ্টনে তাহার বাহুমূল দুইটি পিষ্ট হইতেছে; কিন্তু ক্রমে ক্রমে অনুভব করিবার শক্তিও বুঝি সে হারাইয়া ফেলিল; বুঝিতে পারিল না যে, হঠাৎ তাহার সুস্থ সবল দেহের শিরা-উপশিরাগুলি সহসা পক্ষাঘাতগ্রস্তের মত অসাড় হইয়া পড়িতেছে কেন! উভয় হস্তের কঠিন মুষ্টি আপনি খুলিয়া গেল; বিহ্বল দৃষ্টিতে সে লক্ষ্য করিল—শোভা ও অনীতা মুক্ত হইয়া ফ্যাল-ফ্যাল করিয়া তাহার দিকে চাহিয়া আছে, তাহার পরেই চণ্ডীর সমবয়সী অপর মহিলাটি তাহাদিগকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়া যথাস্থানে বসাইয়া দিতেছে। ক্রমশঃ তাহার কালো মুখখানার উপরে দুইটি চক্ষুর সম্মুখে আরোও বেশী কালো রঙের একটা গাঢ় আবরণ যেন রঙ্গমঞ্চের যবনিকার মত নামিয়া আসিতেছে। দেখিতে দেখিতে সে বেশ বুঝিতে পারিতেছিল যে, তাহার আর দেখিবারও সামর্থ নাই—দৃষ্টিশক্তি অস্পষ্ট হইয়া আসিতেছে; দুই পায়েও আর শক্তি নাই—তাহার দীর্ঘ দেহটিকে বহন করিবার মত। সত্যই, খৃষ্টকুমারী এতক্ষণ মাটির উপরে পড়িয়া যাইত, দুই হাতে চণ্ডীই তাহাকে ধরিয়া রাখিয়াছে—পড়িতে দেয় নাই। দুই পরিচারিকাও এতক্ষণ অবাক হইয়া তাহাদের মেম-মাতার দিকে চাহিয়াছিল, তাহারাও ভাবিয়া পায় নাই যে, সহসা এক লহমায় এ কি কাণ্ড হইয়া গেল?

চণ্ডী পরিচারিকাদের পানে চাহিয়া সহজ কণ্ঠে বলিল: তোমাদের প্রভুমা'র ফিটের ব্যামো আছে বোধ হয়—তাই হঠাৎ এ রকম হয়ে পড়েছেন। আমি তাড়াতাড়ি না ধরে ফেললে এখানেই পড়ে যেতেন। তোমরা এঁকে ইস্কুলে ধরে-ধরে নিয়ে যাও।

শ্যামলী ব্যগ্র ভাবে বলিল: মুখে-চোখে জল দেব কি?

চণ্ডী বলিল: না, তার আর দরকার নেই। ইস্কুলে যেতে যেতেই সুস্থ হয়ে উঠবেনখ'ন। শীগগির নিয়ে যাও।...চণ্ডীর ইঙ্গিতে শ্যামলী ও সোহাগী তাড়াতাড়ি খৃষ্টকুমারীর দুই পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। উড়িয়া বেহারাও পিছনে আসিয়া তাহার মাথায় ছাতিটি উঁচু করিয়া ধরিল। শ্যামলী সম্ভ্রমের সঙ্গে বলিল: চলুন মা—চলুন।

খৃষ্টকুমারী তখন অনেকটা প্রকৃতিস্থ হইয়াছে; প্রকৃত ব্যাপারটাও উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে। কিন্তু তখনও তাহার কণ্ঠে ও মনে পূর্ব শক্তি ফিরে নাই। এক বার শুধু দুই চক্ষু—যত দূর সাধ্য এ অবস্থায়—প্রখর করিয়া চণ্ডীর দিকে চাহিল, তাহার পর শ্যামলী ও সোহাগীকে লক্ষ্য করিয়া আস্তে আস্তে বলিল: ধরতে হবে না, আমি নিজেই যাচ্ছি।

ইস্কুলে ফিরিয়া সেদিন আর খৃষ্টকুমারী ক্লাসে বসিয়া মেয়েদের পড়াইতে পারে নাই, শাসন চলে নাই, এমন কি ছুটির আগে প্রভুর গুণগানের প্রবাহে হিন্দুর দেব-দেবীদের ভাসাইয়া দেওয়াও এই একটি দিন মাত্র ঘটিয়া উঠে নাই। খৃষ্টকুমারী মনে মনে বুঝিয়াছিল, ঐ মেয়েটা অতর্কিত ভাবে তাহাকে আক্রমণ করিয়া সকলের অজ্ঞাতে ঐ ভাবে কাবু করিয়া ফেলিয়াছিল এবং কীল খাইয়া কীল চুরি করা ভিন্ন তাহার পক্ষেও সম্ভব ছিল না সেখানে। কিন্তু ইহার প্রতিশোধ তাহাকে লইতেই হইবে। ইহার পর সে স্থির করিল, স্কুলে এক সভায় ছাত্রীদের সহিত তাহাদের অভিভাবিকাদিগকেও আহ্বান করিয়া সকল কথা বুঝাইয়া বলিবে এবং ছাত্রীদের উপর এই স্কুলের যে দাবী আছে, তাহা জানাইয়া ভয়-মৈত্রী দেখাইয়া তাহাদিগকে অভিভূত করিবে, সেই সঙ্গে চণ্ডীর গাছতলার পাঠশালাটি তুলিয়া দিতে উঠিয়া পড়িয়া লাগিবে। এ জন্য জমিদারী কাছারীর নায়েবকে হাত করিয়া খোদ জমিদারের সাহায্য লইতেও ত্রুটি করিবে না সে। কিন্তু হিন্দুর দেব-দেবীর প্রতি খৃষ্টকুমারীর

প্রচণ্ড বিদ্বেষ—স্বরুতেই তাহার উদ্দেশ্য পণ্ড করিয়া দিল। সভা বসিতেই সভার উদ্বোধন করিতে উঠিয়া সে অকারণ হিন্দুর উপাস্য মহাদেবী কালীমাতাকে লক্ষ্য করিয়া কুৎসা প্রচার করিতেই বাধা পাইল চণ্ডীর কাছে। চণ্ডীও আমন্ত্রিতা হইয়া স্কুলের সভায় আসিয়াছিল। চণ্ডীর প্রতিবাদে ক্রুদ্ধ হইয়া খৃষ্টকুমারী তাহাকে নিকটে ডাকিল। চণ্ডীকে দেখিয়াই তাহার চোখের উপর ভাসিয়া উঠিল সেদিনের সেই বেদনাদায়ক নির্যাতনের কথা। ধৈর্যরক্ষায় অক্ষম হইয়া খৃষ্টকুমারী সজোরে চণ্ডীর গণ্ডে করিল চপেটাঘাত। চণ্ডীও তৎক্ষণাৎ তাহার ব্যায়ামপুষ্ট সবল হাতখানি এমন কৌশলে ও সবার অলক্ষ্যে টেবিলখানির নিচে চালাইয়া দিল যে, স্তূপীকৃত বই, টাইমপীস ঘড়ি, কালিভর্তি দোয়াত, ঘণ্টি প্রভৃতি দ্রব্যজাত সহ খৃষ্টকুমারীকে লইয়া উল্টাইয়া পড়িল। দীর্ঘনিশ্বাসের সহিত একটা আর্ত স্বরে 'গড'কে স্মরণ করিয়া খৃষ্টকুমারী যখন উঠিয়া দাঁড়াইল, তখন দোয়াতের সমস্ত কালিটুকু তাহার শুভ্র সুপরিচ্ছন্ন পরিচ্ছদ কৃষ্ণবর্ণে রঞ্জিত করিয়া সারা মুখেও নিবিড় প্রলেপ দিয়াছে। একটি মেয়ে ঠিক সেই সময় সপ্রতিভ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল: মা-কালীকে নিন্দা করায় তিনিই মেমদি'র মুখে কালি মাখিয়ে হনুমান করে দিয়েছেন। করবে আর মা-কালীর নিন্দা ?

ইহার পর ঘটনার স্রোত এমন ভাবে প্রবাহিত হয়, চণ্ডীর অদৃষ্টে যাহা শাপে বর স্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়। চণ্ডীর বিরুদ্ধে সাতকড়ি সামন্ত ও খৃষ্টকুমারীর অভিযোগ 'উল্টা বুঝিলি রাম' হইয়া দাঁড়ায়—বাশুলীর ভূস্বামী হরিনারায়ণ গাঙ্গুলী এই তেজস্বিনী মেয়েটিকে বধূর মর্যাদা দিয়া বাশুলীর শুদ্ধান্তে লইয়া যান এবং চণ্ডীর প্রার্থনায় গাছতলার সেই অনাড়ম্বর পাঠশালা সাড়ম্বরে সুরম্য অট্টালিকা আশ্রয় করিয়া 'চণ্ডী বিদ্যাপীঠে' পরিণত হয়। পক্ষান্তরে, বহু দিনের চর্চ মিশন বালিকা-বিদ্যালয়টির দরজা ছাত্রীর অভাবে আপনিই বন্ধ হইয়া যায়।

এই অভাবনীয় বিপর্যয় এ অঞ্চলের অধিবাসীদের পক্ষে বিশেষ আনন্দময় হইলেও দুইটি অন্তর ক্ষোভে ও বিষাদে মুসড়াইয়া পড়ে। তাহারা হইতেছে—নায়েব সাতকড়ি সামন্ত এবং মিশনারী বিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষয়িত্রী মিস্ খৃষ্টকুমারী। নায়েব মনে মনে গুমরাইতে থাকে এবং জমিদারের জ্যেষ্ঠ পুত্রের অকর্ম্মণ্যতার কথা ভাবিয়া কতকটা শান্তি লাভও করে। কিন্তু বৎসরান্তে যখন স্তব্ধ-বিস্ময়ে সকলে একদা শুনিল যে, স্পর্শমণির সংস্পর্শে বাগুলী-পরিবারের মরিচাধরা লোহাও সোনা হইয়া গিয়াছে, তখন দীর্ঘকাল পরে নায়েবের নাক দিয়া আর একটা দীর্ঘনিশ্বাস বাহির হইয়া পড়ে। তথাপি, এইটুকুই তাহার পক্ষে সান্ত্বনার বিষয় ছিল যে, বিবাহের পর সেই যে কবিরাজের মেয়ে শ্বশুরালয়ে গিয়াছে, আর ফিরিয়া আসে নাই এবং জমিদার হুজুরের সহিত করালী কবিরাজেরও বিশেষ ঘনিষ্ঠতা বা বাধ্যবাধকতা ঘটে নাই। কিন্তু সম্প্রতি সহসা কাছারী-বাড়ী-সংলগ্ন আবাস-ভবন ও খোলা জমিগুলিকে লইয়া বিদ্যা ছড়াইবার নির্দেশ আসিতেই সাতকড়ি সামন্তের প্রখর দৃষ্টির উপর অতীতের সেই অপ্রীতিকর ঘটনাটি পুনরায় সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। অমনি তাহার মাথায় রোক চাপিয়া যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে মহকুমা হাকিমের কেরাণী—শ্যালক শ্রীপতি শ্রীমানির সহিত চক্রান্ত করিয়া ব্যাপারটি কিরূপ বিঘ্নময় ও বিপজ্জনক করিয়া তুলে—তাহা চণ্ডীর বান্ধবী গৌরীর মুখেই প্রকাশ পাইয়াছে।

তেইশ

পূর্বোক্ত ঘটনার পর মিশনারী বিদ্যালয়টী উঠিয়া গেলে মিশনের কর্তৃপক্ষগণ তদন্তের জন্য যে কমিশন পাঠাইয়াছিলেন, তাহাতে মিস্ খৃষ্টকুমারীই দায়ী ও দোষী সাব্যস্ত হন এবং তদনুসারে কর্তৃপক্ষ ছয় মাসের জন্য খৃষ্টকুমারীকে বরখাস্ত করিয়া রাখেন। হেরিস এই সময় সুখ্যাতির সহিত আই, সি, এস পরীক্ষায় পাস করিয়াছে খবর বাহির হয়। ভ্রাতার এই সাফল্যে খৃষ্টকুমারীর বিমর্ষ অন্তর আনন্দে উদ্দীপিত হইয়া উঠে। বিস্তারিত পত্রে সে শ্যামাপুরের সকল কথা—নিজের ত্রুটিগুলি অবশ্য চাপিয়া—দাদাকে লিখিয়া পূর্ব হইতেই প্রস্তুত করিয়া রাখে। হেরিসের খুঁটির জোর থাকায় ভারতে ফিরিয়াই প্রথমে সে বীরভূমে চাকরী পায়, তাহার পরেই সুপারিস ধরিয়া প্রেসিডেন্সী ডিভিসনের সদরে এস, ডি, ও'র পদে বদলী হইয়া আসে। ইতিমধ্যে খৃষ্টকুমারীও বালিকা স্কুল পরিদর্শিকার কাজে বাহাল হইয়া দাদার সঙ্গেই একত্র বসবাস করিতে থাকে। শ্যামাপুরের লাঞ্ছনার কথা এ-পর্যন্ত খৃষ্টকুমারী বিস্মৃত হয় নাই—হেরিসের প্রত্যাবর্তনের দিন গণনা করিতে করিতে সে শ্যামাপুরের অতীত স্মৃতি অনাগত কল্পনার তুলিতে আরো নিবিড় করিয়া তুলিয়াছে। ভগিনীর প্রতি হেরিসের স্নেহের অন্ত নাই এবং ভ্রাতা ও ভগিনীর অন্তর্নিহিত দম্ভ ও হঠকারিতা একই ধারায় বহিয়া থাকে। খৃষ্টকুমারীর কথাই যে সত্য—শ্যামাপুরের মিশনারী বিদ্যালয়টি বন্ধ হইবার মূলে স্থানীয় জমিদারের প্রভাব যে পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান—এ বিষয়ে হেরিস নিঃসন্দেহ। মিশন কর্তৃপক্ষকেও এ কথা জানাইয়া সে তাহাদের নির্বাচিত তৎকালীন কমিশনকে আক্রমণ করিতেও দ্বিধা করে নাই। মিশন কর্তৃপক্ষও এই ব্যাপারে পরিতুষ্ট হইয়া হেরিসের মত পদস্থ খৃষ্টান সরকারী অফিসারকে বহু ধন্যবাদ দেন এবং খৃষ্টকুমারীকে

যে ছয় মাস সাসপেণ্ড করিয়া রাখা হইয়াছিল, তৎকালের পূর্ণ বেতন দিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়া জানান যে, মিঃ হেরিস ও মিস খৃষ্টকুমারীর প্রচেষ্টায় শ্যামাপুরের বিদ্যালয়টির রুদ্ধ দ্বার পুনরুদ্‌ঘাটিত হইলে মিশনের যেমন মুখোজ্জ্বল হইবে, মিশনারী-মহলে তাঁহারাও তেমনি বিপুল প্রতিষ্ঠা পাইবেন।

হেরিস ইহার পর শ্যামাপুরের মিশনারী স্কুলটির ব্যাপারেই তাহার সমগ্র শক্তি ও উদ্যম নিয়োগ করিল। গবর্ণমেণ্টের সহিত লেখালেখি করিয়া সে এমন এক গোয়েন্দাকে এ কার্যে বাহাল করিতে সমর্থ হইল— কতকগুলি রাজনৈতিক মামলার তদন্ত ব্যাপারে যাহার দক্ষতা প্রকাশ পাইয়াছে এবং ধর্মের দিক দিয়া সে ব্যক্তিও খৃষ্টান। তাহার প্রকৃত নাম মিঃ আলম, কিন্তু তদন্ত কালে বিভিন্ন নাম ও বেশ আশ্রয় করিয়া থাকে। এস, ডি, ও'র নির্দেশ মত একদা সেই ব্যক্তি শ্যামাপুর পুলিশ-ষ্টেশনে আসিয়া মিশনারী বিদ্যালয়ের ফাইল দেখিতে চাহিল। স্কুলের সভায় যে বিভ্রাট ঘটিয়াছিল, খৃষ্টকুমারী পুলিশ থানায় সে সম্পর্কে যখন অভিযোগ করিয়াছিল, সত্যেন সান্যাল নামে এক বিচক্ষণ বর্ষীয়ান ব্যক্তি সে সময় ছিল শ্যামাপুর থানার দারোগা—মিস্ খৃষ্টকুমারীর ঔদ্ধত্য ও হঠকারিতা তাহার অবিদিত ছিল না; কাজেই তাহার নালিসের উপর তৎকালে উক্ত বিচক্ষণ দারোগাটি বিশেষ কোন গুরুত্ব দেয় নাই। এত দিন পরে সেই পুরাতন গুরুত্বহীন ব্যাপারটি সম্পর্কে মহকুমা হাকিমকে এরূপ উৎসাহী দেখিয়া দারোগা সত্যেন সান্যাল প্রথমে ত খুবই কৌতুক বোধ করে; কিন্তু পরে হাকিমের সঙ্গে সেদিনের সেই প্রগলভা মেম সাহেবটির সম্বন্ধের কথা জানিতে পারিয়া বুঝি একেবারে আকাশ হইতে আছাড় খাইয়া পড়ে। তৎক্ষণাৎ আলম সাহেবকে খাতির করিয়া বসাইয়া পুরাতন ফাইল বাহির করিতে রীতিমত ব্যস্ত হইয়া উঠে। কিন্তু তৎকালের ডায়েরীর পাতায় মিস্ খৃষ্টকুমারীর অনুকূলে এমন কোন

সঙ্গীন মন্তব্য দেখা গেল না, যাহার উপর জোর দিয়া সেদিনের তিলের মত ব্যাপারটিকে বৃহৎ একটি তালে পরিণত করা যাইতে পারে। গোয়েন্দা আলম ডায়েরী বহির উক্ত অংশটির নকল টুকিয়া লইয়া গেল। দারোগা সান্যাল বুঝিল যে, এই অকিঞ্চিৎকর ব্যাপারটির স্রোত অনেকদূর পর্যন্ত গড়াইবে এবং বহু সুস্থ ব্যক্তিকে অকারণ ব্যস্ত করিয়া—বহু ভরা ডুবাইয়া দিয়া রীতিমত একটা আতঙ্কের শিহরণ তুলিবে। নবাগত এই মহকুমা হাকিমটির মেজাজ লইয়া ইতিমধ্যেই অনেক কথা উঠিয়াছে এবং তাহার পিছনে মস্ত এক প্রতিপত্তিশালী মিশনারী মুরুব্বীর সুপারিশ থাকায় 'সরকারের পুষ্যিপুত্তুর' বলিয়া এই হেরিস হাকিমের নামের আগে বিশেষণ বসিয়া গিয়াছে। কাজেই ভগিনী খৃষ্টকুমারীর প্রতি সেদিনের গ্রামবাসীর অপ্রীতিকর ব্যবহারগুলি নিক্তির ওজনে মাপিয়া এত দিন পরে সহসা কাজীর বিচারের ব্যবস্থা করাও এই হাকিমের পক্ষে অসম্ভব নহে। সান্যাল দারোগার এই অনুমান মিথ্যা হয় নাই। দুই দিন পরেই হেরিসের নিকট হইতে আহ্বান আসিল—দারোগা যেন সেই সময়কার ডায়েরী বহি ও আনুষঙ্গিক ফাইল-পত্র লইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করে। এই সাক্ষাৎকারের ফল কিন্তু শুভ হইল না; এমন একটা গুরুতর ব্যাপারকে উপেক্ষা করিয়া দারোগা কর্তব্যের ত্রুটী করিয়াছে, এইরূপ রূঢ় মন্তব্য প্রয়োগ করিয়া বসিল হাকিম হেরিস পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে খাতা-পত্র সব পরীক্ষা করিয়া। দারোগা তাহার অনুকূলে যে সকল যুক্তি প্রদর্শন করিতে চাহিল—বলপূর্বক শ্যামাপুরের মিশনারী বিদ্যালয় বন্ধ করিয়া দেওয়া হয় নাই বলিয়া যে সকল বাস্তব ঘটনা শুনাইল—হেরিস তাহা সাজানো ও অবাস্তব বলিয়া উড়াইয়া দিল। তখন বাধ্য হইয়া কতকটা দৃঢ়তার সুরেই সত্যেন সান্যালকে বলিতে হইল: হাকিম যখন কোন কথাই বিশ্বাস করছেন না, তখন আমি নাচার। কিন্তু আপনি যদি অকুস্থলে গিয়ে তদন্ত করতে চান, তাহলে সে সময়কার

প্রত্যক্ষদর্শীদের কাছ থেকেও ঠিক এই কথাই শুনবেন। মেম সাহেব নিজেই চণ্ডী দেবীর গাছতলার পাঠশালায় চড়াও হয়েছিলেন—দু'জন দাসী এক জন উড়ে বেয়ারা তাঁর সঙ্গে গিয়েছিল। তিনিই জোর করে দু'টো মেয়েকে টানা-হেঁছড়া করেছিলেন। সেই সময় উত্তেজনায় নিজেই অসুস্থ হয়ে পড়েন। স্কুলের সভাতেও তিনিই আগে চণ্ডী দেবীর গালে চড় মেরেছিলেন—তার পরে টেবিল শুদ্ধ মেম সাহেব পড়ে যান। আর চণ্ডী বিদ্যাপীঠ গ্রামের লোকে বসায়নি—বাগুলীর জমিদার ঐ স্কুল তৈরী করে দিয়েছেন ; চণ্ডী দেবী তাঁরই কুলবধূ হয়েছেন।

হেরিস এই সকল কথা শুনিতে শুনিতেই অসহিষ্ণু হইতেছিল, কথা শেষ হইতে বলিল : এ সবই সাজানো প্লট। আপনি ডায়েরী-বুকে যে মন্তব্য লিখে রেখেছেন—তারই ওপরে ভিত্তি করে ঘটনাটি সাজিয়ে আমাকে শোনাচ্ছেন। সাক্ষীদের কোন জবানবন্দী লেখেননি, তদন্তই আপনি করেননি।

দারোগা বলিল : মেমসাহেব যদি আদালতে দরখাস্ত করতেন, আর হাকিম সেই দরখাস্ত সম্বন্ধে তদন্তের হুকুম দিতেন, আমাকে নিশ্চয়ই তখন অকুস্থলে গিয়ে উভয় পক্ষের এজাহার এবং সাক্ষী-সাবুদদের জবানবন্দী নিতে হতো। কিন্তু এই ঘটনা যখন আদালত পর্যন্ত গড়ায়নি তখন পুলিশ থানায় এসে কেউ ডায়েরী করলে, তার গুরুত্ব বুঝে থানা-অফিসারের পক্ষে যেটুকু কর্তব্য আমি তাই করেছিলাম।

হেরিস ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল : আপনি ওঁর নালিশটাকেই উপেক্ষা করেছিলেন—কোন গুরুত্বই ওর মধ্যে দেখেননি।

সান্ন্যাল দারোগা উত্তর করিল : সে কথা ত আমি আগেই বলেছি স্যার ! ব্যাপারটি মোটেই গুরুত্বপূর্ণ অর্থাৎ কগনিজেবল (Cognigable) ছিল না !

টেবিলের উপর সজোরে হাতের একটা চাপড় দিয়া হেরিস হাকিম

হুঙ্কার করিল: তখন ছিল না, আর এখন সেই তুচ্ছ ব্যাপারটাকে আমি গুরুত্ব দিতে চাইছি, এই কথা আপনি বলতে চাইছেন—এই ত? বেশ, আপনি এখন যেতে পারেন—আমার হুকুম আপনি পরে পাবেন।

সেদিন সত্যেন সান্যালের সহিত হেরিসের এই সব কথাবার্তার কিছু পরেই হাকিমের সেরেস্তার কেরাণী শ্রীপতি শ্রীমানি শ্যামাপুর কাছারীর ব্যাপারটা সুযোগ মত হেরিসকে শুনাইয়া দিল। বলা বাহুল্য, হাকিমের মেজাজের সহিত খাপ খাওয়াইয়া এমন করিয়া সাজাইয়া ব্যাপারটি শ্রীমানি পরিবেষণ করিল যে, হেরিস ভালো ভাবেই তাহার গুরুত্ব উপলব্ধি করিল এবং ইহাও বুঝিল যে, বর্তমান অবস্থায় শ্যামাপুর কাছারীর নায়েবের সহযোগিতা উক্ত তদন্ত ব্যাপারে বিশেষ কার্যকরী হইবে। হেরিসের নির্দেশ মত পরদিনই শ্রীমানি তাহার ভগিনীপতি সাতকড়ি সামন্তকে আদালতে লইয়া আসিল এবং টিফিনের সময় হাকিমের খাস-কামরায় গিয়া উভয়েই লম্বা সেলাম করিয়া দাঁড়াইল। হেরিস করমর্দন করিয়া সাতকড়ির মাথা ঘুরাইয়া দিল—মহকুমা হাকিমের হাতের পরশ পাইয়া এবং তাহার পার্শ্বে কেদারায় বসিয়া সাতকড়ি ভাবিল যে, শ্যালক শ্রীমানির দৌলতেই তাহার জীবনে এত বড় সম্মান ঘটিয়া গিয়াছে। সে তখন উল্লাসের উচ্ছ্বাসে চণ্ডীর সম্পর্কে এমন অনেক কথা শুনাইল হাকিম সাহেবকে—যাহার প্রতিটি সাহেবের কাছে অভিনব, অপ্রত্যাশিত এবং তাহার ভগিনী খৃষ্টকুমারীর মূল অভিযোগের আশ্চর্যরূপ পরিপোষক। চণ্ডীর কুমারী-জীবনের নানা তথ্য রসান দিয়া সে হাকিমকে শুনাইল—তাহার সম্বন্ধেও সেই দুরন্ত মেয়েটি যে অশোভন ব্যবহার করিয়াছিল, তাহাও আর্ত কণ্ঠে অতিরঞ্জিত করিয়া বলিয়া গেল। কেবলমাত্র স্ত্রীলোক বলিয়াই নায়েব সেদিন নীরবে সেই অপমান সহ্য করিয়াছিল। আর—মেমসাহেবকে জব্দ করিবার জন্য যে রীতিমত একটা চক্রান্ত হইয়াছিল, চণ্ডী যে প্রথম দিন তাঁহার গায়ে হাত দিয়াছিল—বিষাক্ত সূঁচ ফুটাইয়া দেওয়াতেই

মেমসাহেব অজ্ঞান হইবার মত হন, তাহার পর সভায় টেবিল চাপা দিয়া তাঁহাকে খুন করিবার মতলব করিয়াছিল, এ সকল কথা যে সত্য, তাহা সে হলপ করিয়া বলিতে পারে। সাতকড়ি সামন্তের কথা শুনিতে শুনিতে হেরিস এতই উত্তেজিত হইয়া উঠে যে, তাহার মনে হইতেছিল, চাপরাশি পাঠাইয়া বাসা হইতে এখনি খৃষ্টকুমারীকে লইয়া আসে—শ্যামাপুরের এই বিশ্বস্ত সত্যবাদী মানুষটির কথাগুলি সেও স্তব্ধ হইয়া শোনে। ইহার পর হেরিস সাতকড়িকে এই বলিয়া আশ্বাস দেয় যে, সে দৃঢ় হইয়া বসিয়া থাকুক ; জমিদার তাহাকে কাছারী-বাড়ীতে সমিতি বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠান বসাইবার জন্য যতই পীড়াপীড়ি করুক, সে যেন তাহাতে কর্ণপাত না করে। বলপূর্বক কিছু করিতে চাহে ত তাহার আভাস পাইবা মাত্র যেন হেরিসকে জানানো হয়, সে তাহার যথোচিত ব্যবস্থা করিবে—সঙ্গে সঙ্গে ১৪৪ ধারা জারি হইয়া যাইবে। শীঘ্রই একটি দিন নির্দিষ্ট করা হইবে, সেই দিন যাবতীয় সাক্ষী-সাবুদ প্রস্তুত রাখা চাই। শ্যামাপুরেই ক্যাম্প বসাইয়া তাহাদের এজাহার লওয়া হইবে।

মহকুমা হাকিমের সহিত হাত মিলাইয়া ও তাহার নিকট ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে প্রচুর আশা-ভরসা পাইয়া সাতকড়ি সামন্ত ও তাহার শ্যালক শ্রীপতি শ্রীমানি প্রফুল্ল মনে দল পাকাইতে লাগিল। ইহার পরে হাকিমের বাসাতে পরামর্শ বসিল এবং খৃষ্টকুমারীর উপস্থিতিতে একটা চরম সিদ্ধান্ত স্থির হইয়া গেল। অতঃপর সাতকড়ি সামন্ত সবিনয়ে নিবেদন করিল—কাছারী-বাড়ীতেই যখন প্রচুর স্থান রহিয়াছে, আলাদা করিয়া আর ক্যাম্প বসাইবার কি প্রয়োজন ? হুজুরের হুকুম হইলে কাছারী-বাড়ীর সুবৃহৎ প্রাঙ্গণে ম্যারাপ বাঁধিয়া সামিয়ানা খাটাইয়া হাকিমের এক বিরাট দরবার বসানো যাইতে পারে। সেখানে অনেকগুলি বড়-বড় ঘরও আছে, হুজুররা ইচ্ছা করিলে দুই-চারি দিন থাকিয়া যাইতেও পারেন। নায়েব সাতকড়ি সামন্তের প্রস্তাব খৃষ্টকুমারীর খুবই মনঃপূত হয় ; শ্যামাপুরে একবার

হাকিমের ভগিনীরূপে রীতিমত দপদপার সঙ্গে টহল দিবার ফুরসদও সে ইদানীং খুঁজিতেছিল; সুতরাং প্রস্তাবটি তৎক্ষণাৎ গৃহীত হইল এবং হাকিম কাছারী-বাড়ীতেই বিপুল সমারোহে তাহার বিশেষ এজলাস বসাইবার সিদ্ধান্তে সম্মতি দিল। নায়েবকে আরও নির্দেশ দেওয়া হইল যে, ঢোল সোহরতে সমগ্র অঞ্চলে এ কথা—হাকিমের উপস্থিতির কথা রাষ্ট্র করিবে, মিশনারী বিদ্যালয়ের পুরাতন দাস-দাসী, দারোয়ান, ছাত্রী ও স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ ঐ দিন যাহাতে হাজির হয় সে ব্যবস্থাও করা চাই।

হাকিমের হুকুম অক্ষরে অক্ষরে পালন করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া সাতকড়ি শ্যামাপুরে ফিরিয়া আসিবার এক সপ্তাহ পরেই শ্রীপতি শ্রীমানি হাকিমের নির্ধারিত দিনটি সাতকড়িকে জানাইয়া বলিল যে, হুজুর ষ্টেশন হইতে সরাসরি কাছারী-বাড়ীতে আসিয়া ঠিক দুইটার সময় সভায় বসিবেন। ষ্টেশন হইতে মিছিল করিয়া হুজুরদের আনিতে হইবে। হুজুররা যাহাতে খুব খুসি হন, সেই ভাবে সব সাজাইতে হইবে—হুজুররা হয়ত দুই-চারি দিন থাকিয়া যাইতেও পারেন। সেই বুঝিয়া হুজুরদের জন্য খানা-পিনার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

এই খবর পাইয়া সাতকড়ির আর আনন্দ ধরে না। মহকুমার মালিক তাহার আতিথ্য গ্রহণ করিতেছেন, সকলের সমক্ষে তাহাকে তোয়াজ করিবেন এবং তাঁহার জন্যই শ্যামাপুরের কবিরাজের সেই দজ্জাল মেয়েটার হুকুম যে রদ করা সম্ভব হইয়াছে—এতগুলি কারণ-পরম্পরাতেই তাহার এত আনন্দ। সেই দিন হইতেই সাতকড়ি একাই সহস্র হইয়া উদ্যোগ-আয়োজনে প্রবৃত্ত হইল, কাছারীর কর্মচারীদের আহার-নিদ্রার অবসর রহিল না।

ইতিমধ্যে শ্যামাপুর থানার দারোগাও মহকুমা হাকিমের সেরেস্তা হইতে এক হুকুমনামা পাইল। হাকিমের শ্যামাপুর পরিদর্শনের দিন নির্দিষ্ট করিয়া তাহাকে জানানো হইয়াছে যে, সে যেন তাহার কনেষ্টবল ও

চৌকিদারদের লইয়া ষ্টেশনে বেলা একটার সময় উপস্থিত থাকে ; কারণ ঐ সময় ট্রেনযোগে হাকিমের শ্যামাপুর ষ্টেশনে অবতরণের ব্যবস্থা স্থির হইয়াছে। দারোগাকে ইহাও জানানো হইয়াছে যে, শ্যামাপুর কাছারীর নায়েব শান্তিরক্ষাকল্পে সাহায্য চাহিলে দারোগা যেন সর্বতোভাবে তাহাকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত থাকে।'

নির্দিষ্ট দিনের পূর্বেই কাছারী-বাড়ীর বাহির ও ভিতরের ঘরগুলি চুণকাম করাইয়া, প্রাঙ্গণে সুবৃহৎ মেরাপ বাঁধাইয়া ও ফটকের দুইপার্শ্বে বড় বড় দুইটি তোরণ নির্মাণে দক্ষ লোক লাগাইয়া সাতকড়ি সারা গ্রামের মধ্যে একটা আলোড়ন তুলিল। বহু লোক নিযুক্ত করিয়া এবং মুক্তহস্তে তহবিলের টাকা ছড়াইয়া নির্দিষ্ট দিনটির এক দিন পূর্বেই ভিতর-বাহিরের কাজগুলি সব সুষ্ঠু ভাবে সম্পন্ন করিয়া ফেলিল। এই ব্যাপারে হাকিমের মঞ্জুরীতে শ্রীপতি এক সপ্তাহের ছুটিও বাগাইয়া লইয়াছিল। সম্প্রতি সাতকড়ি ও শ্রীপতির পরিজনবর্গ দেশের বাড়ীতে কোন ক্রিয়াকর্ম উপলক্ষে গিয়াছিল। সাতকড়ির নির্দেশে এই সময় শ্রীপতি তাহাদিগকে আনিতে গেল। এই সূত্রে হাকিমের ভগিনীর সহিত পরিজনদের পরিচিত করিয়া দিবার সুযোগ ত্যাগ করা বুদ্ধিমানের কাজ নহে—চারি দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কাজ করিতে সাতকড়ি বরাবরই অভ্যস্ত। নির্দিষ্ট দিনের পূর্ব দিন অপরাহ্ণে সাতকড়ি ডাকযোগে প্রাপ্ত পত্রে অবগত হইল—শ্রীপতি সকলকে লইয়া উৎসবের দিন প্রথম ট্রেণে বেলা ঠিক আটটার সময় শ্যামাপুর ষ্টেশনে নামিবে—সে সময় যেন দুইখানি পাল্কীর ব্যবস্থা থাকে। সাতকড়ির মনে যেটুকু উদ্বেগ ছিল, এই পত্র পাইয়া তাহাও ঘুচিয়া গেল—সে এখন প্রসন্ন-মনে দেখিল যে, চারি দিকেই সুসার ও সুপ্রতুল ব্যবস্থা, অদৃষ্ট-দেবতা তাহার প্রতি একান্ত সদয়।

উৎসবের আগের দিনেই সুন্দরভাবে সজ্জিত শ্যামাপুর গ্রামখানি জমিদারীর কাছারী-বাড়ীকে পরিবেষ্টন করিয়া যেন জম-জম করিতেছে।

গ্রামের অধিবাসীদের মধ্যে এই উৎসব সম্পর্কে কত কথাই চলিয়াছে। তাহারা শুনিয়াছে—মিশনারী স্কুলের সেই মেম দিদিটি এত দিন পরে তাহার হাকিম দাদাটির সহিত শ্যামাপুরে আসিতেছে ; কাছারী-বাড়ীতে হাকিমের এজলাস বসিবে এবং এমন সংবাদও তাহারা পাইয়াছে যে, মেম দিদিকে লইয়া বৎসরাধিকপূর্বে যে অপ্রীতিকর কাণ্ড ঘটিয়াছিল, হাকিম নাকি তাহারই তদন্তে আসিতেছেন। এ অবস্থায় এরূপ উৎসবের মধ্যেও একটা আতঙ্ক জনিত উদ্বেগের ভাবও প্রকাশ পাইয়াছে।

চব্বিশ

কাছারী-বাড়ীর ঘড়িতে এই মাত্র এগারোটা বাজিয়া গিয়াছে। প্রত্যেক ঘণ্টায় পেটা-ঘড়ির এই শব্দ সমগ্র গ্রামখানিকে সচকিত করে। ঘড়ির শব্দের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সাতকড়ি সামন্ত রাত্রির ভোজন সারিয়া কাছাড়ী-বাড়ীর সেরেস্তার ফরাসে আসিয়া বসিল। এক জন ভৃত্য তাড়াতাড়ি গড়গড়ার জল ফিরাইয়া ফরাসের মাঝখানে রাখিল। একটু পরেই রাখাল বক্সী তাওয়াদার কলিকাটি তৈয়ারী করিয়া আনিয়া গড়গড়ার মাথায় বসাইয়া দীর্ঘ নলটি প্রভুর হাতে দিল। মুহুরীরা খোসগল্পের জন্য কর্তার প্রতীক্ষা করিতেছিল। প্রসন্ন মনে কর্তা সটকার সুদৃশ্য মুখটি নিজের মুখ-বিবরে দিয়া দুই-এক ঝলক ধূম্রোদ্‌গীরণ করিয়াছে, এমন সময় বক্সী বলিল : শুনেছেন হুজুর, চণ্ডী বিদ্যাপীঠের পিছনের জমিতে আজ সাঁঝের বেলায় বিস্তর ইট এসে পড়েছে, আর সেই থেকে কেবলই আসছে।

তাম্রকূটের ধূম্রসেবনে নিরস্ত হইয়া বক্সীর দিকে তাকাইয়া বিস্ময়ের সুরে সামন্ত বলিল : বলিস্ কি ?

করযোড়ে বক্সী বলিল : এজ্ঞে। সেবার ঐ বাড়ী বানাবার সময় যেমনি করে চার দিক কানাত দিয়ে ঘিরেছ্যালো, এবারও ঠিক তেমনিতর

হয়েছে। শুনতে পেনু—গাঙের ধারে যত সব ইটখোলা আছে, বাশুলীর সরকার থেকে হুকুম হয়েছে—বেবাক ইট সব ওহানে চালান দেবে।

সাতকড়ি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া কি ভাবিল; পরক্ষণে সোজা হইয়া বসিয়া উৎসাহের সুরে বলিল: হোয়েছে, বোঝা গেছে হে! এখানে হালে পানি না পেয়ে কবরেজের মেয়ে সাবেক বাড়ীর পিছনেই ইট গাড়বার মতলব করেছে। আমি ত বলেছিলাম, হাকিম যখন না করেছে, এদিকে আর হাত দিতে সাহস পাবে না। জানে ত, বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা!

এই ঘটনার খানিক পূর্বে শ্যামাপুরের উপকণ্ঠে অভিনব এক অভিযাত্রী দল নিঃশব্দে অগ্রসর হইতেছিল। ক্রমশঃ তাহারা গ্রামের মধ্যে ঢুকিয়া সর্পিল গতিতে কাছারী-বাড়ীর পথ ধরিল।

এই বিচিত্রদলটির অপরূপ আকৃতি ও গতিভঙ্গি। কতকগুলি অশ্বারোহী পুরোভাগে; পিছনে পল্লী-অঞ্চলে পরিচিত কুখ্যাত রণপেয়ে পাইক দল। এক-এক জোড়া বাঁশের গাঁটে দুই-দুই পা রাখিয়া অতি দ্রুতগতিতে ধাবমান অশ্বারোহীদের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই অনুগমন করিতেছিল। শ্যামা-পুরের বাসীন্দারা এই নিশুতি রাত্রিতে নিদ্রাচ্ছন্নই ছিল; ক্বচিৎ কেহ কেহ জাগ্রতাবস্থায় এই অভিযাত্রী-দলকে দেখিবামাত্র আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিয়া দুর্গা-নাম স্মরণ করিতে থাকে। তাহাদের ধারণা যে,—গ্রামে দস্যুদল প্রবেশ করিয়াছে। কতিপয় প্রত্যক্ষদর্শী গ্রামবাসী এইরূপ সাংঘাতিক অভিযাত্রী দলটিকে দেখিয়া, গুপ্তপথে দলবদ্ধভাবে উর্ধ্বশ্বাসে জমিদারী কাছারীতে উপস্থিত হইয়া সরাসরি সেরেস্তার মধ্যে ফরাসে উপবিষ্ট ধূম্রপান-রত সাতকড়ি সামন্তকে কম্পিত কণ্ঠে আর্তস্বরে জানাইল: ডাকাত, নায়েব মশাই—ডাকাত! সর্বনাশ হলো!

শুনিবামাত্র সেরেস্তার সকলেই চমকিয়া উঠিল; সাতকড়িও চঞ্চল হইয়া জিজ্ঞাসা করিল: ডাকাত! কোথায় রে? এমন সময় ডাকাত?

উত্তর করিল গ্রামবাসীরা: গ্রামে এসেছে—স্বচক্ষে দেখেছি, ঘোড়সওয়ার, রণপেয়ে—অনেক, অনেক—

আর এক গ্রামবাসী বলিল: মওড়ায় আবার মেয়ে লোক—মেয়ে ডাকাত গো!

এরূপ অদ্ভুত ও অবিশ্বাস্য কথায় সহজে প্রত্যয় হয় না, নায়েবের মনে কথাটা আর এক সন্দেহ জাগাইল—হাকিম এলেন না ত তাঁর ভগিনীকে লইয়া?…সঙ্গে সঙ্গে বক্সীকে জিজ্ঞাসা করিলেন: ভুলে, পাঁজা এরা সব কোথায় রে—ডাক দেত।

বক্সী সবিনয়ে বলিল: এজ্ঞে, তেনারা ওহানে ইটগাড়া দেখতে গেছে যে।

মুখখানা বিকৃত করিয়া নায়েব বলিল: আ-মর, খেয়ে-দেয়ে আর কাজ নেই—ডেকে আন তাদের, শীগগির—

বক্সী মুক্ত দরজা পর্যন্ত গিয়াই শিহরিয়া চেঁচাইয়া উঠিল: ওরে বাবা! লায়েব মশাই গো—এসে পড়েছে, সামলাও।

.বক্সী যেরূপ দ্রুতপদে দরজার দিকে গিয়াছিল, ততোধিক দ্রুতগতিতে পিছাইয়া আসিয়া ফরাসের তক্তপোষের পাশে জানু পাতিয়া বসিয়া পড়িয়া ঠক-ঠক করিয়া কাঁপিতে লাগিল। বাহির হইতে তখন মানুষ ও ঘোড়ার পদশব্দের সঙ্গে মিশ্র এক কর্কশ ধ্বনি শোনা যাইতেছিল এবং শব্দের সঙ্গে সঙ্গে ঘরের সকলকে স্তব্ধ করিয়া প্রবেশ করিল কথিত অভিযাত্রী দলের অগ্রবর্তিনী দুই মহিলা ও তাহাদের সঙ্গী দল।

দীর্ঘ শটকাটি হাতে করিয়া স্তম্ভিত ভাবে তাহার ঠিক পুরোভাগে দণ্ডায়মানা তেজস্বিনী নারীমূর্তির দিকে নিষ্পলক নয়নে চাহিয়া রহিল সাতকড়ি সামন্ত। কিন্তু পরক্ষণে দীর্ঘাকৃতি বলিষ্ঠ দেহ—মাথায়-কোমরে লাল কাপড়ের ফেট্টি-বাঁধা এক প্রৌঢ় ছুটিয়া আসিয়া সাতকড়ির হাত হইতে সটকাটি সবেগে ছিনাইয়া দূরে নিক্ষেপ করিয়া কর্কশ কণ্ঠে কহিল:

এইও বেয়াদপ, বসে থাকতে সরম লাগছে না মনে? দেখতে পাচ্ছ না সামনে দাঁড়িয়ে কে! তোমার হুজুরাইন—বাশুলীর বৌ রাণী!

কথার সঙ্গে সঙ্গে সেই ব্যক্তি দৃঢ় হস্তে সাতকড়ির ঘাড়টি চাপিয়া ধরিয়া সোজা করিয়া তুলিয়া দিল। সাতকড়ি সামন্তর কম্পিত কণ্ঠ হইতে ভগ্ন স্বর বাহির হইল: বৌ-রাণী—

পঁচিশ

কয়েক মিনিটের মধ্যেই ঘরখানির রূপ বদলাইয়া ঠিক যেন এজলাসে পরিণত হইয়াছে। ফরাসের কাছেই তিনখানি চৌকী পড়িয়াছে। মাঝ-খানের চৌকিতে চণ্ডী বসিয়াছে। তাহার এক দিকে গৌরী, অন্য দিকে গোবিন্দনারায়ণ। বিস্তীর্ণ ফরাসটি আবৃত করিয়া বসিয়াছেন ডাক্তার রায়, রাজীব ও এক দল স্বেচ্ছাসেবক কর্মী। বিশ-পঁচিশ জন যোয়ান ব্যক্তি ঘরের দ্বারগুলি আগলাইয়া দাঁড়াইয়া আছে—ইহারাও চণ্ডীর সঙ্গে বাশুলী হইতে আসিয়াছে। ঘরের এক দিকে নায়েব সাতকড়ি সামন্ত ও তাহার দুই মুহুরী বিচারাধীন আসামীর মত নতমুখে দণ্ডায়মান। যে কয়-জন গ্রামবাসী কিছু পূর্বে সংবাদ দিতে আসিয়াছিল, তাহারা এবং নায়েব সাতকড়ির অনুগত ভৃত্য রাখাল বক্সী ঘরের দেওয়াল ঘেঁসিয়া দাঁড়াইয়া বলির পাঁঠার মত তখনও পর্যন্ত কাঁপিতেছিল। বাশুলীর বাবুদের প্রতাপের কথা ইহাদের অজ্ঞাত নয়, এই গ্রামের কন্যা এবং ঐ বংশের বধূরাণীর খ্যাতির কথাও তাহারা শুনিয়াছে, কিন্তু ঘটনাচক্রে আজ ইহারা বিরোধী পক্ষের মতই কাছারী-বাড়ীতে আটকাইয়া পড়িয়াছে; ভাবিতেছে, কি দুর্গতি ইহাদের অদৃষ্টে আছে কে জানে?

রাখাল বক্সী এবং মুহুরীরা ভাবিতেছিল, বউরাণীর হুকুম অমান্য করিয়া মহকুমার হাকিমের ভরসায় নায়েব মহাশয় যে কাণ্ড করিয়াছেন, তাহার

দণ্ড দিতে সরেজমিনে যখন বউরাণী বঙ্কিমবাবুর উপন্যাসের দেবী চৌধুরাণীর মত জাঁকজমক করিয়া আসিয়া পড়িয়াছেন, তখন গোড়া হইতে সব কথা তিনি জানিতে চাহিবেন, যাহা বলা হইবে নিশ্চয় জেরা করিবেন, তাহার পর কি শাস্তির ব্যবস্থা করিবেন কে জানে ? তবে যে রকম তোড়-জোড় করিয়া আসিয়াছেন, একটা প্রলয় কাণ্ড না করিয়া ছাড়িবেন না, ইহা স্থির। কিন্তু চণ্ডী সে দিক দিয়াও গেল না, সে সম্বন্ধে নায়েব বা মুহুরীদিগকে কোন প্রশ্নও করিল না। শুধু নায়েবের দিকে একটি বার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া দৃঢ় স্বরে বলিল: আপনি বোধ হয় শুনে থাকবেন, বাগুলী ষ্টেট পরিচালনার ভার আমার হাতে এসেছে ? কাজেই এরই মধ্যে যেখানে যা-কিছু গলদ আছে, আমাকে খুঁজে-পেতে দেখে সব শুধরে নিতে হবে। সেই জন্যেই এ ভাবে আমাকে আসতে হয়েছে এখানে। আমি দেখলাম, এই কাছারীতে এসে অবধি আপনি এ পর্যন্ত একটি সনেরও হিসেব-নিকেশ দেননি, অথচ প্রায় এক যুগ ধরে আপনি ষ্টেটের অনেকগুলো বড় বড় মহলের তহশীলদারী করছেন। যখনই নিকেশ দেবার কথা উঠেছে, আপনি একটা-না-একটা ওজর তুলে পাশ কাটিয়েছেন। কিন্তু আমার আমোলে ওসব চলবে না ; প্রত্যেক কাজেই আমার হচ্ছে তাড়-ঘড়ি ব্যবস্থা। তাই এ ভাবে আমাকে তোড়-জোড় করে আসতে হয়েছে—এখানকার বিশৃঙ্খল ব্যাপারগুলোর বিলিবন্দেজ ও নিষ্পত্তি করবার জন্য। আপনি মুহুরীদের নিয়ে আপনার আমোলের এগারো বছরের পুরানো কাগজপত্র—হস্তবুদ, সেহা, কড়চা, থোকা, চিঠে, চেক-দাখিলার মুড়ি, খাতাখতেন—হিসেব-নিকেশের জন্যে যা-যা দরকার, সব গুছিয়ে নিন—এর জন্যে এক ঘণ্টা সময় আপনাকে দেওয়া গেল। ঠিক এক ঘণ্টা পরে ফটকে গাড়ী এসে দাঁড়াবে, আপনি আর আপনার এই দুই মুহুরী ঐ সব কাগজপত্র নিয়ে গাড়ীতে উঠবেন—হিসেব-নিকেশের শেষ না হওয়া পর্যন্ত আপনাদের বাগুলীতে থাকতে হবে।

স্পষ্ট করিয়া বিঁধাইয়া বিঁধাইয়া কথাগুলি বলিয়াই চণ্ডী কোন উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়াই মাথায় লাল ফেট্টি বাঁধা সেই ভীমকান্তি দৃঢ়কায় প্রৌঢ় পাইকটিকে লক্ষ্য করিয়া বলিল: পরশুরাম, নায়েব মশাই আর এঁর দুই মুহুরী তোমার জিম্বায় রইলেন। এক ঘণ্টার মধ্যে কাগজ-পত্র সব গুছিয়ে নিয়ে এঁরা গাড়ীতে উঠবেন; জন দুই পাইক নিয়ে তুমি এঁদের চৌকি দিয়ে নিয়ে যাবে। নজর রাখবে—সেরেস্তার কাগজ-পত্রের কোন রকম তছরূপ যাতে না হয়। দেওয়ানজীর সেরেস্তায় এঁকে পৌছে দিয়ে তবে তোমার ছুটি।

আশ্চর্য্য রকমের দীর্ঘ দেহটি ধনুকের মত বাঁকাইয়া নতমুখে পরশুরাম বলিল: তাই হবে মা!

নায়েব সাতকড়ি সামন্তের অবস্থা তখন বর্ণনাতীত। তাহার একটানা সুখের জীবনে এমন দুর্ভোগ যে এইভাবে আসিবে তাহা বুঝি কোন দিনই সে কল্পনাও করে নাই। তালুকের সকল শ্রেণীর মানুষকে দাবাইয়া শাসাইয়া চিরদিন যে ব্যক্তি চলিতে অভ্যস্ত, আজ তাহাকে অকস্মাৎ এ কি বিভ্রাটের মধ্যে পড়িতে হইল! আগামী কল্যকার সম্মান-সৌভাগ্য-প্রতিপত্তি লাভের সম্ভাবনা কি সত্য সত্যই এ ভাবে ইন্দ্রজালের মত মিথ্যা হইয়া যাইবে? মনে সাহস সঞ্চয় করিয়া সাতকড়ি এই সময় বলিয়া ফেলিল: আমার একটা কথা আছে। হিসেব-নিকেশ বুঝিয়ে দিতে আমার কোন আপত্তি নেই; আর এর জন্যে আমি দোষীও নই। সে যাই হোক, আমি এখানে থেকেই হিসেব-নিকেশ দিতে চাই, সেই ব্যবস্থাই করা হোক।

গম্ভীর মুখে চণ্ডী বলিল: জমিদারী সেরেস্তায় কাজ করে মাথার চুল পাকিয়ে ফেললেন, আর এটা জানেন না যে, সদরে গিয়েই মফঃস্বলের নায়েব-গোমস্তাদের হিসেব-নিকেশ দিতে হয়?

আজ এ ভাবে প্রার্থনা করিতে সাতকড়ি সামন্তের বিবেক পর্যন্ত

বিরোধী হইতেছিল; কিন্তু তাহার বিরুদ্ধবাদিনী নারীটি সামরিক রীতিতে যেরূপ আকস্মিক ভাবে সেরেস্তায় চড়াও হইয়া তাহাকে কাবু করিয়া ফেলিয়াছে, তাহাতে প্রার্থনা দ্বারা তাহার মন বিগলিত করিবার প্রচেষ্টা ছাড়া আর উপায়ই বা কি! তথাপি তাহাকে কিছুটা ক্ষুব্ধ ভাবেই বলিতে হইল: কিন্তু আপনি মেয়েমানুষ, বুঝবেন না, হিসেব-নিকেশের কাজ সোজা নয়; এগারো বছরের হিসেব নিকেশ দিতে এবং বুঝে নিতে অনেক সময় লাগবে।

চণ্ডী তেমনই দৃঢ় অথচ শান্ত স্বরে উত্তর করিল: মেয়েমানুষ হয়েও যখন আপনার মত ঝানু লোকের হিসেব নেবার এমন তড়ি-ঘড়ি ব্যবস্থা করতে পেরেছি, তখন সে কাজটা সোজা কি বাঁকা, তা জানবার মত বুদ্ধিও রাখি বৈ কি। এগারো বছরের হিসেবের জন্মে যদি এগারোটা মাসও সময় লাগে, তাতেই বা কি হয়েছে বলুন? ওর জন্মে আপনি ভাববেন না।

এইবার মরিয়া হইয়া সাতকড়ি বলিয়া ফেলিল: কিন্তু আজই—এখনি এ ভাবে যাওয়া আমার পক্ষে কিছুতেই সম্ভব হবে না।

মুখখানা কঠিন করিয়া চণ্ডী জিজ্ঞাসা করিল: কেন বলুন ত?

একটু থামিয়া ও সম্ভাবিত বিষয়টি সম্বন্ধে মনে মনে চিন্তা করিয়া সামন্ত বলিল: আমার এক সম্বন্ধী মহকুমা হাকিমের সেরেস্তায় চাকরী করেন—হাকিম সাহেবের সঙ্গে তাঁর খুব দহরম মহরম কিনা, তাই কাল সাহেবদের এখানে আসবার কথা আছে। এই এক কথা; তার পর আমাদের স্ত্রী ও ছেলেপুলেরা সব বাপের বাড়ী থেকে কাল সকালের ট্রেণে এখানে আসছেন; আমার শ্যালকই তাঁদের আনতে গেছেন। সেই জন্মেই বলছিলাম, আজই এখান থেকে আমার যাওয়া কিছুতেই হতে পারে না।

মুখখানা পুনরায় গম্ভীর করিয়া চণ্ডী বলিল: বড়ই আশ্চর্য কথা

সামন্ত মশাই, এগারো বছর ধরে বাশুলীর এষ্টেটে চাকরী করে, তার জেদী মালিকের প্রকৃতি জেনেও এ-কথা আপনি বলতে পারছেন ? আপনি কি জানেন না যে, তাঁর মুখের কথা কেউ কোন দিন টলাতে পারেনি ? আমি তাঁরই কুলবধূ এ-কথা মনে রাখবেন। আপনি এখনি এই মর্মে একখানা চিঠি আপনার শ্যালককে লিখুন যে, সরকারের প্রয়োজনে আপনাকে বাশুলী যেতে হচ্ছে এবং সেখানে কিছু কাল থাকতে হবে। সুতরাং সকালের ট্রেণে তিনি শ্যামাপুরে ষ্টেশনে না নেমে যেন পরিবারবর্গ নিয়ে সরাসরি বাশুলী ষ্টেশনে নামে। সেখানে লোক মোতায়েন থাকবে—তারা সবাইকে নির্দিষ্ট বাসায় নিয়ে যাবে। আপনি চিঠিখানা লিখে আমাদের কাছে দিন, আমরা সে ব্যবস্থা করব—যাতে আপনার শ্যালক তাঁদের নিয়ে কোন অসুবিধায় না পড়েন।

সামন্ত ভাবিয়াছিল যে, হাকিমের আসার সঙ্গে তাহার পরিজনদের আসার প্রসঙ্গটা এ-ক্ষেত্রে ব্রহ্মাস্ত্রের মত অব্যর্থ হইবে। কিন্তু তাহার সুচিন্তিত যুক্তি সঙ্গে সঙ্গে খণ্ডন করিয়া এই অদ্ভুত মেয়েটি তাহাকে এ-ভাবে এত সহজে হারাইয়া দিতে সে অবাক হইয়া গেল। কিন্তু তথাপি সে হাল ছাড়িয়া দিল না, তাহার শ্যালকের পক্ষ সমর্থন করিয়া আর এক আপত্তি তুলিল: দেখুন, শুধু আমার নিজের পরিবারবর্গ হলে কোন কথা ছিল না, কিন্তু আমার শ্যালকের পরিজনরাও সঙ্গে আসছেন কি না—আমার সুবাদে তাঁরা বাশুলীতে অর্থাৎ আমার মনিব-বাড়ীতে গিয়ে উঠতে আপত্তি করতে পারেন ত! এ অবস্থায়—

সামন্তর কথাটা শেষ হইবার পূর্বেই চণ্ডী বলিল: এ আপত্তির কোন মানে হয় না সামন্ত মশাই! তিনি বহুদিন ধরে যে বাড়ীতে সপরিবার বসবাস করেছেন—আগামী কালও যেখানে ওঠবার জন্যে আসছেন, সেটাও আপনার মনিবেরই আস্তানা। কাজেই বাশুলীর বাসায় উঠলে তাঁর মানের কিছুমাত্র খর্ব হবার ভয় নেই। আপনি

আর কথা বাড়াবেন না—আগে চিঠিখানা আপনার শ্যালকের নামে লিখে দিয়ে তার পরে সব গুছিয়ে-গাছিয়ে নিন।

সামন্তের অন্তরেও বিস্ময় এবং ক্ষোভ ক্রমশঃই গভীর হইয়া উঠিতেছিল। এই চালটিও যে এমন করিয়া ভাঙ্গিয়া যাইবে তাহা ভাবিতেও সময় পায় নাই সে। এবার বাধ্য হইয়াই তাহাকে শেষের মোক্ষম অস্ত্রটি নিক্ষেপ করিতে হইল। একান্ত বিপন্নের মতই সে অতঃপর হাকিমের দোহাই দিয়া বলিয়া উঠিল: মানলাম, তা যেন হলো—ওঁরা সব ওখানেই গেলেন, কিন্তু হাকিম এলে কি হবে তখন? আমার শ্যালকই যে খাতির করে অনেক সাধ্য-সাধনা করে তাঁকে আনাচ্ছেন, তাঁর সঙ্গেও সাহেব মেম কেউ-কেউ হয়ত আসবেন। আমার শ্যালককে না দেখতে পেলে হাকিম সাহেব হয়ত চটে যাবেন, ভারি একটা কেলেঙ্কারী কাণ্ড বেধে যাবে তখন। তাই বলছিলাম—

সামন্তকে কথা শেষ করিবার অবসরটুকু আর না দিয়াই চণ্ডী দৃঢ় স্বরে বলিল: আপনি থামুন—অনেক কথা বলেছেন, আর আপনাকে কিছু বলতে হবে না। হাকিমই আসুন, আর লাট সাহেবই আসুন, কিম্বা বাইরে থেকে যে কোন মানী মানুষই এখানে আসুন, যাঁরা এখানকার ভার নিয়ে থাকবেন, আতিথ্য সৎকার করবার মত প্রবৃত্তিও তাঁদের থাকবে নিশ্চয়ই। ও সব ভাবনা আপনি ছেড়ে দিয়ে এখন নিজের ভাবনাটাই ভাবুন।

এই পর্য্যন্ত বলিয়াই চণ্ডী ফরাসে উপবিষ্ট রাজীবকে লক্ষ্য করিয়া বলিল: রাজীব বাবু, আপনি এঁকে দিয়ে এঁর আত্মীয়টির নামে ঐ চিঠিখানা আগে লিখিয়ে নিন—আমি যে রকম বললাম। ওটা লেখা হলেই এঁকে পরশুরামের জিম্মা করে দেবেন। আমি এখন উঠছি, ওদিকে অনেক কাজ আছে। ডাক্তার রায়, আপনিও আসুন আপনার কর্মীদের নিয়ে।

চণ্ডীকে উঠিতে দেখিয়া সামন্ত ক্ষুব্ধ স্বরে বলিয়া উঠিল: তাহলে আমাকে জোর করেই ধরে-বেঁধে বাশুলীতে চালান দিচ্ছেন বলুন? বেশ, আমি সারা পথ এই কথাটা সবাইকে জানাতে জানাতেই যাব তাহলে।

চণ্ডী আসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়াছিল, ঝাঁ করিয়া এই সময় ঘুরিয়া সামন্তর মুখের পানে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল: কথাটা বলে ফেলে নিজেকেই খেলো করে ফেললেন সামন্ত মশাই! রোজারাই পিটে পিটে ভূত ছাড়ায়, কিন্তু রোজাকে ভূতে পেলে লোকে তার কি ভাবে খোয়ার করে তা বোধ হয় দেখেননি? আপনাদের তিনটে প্রাণীকে নিয়ে যাবার জন্যে এই পরশুরাম সরদারের সঙ্গে আরও জন কয়েক পাইক বরাদ্দ করা হয়েছে আগে থেকেই। তার কারণ, এরা আপনার-মতন রোজার ঘাড়ের ভূত ছাড়াতে ওস্তাদ—এটা মনে রাখবেন।

কথাগুলি বলিয়াই চণ্ডী চলিয়া গেল এবং গৌরী, গোবিন্দ-নারায়ণ, ডাঃ রায় ও কর্মীরা তাঁহার অনুগমন করিল। ফরাসের উপরেই একটি পাত্রের উপর লিখিবার সাজ-সরঞ্জাম সব ছিল। রাজীব এই সময় বলিল: আসুন সামন্ত মশাই, চিঠিখানা লিখুন—আমি বলে যাই।

সামন্ত কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু পরশুরাম বাঘের মত কুঁদিয়া সামন্তর সামনে আসিয়া হুঙ্কার দিয়া বলিল: হুঁসিয়ার নায়েব, রা কেড়েছ কি গলার নলিটা চেপে পাট-কাটির মত পুট করে ভেঙে দিয়েছি। চুপ-চাপ নিকতি থাকো।

নর-ব্যাঘ্রের মত ভীষণ মূর্তিটির দিকে একটিবার তাকাইয়া কম্পিত পদে সাতকড়ি সামন্ত ফরাসের এক প্রান্তে বসিয়া পড়িয়া হংসপুচ্ছের কলমটি লইতে হাত বাড়াইল।

ছাব্বিশ

বাশুলীর কাছারী-বাড়ীর বৃহৎ ব্যাপারে সারা রাত্রি ধরিয়া গ্রামের মধ্যে একটা সাড়া পড়িয়া গেল। গ্রামের লোক ভাঙ্গিয়া পড়িল কাছারী-বাড়ীর প্রকাণ্ড দেউড়ীর সামনে। গাড়ীর পর গাড়ী, লোকের পর লোক আসিতেছে স্রোতের মত নানাবিধ দ্রব্যজাত বহন করিয়া। পল্লীবাসীরা এই আকস্মিক কাণ্ড দেখিয়া বিস্মিত, চমকিত, চমৎকৃত— এ যেন এক অলৌকিক রহস্য, ভৌতিক ব্যাপার!

ভিতরে কি হইতেছে জানিবার উপায় নাই—অথচ বহুসংখ্যক লোক সেখানে কর্মব্যস্ত অবস্থায় ছুটাছুটি করিতেছে। কর্মী দল ভিন্ন ভিতরে অন্যের প্রবেশ নিষিদ্ধ। সমগ্র কাছারী-বাড়ীর এলাকা পরিবেষ্টন করিয়া বাশুলীর বিখ্যাত পাইকরা লাঠি ও শড়কি লইয়া পাহারা দিতেছে।

অর্ধ রাত্রে যথাযথ ব্যবস্থার পর চণ্ডী স্বামীর সহিত এই প্রথম পিত্রালয়ে উপস্থিত হইল। অবশ্য ইহার পূর্বেই কবিরাজ-বাড়ীতে খবর পাঠানো হইয়াছিল যে, গোবিন্দ চণ্ডীকে লইয়া শ্যামাপুরে আসিয়াছে এবং কাছারী-বাড়ীর কাজ সারিয়া সস্ত্রীক শ্বশুরালয়ে রাত্রিবাস করিবে। কিন্তু তজ্জন্য কবিরাজ মহাশয় যেন ব্যস্ত না হন, এবং তাহাদিগকে লইয়া যাইবার জন্য কষ্ট করিয়া কাছারী-বাড়ীতে আসিবারও প্রয়োজন নাই—কাজগুলির ব্যবস্থার পর তাহারাই যাইবে, তবে অধিক রাত্রি হইতে পারে।

গৌরীকেই এই সংবাদ লইয়া যাইতে হয়। করালী কবিরাজ মহাশয় তাহার মুখে সবিশেষ বৃত্তান্ত শুনিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িলে গৌরী সহাস্যে বলিল: জেঠা মশাই, চণ্ডীর অংশেই যে আপনার চণ্ডী জন্মেছেন। বিয়ে হলো কেমন কাণ্ড করে ভাবুন ত? বিয়ের পর গ্রামশুদ্ধ সবাইকে অবাক্ করে দিয়ে শ্বশুরবাড়ী গেলেন। সেখানেও কি কাণ্ডই না করলেন।

তার পর ফিরে আসার ব্যাপারটাও দেখুন! রাত দুপুরে ঘুমন্ত গ্রামখানাকে জাগিয়ে দিয়ে রণবাদ্য বাজিয়ে রণচণ্ডীর মতন ঢুকলেন গ্রামে! কিন্তু বাপের বাড়ীতে দু'টিতে আসবেন ঠিক চোরের মত চুপিসাড়ে—কেউ জানতেও পারবে না।

কবিরাজ মহাশয় উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন: বিয়ের পর মেয়ে-জামাইয়ের এই প্রথম শুভাগমন হচ্ছে আমার বাড়ীতে মা! কিন্তু এমনি অসময়ে আর এমন একটা ব্যাপার মাথায় করে ওঁরা আসছেন যে, সাধ আহ্লাদ মেটাবার ফুরসদও পেলাম না।

গৌরী তাঁহাকে প্রবোধ দিয়া বলিল: মেয়ে-জামাই বাড়ী এলে আদর-যত্ন সবাই করে, জাঁক করে পাড়ায় জানিয়ে আনন্দ পায়—কেমন ঘরে মেয়ে পড়েছে, জামাই কত গুণের, কেমন কুটুম পেয়েছেন। কিন্তু আপনার অদৃষ্টে জেঠা মশাই, আগে থেকেই সব জানাজানি হয়ে গেছে। বিশখানা গাঁয়ের লোক কাল কাছারী-বাড়ীর ময়দানে জমায়েত হয়ে আপনার মেয়ে-জামাইয়ের জয়জয়কার করবে।

ঠিক এই সময় দেউড়ীর সামনে দুইখানি শকট আসিয়া দাঁড়াইল। কবিরাজ মহাশয় গৌরীর সহিত বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, প্রত্যেক শকটের ভিতরে ও ছাদের উপরে নানাবিধ সামগ্রী। উভয় শকটের সঙ্গে এক জন করিয়া পরিচারক—তাহাদের তত্ত্বাবধানে দ্রব্যগুলি আসিয়াছে। গাড়ী থামিতেই সেই দুই ব্যক্তি তাড়াতাড়ি নিচে নামিয়া কবিরাজ মহাশয়কে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল, তাহার পর সবিনয়ে জানাইল যে, তাহারা বাগুলীর গাঙ্গুলী-বাড়ী হইতে আসিয়াছে; বউরাণীর সঙ্গে রাণীমা এই সব সামগ্রী উপঢৌকনস্বরূপ পাঠাইয়াছেন। কবিরাজ মহাশয় অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিলেন।

গৌরী তখন সহাস্যে বলিল: বুঝতে পারছেন না জেঠা মশাই, চণ্ডী শ্বশুরবাড়ী থেকে এই প্রথম বাপের বাড়ী এসেছে কি না, তাই রাণীমা

তত্ত্ব পাঠিয়েছেন। আপনি দুঃখ করছিলেন, এখন পাড়ার সবাইকে ডেকে বেই-বাড়ীর তত্ত্ব-তাবাস দেখান।

সুপ্রচুর উপঢৌকন পাঠাইয়াছিলেন রাণী মাধুরী দেবী স্বয়ং ব্যবস্থা করিয়া। বস্ত্র হইতে আরম্ভ করিয়া ব্যবহার্য ও আহার্য নানাবিধ বস্তুর বিপুল সমন্বয়। শুধু কবিরাজ বাড়ীকে লক্ষ্য করিয়া নহে—গ্রাম সুবাদে যাঁহাদের সহিত এই পরিবারটির বিশেষ ঘনিষ্ঠতা—গৌরীর নিকট সন্ধান লইয়া তাঁহাদেরও মর্যাদার ব্যবস্থা করিয়াছেন মাধুরী দেবী বিবিধ বিধানে।

তৎক্ষণাৎ একটা সাড়া পড়িয়া গেল। শঙ্খধ্বনির সঙ্গে কুটুম্ববাড়ীর বিপুল উপঢৌকন গৃহজাত করা হইল এবং প্রতিবাসীদের ডাকিয়া আনিয়া পরিদর্শনের ব্যবস্থা করিলেন কবিরাজ-গৃহিণী। কবিরাজ মহাশয় সাদরে পরিচারক ও শকট-চালকদিগকে আদর-আপ্যায়নে পরিতৃপ্ত করিলেন। জিনিসপত্র নামাইয়া দিয়া শকট দুইখানি কাছারী-বাড়ীতে চলিয়া গেল। এই শকটেই পাইক-পরিবৃত অবস্থায় কাছারীর নায়েব সাতকড়ি সামন্ত ও মুহুরীদের বাগুলীতে পাঠাইবার ব্যবস্থা চণ্ডী পূর্বেই করিয়া রাখিয়াছিল।

কাছারী-বাড়ীতে সদলবলে চণ্ডীর উপস্থিতির কিছু পরেই গৌরীর তত্ত্বাবধানে এই সব ব্যবস্থা সুষ্ঠু ভাবে সম্পন্ন হয়।

ওদিক্‌কার কাজ-কর্মের বন্দোবস্ত করিয়া চণ্ডী যখন গোবিন্দকে লইয়া পিত্রালয়ে প্রবেশ করিল, তখন কাছারী-বাড়ীর পেটা-ঘড়ি হইতে পর-পর দুইটি তীব্র ধ্বনি রজনীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া জানাইয়া দিল—রাত্রি দুই ঘটিকা অতিক্রম করিতেছে।

প্রত্যূষে কৌতূহলী গ্রামবাসীরা কাছারী-বাড়ীর সংস্পর্শে আসিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হইল। কাছারী-বাড়ীর দেউড়ীর উপর মঞ্চ বাঁধিয়া নহবত বসিয়াছে। বৃহৎ দেউড়ী পত্র-পুষ্প-পল্লবে মণ্ডিত হইয়া অতি মনোরম শ্রী ধারণ করিয়াছে। তাহার মধ্যে অর্দ্ধচন্দ্রাকারে

'সেবাশ্রমের উদ্বোধন-উৎসব' 'বন্দে মাতরম্' ও 'স্বাগতম্' বাক্যগুলি লতাপুষ্পের অক্ষরে উৎকীর্ণ হইয়া বৃহৎ অনুষ্ঠানটির পরিচয় দিতেছে। সুবিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণ ব্যাপিয়া বিশাল মণ্ডপ নির্মিত হইয়াছে; উপরে আগাগোড়া রঙ্গীন সামিয়ানা; তাহার নিচে শুভ্র চাঁদোয়া প্রসারিত। এক দিকে মহিলাদের জন্য স্বতন্ত্র স্থান নির্দিষ্ট ও চিহ্নিত। কাছারী-বাড়ীর অন্য দিকে প্রাঙ্গণ-সমন্বিত স্বতন্ত্র বিভাগটি সারা রাত্রিব্যাপী সংস্কারের পর সেবাশ্রমের উপযোগী আসবাব-পত্রে কিরূপ সজ্জিত হইয়াছে—তাহা এখনো পর্যন্ত বাহিরে প্রকাশ পায় নাই। এই অংশের পুষ্পপত্রাচ্ছন্ন দ্বারদেশে প্রলম্বিত দুই খণ্ড সুদৃশ্য আবরণী-বস্ত্র রেশমী-রজ্জু দ্বারা আবদ্ধ রহিয়াছে। দিবা দুই ঘটিকার সময় এই রজ্জু-বন্ধন উন্মোচন করিয়া সেবাশ্রমের অভ্যন্তর-ভাগ প্রদর্শিত হইবে। এই গ্রামনিবাসিনী অশীতিপর এক বৃদ্ধা মহিলার উপর এই সম্মানজনক কাজটির ভার অর্পিত হইয়াছে। তিনিই স্বহস্তে সেবাশ্রমের দ্বারের আবরণ উন্মোচন করিবেন। এই উপলক্ষে যে সভার অধিবেশন হইবে, তাহাতে পৌরোহিত্য করিবেন এই বর্ষীয়সী মহিলার স্বামী—এই অঞ্চলের সর্বাধিক বর্ষীয়ান সুবিদ্বান পুরোহিত দীনবন্ধু ভট্টাচার্য মহাশয়। রাজপথের পার্শ্বে প্রশস্ত হাতাযুক্ত প্রকাণ্ড দেউড়ীটি কাছারী-বাড়ী এবং সেবাশ্রমের একই প্রবেশ-পথ হইলেও রাত্রি মধ্যে সেবাশ্রমকে বিচ্ছিন্ন করিয়া স্বতন্ত্র এক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা হইয়াছে। উভয় ভবনের মাঝখানে শাল কাঠের তৈরী ঘনসন্নিবদ্ধ সারি সারি সুদৃঢ় স্তম্ভের সঙ্গে এমন ভাবে করগেটের সু-উচ্চ বেষ্টনী রচিত হইয়াছে যে, এ-পথে বায়ু চলাচলেরও উপায় নাই। নারী ও শিশুদের জন্যই সেবাশ্রমের প্রতিষ্ঠা বলিয়া এরূপ সতর্কতা অবলম্বিত হইয়াছে। ওদিকে রাত্রি মধ্যে সন্নিহিত ও দূরবর্তী প্রায় পঁচিশখানি গ্রামে ঢোল সোহরতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, শ্যামাপুরের কাছারী-বাড়ীর সান্নিধ্যে এক সেবাশ্রম খোলা হইয়াছে।

সকল সমাজ ও সম্প্রদায়ের নারী ও শিশুগণ এই সেবাশ্রমে আসিয়া বিনাব্যয়ে চিকিৎসার সুযোগ পাইবেন। প্রসূতিদের সুপ্রসবের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ইহা ব্যতীত সকল বয়সের নারীদিগকে গৃহ-চিকিৎসার সহিত সেবা-শুশ্রূষা শিক্ষা দিবারও ব্যবস্থা হইয়াছে। আগামী কল্য রবিবার বেলা ঠিক দুই ঘটিকার সময় শ্যামাপুর কাছারী-বাড়ীর ময়দানে প্রকাশ্য সভায় সর্ব্বসাধারণকে সেবাশ্রমের বৃত্তান্ত শুনিবার এবং স্বচক্ষে দেখিবার জন্য আমন্ত্রণ করা হইতেছে।

এই ঘোষণা সমগ্র অঞ্চলে এক নূতন চাঞ্চল্য উপস্থিত করে। পূর্বে স্থানীয় থানার চৌকিদারগণ ঢেঁড়া পিটিয়া শ্যামাপুর ও সন্নিহিত কতিপয় গ্রামে প্রচার করিয়াছিল যে, মহকুমার মহামান্য হাকিম হেরিস সাহেব ঐ রবিবার দুই ঘটিকার সময় শ্যামাপুর কাছারী-বাড়ীর প্রাঙ্গণে এক সভা করিবেন, এই সভায় শ্যামাপুর মিসনারী বিদ্যালয়ের ব্যাপারে হাকিম বাহাদুর প্রকাশ্য ভাবে তদন্ত করিবেন ইত্যাদি।

বলা বাহুল্য, হাকিম সংক্রান্ত ঘোষণা এ অঞ্চলের বাসীন্দাদের মধ্যে একটা কৌতূহল-মিশ্রিত আতঙ্কের সৃষ্টি করে। কিন্তু অধিকাংশ লোকই সাগ্রহে যখন এই তদন্ত ব্যাপার লইয়া জল্পনা-কল্পনা করিতেছিল, সেই সময় দ্বিতীয় ঘোষণা সকলকে অবাক্ করিয়া দিল। তাহারা স্থির করিতে পারিল না—ঠিক যে সময় যে স্থানে হাকিমের সভা করিবার কথা, সেইখানেই সেই সময় সেবাশ্রমওয়ালাদের সভা কি করিয়া হইবে? একই সময়ে একই জায়গায় কেমন করিয়া দুইটি সভা বসিবে? জনসাধারণের মধ্যে এই সভা লইয়া এক নূতন কৌতূহল ও সেই সঙ্গে কিছুটা উত্তেজনার সৃষ্টি হইল। ফলে, বহু দূরবর্ত্তী লোকেরাও তাড়াতাড়ি আহারাদি সারিয়া শ্যামাপুরের কাছারী-বাড়ীর উদ্দেশে দলবদ্ধ হইয়া আসিতে লাগিল এবং নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই শ্যামাপুরের পথগুলিতে জনস্রোত প্রবাহিত হইল।

কবিরাজ মহাশয় এ-দিন কন্যা-জামাতার সমভিব্যাহারী কর্মীবৃন্দের

সকলকেই তাঁহার আলয়ে মধ্যাহ্ন ভোজনের জন্য আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। কাজের দোহাই দিয়া কর্তৃপক্ষগণ আপত্তি তুলিলেও উহা উপেক্ষিত হয় এবং চণ্ডী ব্যবস্থা করিয়া দেয় যে, পর্যায়ক্রমে এক এক দল ভোজন করিয়া যাইবে।

সকাল হইতেই চণ্ডীকে সব দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কার্য পরিচালনা করিতে হয়। সামন্ত কর্তৃক লিখিত পত্র লইয়া কতিপয় বিচক্ষণ ব্যক্তিকে শ্যামাপুর ষ্টেশনে পাঠানো হয়—যাহাতে সামন্ত মহাশয়ের শ্যালক শ্রীপতি শ্রীমানি উভয় পরিবারের পরিজনবর্গকে লইয়া শ্যামাপুর ষ্টেশনে নামিতে না পারিয়া বাগুনীতে নামিতে বাধ্য হন। ষ্টেশনে শ্রীপতি সামন্তর পত্র পাইয়াও শ্যামাপুরে নামিবার জন্য রীতিমত বিদ্রোহী হইয়াছিল—কিন্তু বাগুনী ষ্টেটের জবরদস্ত কর্মীদের দাপটে শেষ পর্যন্ত তাহাকে ভগিনীপতি সামন্তের অনুরোধপত্রের নির্দেশ প্রতিপালন করিতে হয়।

প্রত্যুষেই পল্লীর তরুণ কর্মীরা গৌরীকে সুপারিশ ধরিয়া চণ্ডীর সম্বর্ধনা করিতে আসিল। নায়েব সাতকড়ি সামন্ত এবং তাহার শ্যালক শ্রীপতি শ্রীমানির ঔদ্ধত্যে ইহারা যেরূপ মুসড়াইয়া পড়িয়াছিল, চণ্ডীর এই বিস্ময়কর তৎপরতায় ততোধিক উত্তেজিত ও উৎসাহিত হইয়া উঠে—কি বলিয়া যে তাহাদের অন্তরের উল্লাস ব্যক্ত করিবে তাহা স্থির করিতে পারিতেছিল না। চণ্ডী তাহাদিগকে গোবিন্দনারায়ণ, ডাক্তার রায় ও রাজাবের সহিত পরিচিত করিয়া দিয়া এই অনুষ্ঠানের কাজে টানিয়া লইল। সঙ্গে-সঙ্গে কে কি কাজ করিবে তাহাও নির্ধারিত হইয়া গেল।

সামন্তর শ্যালক শ্রীমানির সম্বন্ধে ব্যবস্থার সঙ্গে-সঙ্গে চণ্ডী স্থানীয় কতিপয় কর্মীকে লইয়া আর এক কাণ্ড করিয়া বসিল। শ্যামাপুর গ্রামে যান-বাহনের মধ্যে ষ্টেশনের কাছে যে দুইখানি তৃতীয় শ্রেণীর ছ্যাকরা গাড়ী ও দুইখানি মাত্র পালকী থাকে, সকালেই সেগুলি সেদিনের জন্য ভাড়া করিয়া ফেলা হইল। কর্মীরা প্রথমে ইহার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারে

নাই, কিন্তু চণ্ডীর যুক্তিতে তাহারা চমৎকৃত হইল। চণ্ডী বলিল: ভোটের সময় যে-ভাবে গাড়ী-পালকী পাঠিয়ে এক-এক গ্রামের মেয়েদের আনা ও পাঠানো হয়, ঠিক সেই ভাবেই সভায় তাদের আমি আনাতে চাই। এই গাড়ী-পাল্কী সারা দিন ধরে এই কাজ করবে। এমন কি, যদি দেখ—বাড়ীতে কোন মেয়ে বা তাদের ছেলেপুলে অনেক দিন ধরে ভুগছে, চিকিৎসা হচ্ছে না—আমাদের নূতন সেবাশ্রমে চিকিৎসার জন্যে তাদের খুব যত্ন করে আনবে। একটু দূরের গ্রামেও এমন দু' চার জন প্রাচীন ব্যক্তি আছেন, সভায় যোগ দেবার আগ্রহ তাঁদের আছে—অথচ দূর থেকে হেঁটে আসবার সামর্থ নেই; তাঁদেরও আমি আনাতে চাই। কাজেই একটা তালিকা করে ফেল—এ রকম কতগুলি প্রাচীন বিজ্ঞ ব্যক্তি এ অঞ্চলে আছেন। এখান, মেয়েদেরও একটা তালিকা হবে। এঁদের জন্যেই গাড়ীর বরাদ্দ—বাড়ী থেকে সভায় এনে এবং সভার পর বাড়ীতে পৌঁছে দেওয়া হবে। পালকী দুখানা খাটবে রোগীদের আনবার জন্যে।

কর্মীরা একটু বিস্মিত হইয়াই জিজ্ঞাসা করিল: সেবাশ্রমের উদ্বোধনের সঙ্গে সঙ্গে রোগীদের আনলে অসুবিধা হবে না?

ঈষৎ হাসিয়া চণ্ডী বলিল: আমার সব কাজই যে সৃষ্টিছাড়া। কথার সঙ্গেই কাজ করতে আমি ভালোবাসি। 'ভোগের আগে প্রসাদ' বলে একটা কথা আছে—অবস্থা বুঝে সে ব্যবস্থাও চলে। সেবাশ্রম মানেই সেখানে চলেছে সেবার পর্ব। দরজা খুলে সেটাকে না দেখিয়ে, খালি ঘর আর ঘরের সাজ-সজ্জা দেখে লোকের মন কি ভরে? তোমাদের কাজ হবে খুঁজে-খুঁজে রোগী ধরে আনা; তার পর তাদের সম্বন্ধে ব্যবস্থা—সে ভার আছে রাজীবের উপরে। তোমাদের কাজ তোমরা করে যাও। রোগীর পালকী এলেই তার পরের ব্যবস্থা সে-ই করবে।

কর্মীদের সঙ্গে গাড়ী-পাল্কীর চালক ও বাহকদের স্নানাহারের পাট সর্বাগ্রে নিজে উপস্থিত থাকিয়া সমাধা করাইয়া চণ্ডী তাহাদিগকে ছাড়িয়া

দিল। গাড়ী ও পাল্কী লইয়া স্থানীয় কতিপয় কর্মী গ্রামান্তরে যাত্রা করিল।

বেলা প্রায় একটার সময় শ্যামাপুর ষ্টেশনে ট্রেণ আসিয়া থামিল। প্রথম শ্রেণীর কামরা হইতে মহকুমা হাকিম হেরিস, মিস্ খৃষ্টকুমারী ও মিষ্টার আলম প্লাটফরমে অবতরণ করিবার পূর্বেই তৃতীয় শ্রেণীর কামরা হইতে তাহার চাপরাশি তাড়াতাড়ি নামিয়া ছুটিয়া আসিয়া কামরার দরজা খুলিয়া দিল।

হেরিস গর্বিত ভঙ্গিতে প্লাটফরমে নামিয়া সামনের দিকে তাকাইতেই দেখিল, স্থানীয় দারোগা সত্যেন সান্যাল থানার জমাদার ও দুই জন কনেষ্টবল লইয়া দ্রুতপদে তাহাদের দিকেই আসিতেছে। গোড়া হইতেই ইন্সপেক্টর সান্যাল হেরিস সাহেবের বিষদৃষ্টিতে পড়িয়াছিল—শ্যামাপুর মিসনারী বিদ্যালয়ের বিস্মৃতপ্রায় ঘটনাটিকে অকারণ পুনরায় জাঁকাইয়া তুলিবার ব্যাপারে গুরুত্ব না দেওয়ায়। ফলে, সাহেব তদন্ত-ভার স্বহস্তে লইয়া সরকারী গোয়েন্দা মিষ্টার আলমকেই এ কার্যে বাহাল করে। সাহেবের সেরেস্তা হইতে সান্যালের উপর এই মর্মে এক নির্দেশ আসিয়াছিল যে, শ্যামাপুর কাছারীর নায়েব সাহায্যপ্রার্থী হইলে দারোগা যেন তাহাকে প্রয়োজন ও সম্ভব মত সাহায্য করেন। কিন্তু থানার দারোগার নিকট সাহায্যপ্রার্থী হইবার মত কোন কারণ না ঘটায় কাছারীর নায়েব থানার ত্রিসীমায়ও আসে নাই। এ দিন সকালে দারোগা সান্যাল সবিস্ময়ে শুনিল যে, হাকিম যে সময় কাছারী-বাড়ীতে তাঁহার এজলাস বসাইয়া তদন্তে প্রবৃত্ত হইবেন, সেই সময়েই কাছারীতে সেবাশ্রমের উদ্বোধন সম্পর্কে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হইবে—এই মর্মে এক সংবাদ চতুর্দিকে ঘটা করিয়া ব্যাপক ভাবে প্রচারিত হইয়াছে। এই সংবাদে কৌতূহলী হইয়া দারোগা সান্যাল জনৈক মুহুরীকে কাছারী-বাড়ীতে পাঠাইলে

সে ব্যক্তিও তাঁহাকে জানায় যে, হাকিম সাহেবের সভা করিবার ব্যাপারটা চাপা পড়িয়া গিয়াছে—ভিতরে প্রকাণ্ড মেরাপ বাঁধিয়া সামিয়ানা খাটাইয়া সেবাশ্রমের উৎসবের আয়োজন চলিয়াছে ; কি হইতেছে জানিবার উপায় নাই, বহুসংখ্যক পাইক ফটকে পাহারা দিতেছে। একটার সময় ফটক খোলা হইবে। শ্যামাপুরে চণ্ডী বিদ্যাপীঠ প্রতিষ্ঠার কথা সত্যেন সান্যালের অবিদিত ছিল না ; এই বিচিত্র সংবাদ শুনিয়া সম্ভবত মনে মনে সে খুব হাসিয়াছিল ; কিন্তু এ ক্ষেত্রে অকুস্থলে যাওয়া প্রয়োজন মনে করে নাই। তাহার উপর হাকিমের সেরেস্তা হইতে শেষ আদেশ আসিয়াছিল—নির্দিষ্ট দিনে বেলা পৌনে একটার সময় থানার কনেষ্টবল ও চৌকিদারদিগকে লইয়া সে যেন ষ্টেশনে উপস্থিত থাকে। সেই নির্দেশ বহন করিয়া সত্যেন সান্যাল থানার জমাদার, চার জন কনেষ্টবল এবং এক ডজন চৌকিদার লইয়া ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়াছে।

দারোগাকে দেখিয়াই হেরিস রুক্ষ স্বরে জিজ্ঞাসা করিল: মিছিল কোথায়? বাহিরে ত কোন বন্দোবস্ত তার দেখছি না?

হাকিমকে যে ষ্টেশন হইতে মিছিল করিয়া কাছারী বাড়ীতে লইয়া যাইবার ব্যবস্থা হইতেছে, এ কথা দারোগা শুনিয়াছিল। কিন্তু তাহার উদ্দেশে লিখিত পত্রে সে সম্বন্ধে কোন উল্লেখ ছিল না। একটা যে ওলট-পালট ব্যাপার কিছু হইয়াছে, দারোগা সকালের রিপোর্ট শুনিয়াই বুঝিয়াছিল। কিন্তু এখানে সে সম্বন্ধে কোন কথা না তুলিয়া শুধু জানাইল: মিছিলের কথা কাছারীর নায়েব জানেন—থানার কনেষ্টবল ও চৌকিদারদের নিয়ে ষ্টেশনে থাকবার জন্যই আমাকে লেখা হয়েছিল। আমি আমার কর্তব্যের ত্রুটি করিনি।

এ জবাব শুনিয়া হেরিস ক্ষেপিয়া উঠিল ; হুমকি দিবার মত ভঙ্গিতে তীক্ষ্ণ স্বরে জিজ্ঞাসা করিল: আপনি কিছু জানেন না? কাছারীর নায়েব মিষ্টার সামন্ত কোথায়?

সংযত কণ্ঠে দারোগা উত্তর দিল : আমি তাঁকে দেখিনি, তবে বাহিরে থাকতে পারেন।

সাহেবের জ্বলন্ত দৃষ্টি তখনও দারোগার মুখে নিবদ্ধ ; সে বেচারী তখন কষ্টে মুখের হাসি চাপিতে সচেষ্ট—সাহেবের চোখের অগ্নি-ঝলকে সেই প্রচ্ছন্ন হাসি যাহাতে ফুটিয়া না উঠে।

'বাইরেই চলো—দেখি।' হুঙ্কারের সুরে কথাগুলি বলিয়াই হেরিস পিছনে স্তব্ধ ভাবে দণ্ডায়মানা ভগিনী খৃষ্টকুমারীর মুখের পানে ফিরিয়া তাকাইল। খৃষ্টকুমারী তখন দুই চোখের দৃষ্টি যত দূর সম্ভব তীব্র করিয়া অদূরবর্তী লাল কাঁকরের পরিচিত রাস্তাটির পানে চাহিয়াছিল—কিন্তু সেখানে মিছিল নামক বস্তুটির কোন নিদর্শনই তাহার ব্যগ্র দৃষ্টিকে আকৃষ্ট করিল না। কেবল দেখা গেল, ষ্টেশনের করগেটের সেডের মধ্যে শীর্ণ দেহের উপরে কৃষ্ণবর্ণের মলিন জীর্ণ কোর্তা পরিয়া এবং মাথায় ফ্যাকাশে লাল রঙের পাগড়ী বাঁধিয়া কতকগুলি মূর্তি তাহাদের প্রতীক্ষা করিতেছে ; প্রত্যেকের কোমরে সরকারী চাপরাশ চামড়ার বেল্টের অভাবে দড়ি দিয়া বাঁধা, হাতে এক একগাছা লাঠি। কোথায় ধ্বজা-পতাকা লইয়া সমস্বরে হাকিম সাহেব ও তাহার ভগিনীর নামে সমুদ্র গর্জনের মত বিপুল জয়ধ্বনি তুলিয়া সহস্র লোকের একটা সারিবদ্ধ শোভাযাত্রার বিরাট দৃশ্য—ট্রেণে বসিয়া সারা পথ যাহা কল্পনা করিয়াছে খৃষ্টকুমারী, কিন্তু ট্রেণ হইতে নামিবা মাত্র সেই কল্পনা এমন ভাবে পাল্টাইয়া গেল! ইহার পর আরো কিছু লজ্জাকর দুর্ভোগ আছে কি না, তাহাই বা কে বলিবে?"

নীরবেই একটা নম্র ইঙ্গিত করিয়া ভগিনীকে লইয়া মহকুমার মহামান্য হাকিম প্লাটফরম্ হইতে ভিতরে প্রবেশ করিতেই কনেষ্টবল ও চৌকিদাররা দূরে থাকিয়া সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিল। হাকিম তখন তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিয়া চাহিয়া কাছারীর সেই অতি বিনীত ও রাজভক্ত নায়েবটিকে খুঁজিতেছিল, সেই সঙ্গে তাহার সেরেস্তার কর্মচারী মিষ্টার শ্রীমানিকেও!

মিষ্টার আলম এই সময় হাকিমের একান্ত কাছে আসিয়া বলিল: এ কি কাণ্ড স্যার! জমীদারী কাছারীর কেউ নেই ?

হেরিসের কণ্ঠ হইতে সরোষে দু'টি মাত্র শব্দ অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত নির্গত হইল: ননসেন্স! স্কাউন্‌ড্রেল!

দারোগা সান্যাল জিজ্ঞাসা করিল: তাহলে এখন কি করা যায়—কাছারীতে যাওয়া হবে ?

তেমনই তীব্র সুরে হেরিস বলিয়া উঠিল: সার্‌টেন্‌লি! গাড়ী কোথায় ?

তাই ত! গাড়ীর কথা ত দারোগা ভাবে নাই। মিছিল যখন আসে নাই, গাড়ীর ব্যবস্থাও নিশ্চয়ই হয় নাই! কিন্তু ট্রেণ আসিলে ষ্টেশনের হাতার উপরে আসিয়া যে দুইখানি ঘোড়ার গাড়ী যাত্রী ধরিবার জন্য উমেদারী করিত, তাহাদের ত দেখা যাইতেছে না আজ—কোথায় অদৃশ্য হইয়াছে তাহারা ? ইতিমধ্যেই কি প্যাসেঞ্জার লইয়া চলিয়া গিয়াছে ? দারোগা একজন চৌকিদারকে ডাকিয়া গাড়ী দুইখানির আস্তাবলে গিয়া খোঁজ লইতে বলিল। যদি গাড়ী আজ বাহির করা না হইয়া থাকে, এখনই যেন ঘোড়া জুতিয়া লইয়া আসে। মেমসাহেবের জন্য পাল্কীর কথাও বলিয়া দিল দারোগা।

দারোগার কথা হেরিস, খৃষ্টকুমারী ও আলম—তিন জনেই শুনিল। ক্রোধে হেরিসের মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল; লজ্জায় ও অপমানে খৃষ্টকুমারীর কালো মুখখানার উপরে একটা কালচে ছায়া পড়িল; আর মিষ্টার আলম বিরক্তির সুরে দারোগাকে বলিল: গাড়ীরও একটা ব্যবস্থা করে রাখেন নি ?

দারোগা সান্যাল উত্তর দিল: কাছারীর নায়েব ত পনেরো দিন ধরে মিছিলের ব্যবস্থা করেছিলেন শুনিছি। তিনিই যখন হাকিম সাহেবকে আনিয়েছিলেন, ব্যবস্থা তাঁরই করবার কথা। তিনি যে-এষ্টেটের তহশীলদার,

মনে করলে জুড়ি-গাড়ীর ব্যবস্থা করতে পারতেন। আর আমাকে এখান-কার বেতো ঘোড়া-জোতা ছ্যাকড়া গাড়ী রাখতে হোত। তা ছাড়া গাড়ীর কথা আমাকে বলাই হয়নি।

খানিক পরেই চৌকিদার ফিরিয়া আসিয়া বলিল: গাড়ী পাল্কী সব কাছারী-বাড়ীতে সমস্ত দিনের জন্যে ভাড়া করে নিয়ে গেছে। আস্তাবল খালি।

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া হেরিস জিজ্ঞাসা করিল: কাছারী-বাড়ীতে নিয়ে গেছে মানে? ওরা কি জানে না—আমরা এই ট্রেণেই আসছি?

দারোগা বলিল: কাছারী-বাড়ীতেও না কি আজ সেবাশ্রম খোলা হবে—সেই উপলক্ষে সেখানে মিটিং আছে। বোধ হয় সেই জন্যেই—

এ-কথা শুনিবা মাত্র হেরিস অগ্নিমূর্ত্তি ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল: ইডিয়টের মতন আপনি এ সব কি বলছেন? আমি সেখানে গিয়ে সভা করব, এ-কথা সবাই জানে—কার ঘাড়ে দু'টো মাথা আছে যে, আমার সভার ওপরে সেখানে আর একটা সভা করবে?

সান্যাল ধীর কণ্ঠে উত্তর দিল: এ-রকম একটা খবর আমি শুনেছি মাত্র, শোনা কথাই আমি বলেছি।

ক্রুদ্ধ কণ্ঠে হেরিস বলিল: শুনেই চুপ করে ছিলেন কেন? সেখানে গিয়ে খবর নেওয়া কি আপনার উচিত ছিল না?

দৃঢ় স্বরে এবার দারোগা বলিল: না। আমি আপনার হুকুম মত চৌকিদারদের যোগাড় করতেই ব্যস্ত ছিলাম। আমার উপরে এই আদেশ থাকায় এর দিকেই জোর দিয়েছিলাম, কাছারীতে বিরুদ্ধ ধরণের তেমন কিছু ঘটলে নায়েবের কাছ থেকেই থানায় খবর আসত। কাছারীর নায়েব কোন সাহায্য চাইলে আমি তার ব্যবস্থা করব—আমাকে এই কথাই জানানো হয়েছিল। আমার কর্তব্যে কোন ত্রুটি হয়েছে বলে আমি মনে করি না।

সরোষে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ক্ষণকাল এই স্পষ্টবক্তা দারোগাটির দিকে চাহিয়া থাকিয়া মনে মনে কি ভাবিয়া অতঃপর হেরিস কিঞ্চিৎ সংযত কণ্ঠেই বলিল : তাহলে কাছারীতে যাবার কোন কনভেন্স নেই! কিন্তু আমাকে যেতেই হবে।

দারোগাও অবিচলিত কণ্ঠে বলিল : এ অবস্থায় যেতে হলে হেঁটেই যেতে হয়।

তাই চলুন। এখান থেকে ডিস্ট্যান্স—

এই পর্য্যন্ত বলিয়াই হেরিস দারোগার মুখের দিকে চাহিল।

দারোগা বলিল : মাইল খানেক হবে।

অল রাইট—চলুন।

এক নিশ্বাসে কথাটা বলিয়া হেরিস সেডের ভিতর হইতে বাহিরে নামিল। খৃষ্টকুমারীর মুখ তখন ছায়ের মত ফ্যাকাসে হইয়াছে—পথে পদার্পণ করিতেই তাহার বুকখানা বেদনায় টন-টন করিয়া উঠিল। কিন্তু উপায় নাই। কল্পিত মিছিল যখন মিলিল না, থানায় কতিপয় কনেষ্টবল ও ডজন খানেক চৌকিদার লইয়াই তাহাকে সেদিনের সেই প্রতিদ্বন্দ্বিনী মেয়েটির বিরুদ্ধে অগত্যা অভিযান করিতেই হইবে। এ অঞ্চলে সকলে অন্তত জানিতে পারিবে ত, এখন সে মহকুমার হাকিম সাহেবের ভগিনী!

মধ্য দিবসের প্রখর রৌদ্র মাথায় করিয়া সদলবলে হেরিস কাছারী-বাড়ীর সুসজ্জিত তোরণ-দ্বারে উপস্থিত হইয়া এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা দেখিয়া স্তব্ধ হইয়া গেল। আশ্চর্য! যেখানে তাহার সভা করিয়া এজলাসের মত হাকিমি মেজাজে লোকের এজাহার লইবার কথা, সেখানেই কি না সেবাশ্রমের উদ্বোধন-উৎসব চলিয়াছে বিপুল ঘটা করিয়া! তোরণ-সম্মুখে শ্রেণীবদ্ধ ভাবে দ্বারবানগণ পাহারা দিতেছিল; আগন্তুকগণকে তাহারা সসম্ভ্রমে পথ ছাড়িয়া দিল। মণ্ডপ মধ্যে প্রবেশ করিয়া হেরিস রুদ্ধ রোষে ফুলিতে ফুলিতে দেখিল যে, সুবিস্তীর্ণ মণ্ডপটি কানায় কানায় পরিপূর্ণ—

পল্লী-অঞ্চলে কোন সভায় একসঙ্গে এত লোকের সমাগম হইতে পারে, ইহা যেন কল্পনাতীত ব্যাপার! দূরে দৃষ্টি প্রসারিত করিতেই হেরিস সবিস্ময়ে দেখিল—পাটাতনের উপরে উপবিষ্টদের মধ্যে অধিকাংশই বর্ষীয়ান্ নর-নারী, প্রত্যেকের অঙ্গসৌষ্ঠবে ও মুখমণ্ডলে বৈশিষ্ট্যের ছাপ রহিয়াছে। অশীতিপর সৌম্য মূর্তি এক বৃদ্ধ সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার বাম পার্শ্বে যে মহিলাটি প্রসন্নমুখে বসিয়া আছেন, তিনিও বর্ষীয়সী, তাঁহাদের গলায় বিশেষ আয়তনের ফুলের মালা দুলিতেছে। পাটাতনের পুরোভাগে দাঁড়াইয়া এক আশ্চর্য তরুণী মর্মস্পর্শী ভাষায় বক্তৃতা করিতেছে; সভামণ্ডপে সমবেত প্রায় দুই সহস্রাধিক ব্যক্তি উৎকর্ণ হইয়া তাহার বক্তৃতা শুনিতেছে। হেরিস ও-দেশে পঠদ্দশায় এমন কতিপয় ইংলিশ ও আইরিশ মহিলা দেখিয়াছে—যাহাদের অটুট স্বাস্থ্য, দেহসৌষ্ঠব, রূপ ও সৌন্দর্য ভাষায় বর্ণনা করা চলে না—এ-দেশে আসিয়া এই প্রথম পল্লী-অঞ্চলের এই সভায় এমন এক আশ্চর্য নারীকে সে বক্তৃতা দিতে দেখিল, ও-দেশের সেই অসাধারণ তরুণীদের সম্পর্কে যাহাকে সমতুল্য বলিলেও অন্যায় হয়—শ্রেষ্ঠতম বলাই সঙ্গত। ক্ষণকাল হেরিস স্তম্ভিত ভাবে একই স্থানে স্থাণুর মত দাঁড়াইয়া শুধু তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। এই সময় এক জন স্বেচ্ছাসেবক নিকটে আসিয়া হেরিস ও তাহার সঙ্গীদিগকে পাটাতনের দিকে যাইবার জন্য সবিনয়ে অনুরোধ করিল। নিকটে কোথায়ও বসিবার মত স্থান না থাকায় হেরিসকে অগ্রসর হইতে হইল। এই সময় পিছন হইতে খৃষ্টকুমারী চুপি-চুপি তাহাকে বলিল: ঐ মেয়েটিই নোটোরিয়াস চণ্ডী।

ভগিনীর কথায় হেরিসের চোখ দু'টী সহসা প্রখর হইয়া উঠিল। ইতিমধ্যে তাহারা পাটাতনের কাছে আসিয়াছিল। হেরিস দেখিল, সেখানে কয়েকখানি আসন খালি রহিয়াছে। স্বেচ্ছাসেবকরা সযত্নে হেরিস, খৃষ্টকুমারী, আলম ও দারোগা সান্যালকে এই আসনগুলিতে

বসাইয়া দিল। আলম এই সময় চাপা গলায় বলিলঃ এরা ষ্টেশনে আমাদের জন্যে গাড়ী রাখেনি, কিন্তু এখানে বসবার আসন রিজার্ভ করে রেখেছে দেখছি!

সুসজ্জিত সভামণ্ডপ, সভার গাম্ভীর্য, বিপুল জনসমাগম ও চতুর্দিকের গাম্ভীর্যময় পারিস্থিতি দেখিয়া হেরিস স্তব্ধ ভাবে বসিয়া চণ্ডীর বক্তৃতা শুনিতে লাগিল। চণ্ডী তখন বলিতেছিলঃ সভা করতে হয় কাজ কি ভাবে চলবে তার ব্যবস্থার জন্য। গাড়ী তৈরী করবার জন্যই কারখানার প্রয়োজন, গাড়ী তৈরী হয়ে এলে গাড়ীর কাজ হচ্ছে চলা। এই সভায় এ অঞ্চল থেকে যাঁরা এসেছেন, তাঁরা শুনলেন—আমাদের সমাজের, আমাদের সংসারের প্রত্যেককে সুস্থ হতে হবে প্রথমে, তার পরে চাই শিক্ষা; মূর্খ হয়ে যেন কেউ না থাকে। সুস্থ হতে হলে দেহকে ভালো রাখতে হবে। দু'টো ব্যবস্থাই আমরা করেছি এখানে। বিদ্যাপীঠে শিক্ষার ব্যবস্থা হয়েছে। এখানে স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা হবে। যারা অসুস্থ, রুগ্ন, যাদের দেহ-মন ভেঙ্গে পড়েছে, তাদের এখানে এনে চিকিৎসা ও পথ্য দিয়ে সারিয়ে তোলা হবে। সেই সঙ্গে—স্বাস্থ্যরক্ষা করতে, চিকিৎসা করতে জানেন, এমন সব মহিলা এখানে থেকে মেয়েদের শিখিয়ে দেবেন—কেমন করে শরীরকে বলিষ্ঠ করা যায়, ছেলে-পুলেদের স্বাস্থ্য ভালো থাকে, বাড়ীতে হঠাৎ কোন আপদ-বিপদ হলে ভয়ে ঘাবড়ে না গিয়ে নিজে তার প্রতিকার করতে পারেন—এই সব শিখিয়ে দেওয়া হবে। এর জন্যে কোন খরচ লাগবে না। কি ভাবে রোগের সেবা হয়, কেমন করে স্বাস্থ্যরক্ষা করতে হয়, সেগুলো এই সেবাশ্রমেই বায়স্কোপের ছবির ভিতর দিয়ে প্রথমে দেখানো হবে, তার পর হাতে-কলমে শেখানো হবে। আজকের এই সভায় যিনি সভাপতির আসনে বসে আমাদের আশীর্বাদ করতে এসেছেন—তাঁর দিকে আপনারা চেয়ে দেখুন, এ বছর উনি নব্বই বছরে পদার্পণ করেছেন; কিন্তু এখনো সোজা হয়ে চলেন, চোখে চশমা নেন না—এখনো এমন

জোর-গলায় চণ্ডীপাঠ করেন, ভাগবত পড়েন, শাস্ত্র ব্যাখ্যা শোনান যে, অমনি আমাদের চোখের সামনে পুরাণের মুনি ঋষিদের ছবি ফুটে ওঠে। ইনি এ অঞ্চলের পুরোহিত, সকলের বয়োজ্যেষ্ঠ, মাথার মণি—ভট্টাচার্য মশাই! যেমন ইনি, তেমনি এঁর সহধর্মিণী, এঁরও বয়স আশী পূর্ণ হয়েছে, কিন্তু এখনো নিজের হাতে গৃহ-দেবতার ভোগ রাঁধেন, সংসারের কাজ করেন। এই জন্যই সেবাশ্রমের উদ্বোধন সভায় শ্রেষ্ঠ স্থানে এঁদের দু'জনকে বসিয়ে আমরা ধন্য হয়েছি। এখন আমরা অনুরোধ করছি—সেবাশ্রমের দরজা এঁরা খুলে দিয়ে সেবক-সেবিকাদের আশীর্বাদ করুন।

বিপুল উল্লাসে শ্রোতৃবৃন্দ চণ্ডীর কথার সমর্থন করিল। ভট্টাচার্য মহাশয় অতঃপর উঠিয়া শাস্ত্রীয়বাণী আবৃত্তি করিয়া সেবাশ্রমের উপযোগিতা স্বীকার করিলেন। তিনি বলিলেনঃ যাঁরা প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতাকে অনুদার বা পক্ষপাতী বলে দোষী করেন—তাঁরা ভ্রান্ত। প্রাচীন আদর্শ প্রচারের দিন আজ এসেছে এবং আশা হয়েছে এই জন্য যে, আমাদের দেশমাতা চণ্ডী দেবীর মত কন্যাকে দান করেছেন আমাদের ভ্রান্তি অপনোদনের জন্যে।

ইহার পর সেবাশ্রমের দ্বারপথে আস্তৃত আবরণ-রজ্জু ভট্টাচার্য-দম্পতি শঙ্খধ্বনির সঙ্গে উন্মোচন করিলে বৃহৎ দ্বার উন্মুক্ত হইল। এই সময় সুসজ্জিতা কুমারীরা লাজ ও ফুল ছড়াইতে ছড়াইতে তাঁহাদিগকে অভ্যন্তরে লইয়া চলিল। পাটাতনের উপর উপবিষ্ট সকলেই তাঁহাদের অনুসরণ করিলেন। স্বেচ্ছাসেবকগণ সবিনয়ে দর্শকবৃন্দকে স্ব স্ব আসনে আসীন থাকিতে বাধ্য করিলেন।

বৃহৎ হল-ঘরে এক একখানি তক্তাপোষ আশ্রয় করিয়া পাশাপাশি শুভ্র শয্যা শ্রেণী। ইতিমধ্যে কতকগুলি শয্যা পূর্ণ হইয়া গিয়াছে এবং রুগ্না নারী ও শিশুদের চিকিৎসা চলিয়াছে। সুবেশধারিণী ধাত্রীরা তাহাদের

পরিচর্যা করিতেছে। ডাক্তার রায়ের প্রচেষ্টায় এত শীঘ্র এরূপ ব্যবস্থা দেখিয়া অনেকেরই মনে হইল যে, ব্যাপারটি যেন ইন্দ্রজালের মত।

প্রায় এক ঘণ্টা ধরিয়া সেবাশ্রমের বিভিন্ন বিভাগ, স্বাস্থ্যরক্ষা ও চিকিৎসা ব্যবস্থার প্রণালী ডাক্তার রায় সকলকে বুঝাইয়া দিলেন।

হেরিস যে মনোভাব লইয়া শ্যামাপুরে আসিয়াছিল, প্রচণ্ড বিক্ষোভ তাহাতে ইন্ধন যোগাইলেও, সেবাশ্রমের এই অপ্রত্যাশিত ঘটনারাজি তাহাকে কিংকর্তব্যবিমূঢ় করিয়া ফেলিল।

সেবাশ্রম পরিদর্শনের পর গোবিন্দনারায়ণ হেরিস, খৃষ্টকুমারী, আলম ও সত্যেন সান্যালকে অভ্যর্থনা করিয়া চণ্ডী ও তাহার সহকর্মীদের সঙ্গে পরিচিত করিয়া দিল। এই সময় খৃষ্টকুমারী গম্ভীর মুখে বলিয়া উঠিল: আপনার স্ত্রী বিয়ের আগে থেকেই আমাকে ভালো ভাবেই জানেন।

খৃষ্টকুমারীর কথার পিঠেই মিষ্টার আলম সহসা বলিয়া ফেলিল: সেই চেনাচিনিটা আরো ভালো ভাবে সবাইকে জানাবার জন্যেই উনি এসেছিলেন। কিন্তু সেবাশ্রমের আড়ালে আশ্রয় নিয়ে আপনার স্ত্রী চণ্ডী দেবী আজ 'এস্কেপ' করলেন মিষ্টার গাঙ্গুলী।

কথাটা শুনিবা মাত্র চণ্ডী সহাস্যে পরিহাসের ভঙ্গিতে বলিল: বেশ ত, আমরা যখন সেবাশ্রম থেকে বেরিয়ে এসেছি—ওর পিছনে লুকিয়ে নেই, চেনাচিনিটা হোয়েই যাক না আরো ভালো করে।

মিঃ আলম মুখখানা বাঁকাইয়া বলিল: ব্যস্ত হবেন না, আজ আর জল ঘোলা করবার ইচ্ছা আমাদের নেই। ও ব্যাপারটা আপাততঃ মুলতুবীই রইল।

ঠিক এই সময় স্বেচ্ছাসেবকদের সহিত রাজীব মিষ্টার হেরিস ও তাহার পার্টিকে চা-পানে আপ্যায়িত করিতে আসিয়া আর এক বিভ্রাট

মিষ্টার হেরিস এই সময় সহসা প্রশ্ন করিল: আচ্ছা, বলুন ত—আপনার পিতা কি রাজবিদ্রোহের অপরাধে—

হাকিম হেরিসের মুখের কথা যেন কাড়িয়া লইয়া রাজীব উত্তর করিল: আমার পুণ্যাত্মা পিতা দেশের মুক্তি আন্দোলনে আত্মোৎসর্গ করে শহীদ হয়েছিলেন।

মিষ্টার আলম এই সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞাসার উপক্রম করিবামাত্র হেরিস তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া বলিল: থাক্, আর কিছু ওঁকে জিজ্ঞাসা করবেন না, আমার সব জানা হয়ে গেছে।

এরূপ অপ্রীতিকর আলোচনার পরেও আতিথেয়তার দিক দিয়া গোবিন্দনারায়ণ এই বিশিষ্ট অভ্যাগতগণকে জলযোগের জন্য অনুরোধ করিলে অত্যন্ত অভদ্র ও উদ্ধত ভাবে তাহা উপেক্ষা করিয়া এই বিলাত-ফেরত আই-সি-এস অফিসারটি সদলবলে মণ্ডপ ত্যাগ করিল।

সমাপ্ত

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর পক্ষে
মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য, ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
২০৩-১-১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬